ভারতে জাতীয় আন্দোলন

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে"

আমার ছেলেদের

ও

দেশের ছেলেদের

হাতে

দিলাম।

স্নেহের সুপ্রিয়, দেবপ্রিয়,

তোমরা যখন বড় হবে তখন আশা করি দেশের অনেক পরিবর্ত্তন দেখ্‌বে; তবুও এ যুগের যুবকদের—তোমাদের যুগের বৃদ্ধ ও গতায়ুদের কীর্ত্তি-কাহিনী জানবে বলে এ বইখানি লেখা। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশকে ভালবাসতে শিখবে—দেশের বীরদের শ্রদ্ধা করতে শিখবে—এই ভরসায় এই বইখানি তোমাদের দিলাম।

শান্তিনিকেতন,
৫ই ফাল্গুন, ১৩৩১

তোমাদের বাবা

ভারতে
জাতীয় আন্দোলন
সূচীপত্র

বিস্তৃত সূচী

প্রথম খণ্ড

জাতীয় আন্দোলনের অভিব্যক্তি

দ্বিতীয় পর্ব। কংগ্রেস যুগ (পৃঃ ২৭-৪৫)। নেশনাল লীগ ও কনফারেন্স—কংগ্রেসের প্রথম আভাস—মিঃ হিউম ও কংগ্রেস-কল্পনা—১৮৮৫ কংগ্রেস স্থাপন—কংগ্রেসের ক্রীড—১৮৮৪-১৮৯৫ কংগ্রেস—বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি স্থাপন—মফঃস্বলে রাজনীতি—তিলক ও মহারাষ্ট্র জাতি—শিবাজী উৎসব—১৮৯৭ বোম্বাইএর প্লেগ ও র‍্যাণ্ড-হত্যা—তিলকের কারাগার—লর্ড কর্জন ও দেশের মনোভাব—১৯০৩ বঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব—প্রতিবাদ—১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ—বঙ্গভঙ্গ জাতীয় জাগরণের উপলক্ষ—কারণ—প্রাচীন সভ্যতার স্তুতি নিন্দা—য়ুরোপে ভারতীয় শাস্ত্রাদির আলোচনা—বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দু-জাতীয়তা—হিন্দুস্থান ও মাদ্রাসে থিওজফি ও হিন্দু-জাতীয়তা—পঞ্জাবে আর্য্যসমাজ ও হিন্দু-জাতীয়তা—বঙ্গদেশে স্বামী বিবেকানন্দ ও জাতীয় ভাব—মহারাষ্ট্রে তিলকের জাতীয় ভাব—হিন্দু-জাতীয় শিক্ষা শান্তিনিকেতন ও গুরুকুল—আত্মপ্রতিষ্ঠার বিচিত্র কারণ—নৌরজী, ডিগ্‌বী, রমেশচন্দ্রের কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ—দেউস্করের 'দেশের কথা'—দেশীয় পত্রিকাদের স্বাধীন মত—বঙ্গদেশে নরমপন্থী, চরমপন্থী ও বিপ্লবপন্থী।

তৃতীয় পর্ব। স্বদেশী-আন্দোলন যুগ (পৃঃ ৪৬-৮২) বয়কট বা বর্জননীতি—বঙ্গচ্ছেদ ওরাখিবন্ধন—স্বদেশী আন্দোলন ও পিকেটিং—স্বদেশীতে ছাত্র ও রিসলী সার্কুলার—এন্টি-সার্কুলার সোসাইটি—বাংলার নেতৃগণ—কাশী-কংগ্রেস ও বয়কট—বরিশাল প্রাদেশিক সমিতি—তথায় পুলিশ জুলুম—জাতীয় সঙ্গীত—ছাত্রদের উপর জুলুম—জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন—জাতীয় শিক্ষায় অরবিন্দ ঘোষ—Dawn Society ও শিক্ষা-বিস্তার—জাতীয়দল—বাংলায় শিবাজী-উৎসব—বাংলায় বীর-পূজা—মতভেদের সূত্রপাত—১৯০৬ সালের কংগ্রেস—নরমপন্থী, চরমপন্থী—জাতীয় দলের সংবাদপত্র—যুগান্তর ও বিপ্লববাদ—অনুশীলন সমিতি—'যুগান্তর' ও বন্দেমাতরমের মামলা—কংগ্রেসে মতভেদ—

—১১-১৩ই এপ্রিল পঞ্জাবে অশান্তি—অমৃতসহর প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গা—পঞ্জাবে সামরিক আইন ঘোষণা—জালিনবালাবাগে সভা ও হত্যাকাণ্ড—সামরিক আইনের অত্যাচার—লাহোর ও অন্যান্য সহরে সামরিক আইন—পঞ্জাব-অত্যাচারের প্রতিবাদ—রবীন্দ্রনাথের পত্র ও 'স্যর' উপাধি প্রত্যাখ্যান—হাণ্টার তদন্ত-কমিটি—বিলাতে ও'ডায়ার, ডায়ারের সম্মান—কংগ্রেস নিযুক্ত তদন্ত-কমিটি—নূতন সমস্যা—খিলাফৎ—খিলাফতে হিন্দুদিগের সহানুভূতি—১৯২০ সেপ্টেম্বর কলিকাতার বিশেষ কংগ্রেস—অসহযোগ প্রস্তাব—অসহযোগ-নীতি—গান্ধীজির হুমকী—নাগপুর কংগ্রেস—কংগ্রেস ক্রীডের পরিবর্তন—চিত্তরঞ্জন ও অসহযোগ—দেশ-সেবায় বিশিষ্ট কর্মীগণ—সরকারের শাসন-সংস্কারের চেষ্টা—নূতন ব্যবস্থাপক সভা বর্জন—জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও গ্রাম-সেবা—চরকা ও তাঁত—খিলাফৎ কর্মীগণ—১৯২১ ধর্ষণনীতি—আন্দোলনকারীদের দুর্বলতা—অসহযোগ নিরুপদ্রব থাকিল না—আসামে কুলীদের কর্মত্যাগ—আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ে ধর্মঘট—মালাবারে মোপ্‌লা বিদ্রোহ—আলীভ্রাতাদের কারাগার—যুবরাজের ভারত ভ্রমণ ও অসহযোগ—শাসন-অমান্য আন্দোলন—কংগ্রেস সেবক-সঙ্ঘ বে-আইনী—চিত্তরঞ্জন ও কংগ্রেস কর্মীগণের কারাগার—১৯২১ আহমাদাবাদের কংগ্রেস চৌরীচর হত্যাকাণ্ড—বরদৌলি প্রস্তাব ও সংগঠন—সরকারের কর্তব্য—গান্ধীজির কারাগার—অসহযোগনীতি সম্বন্ধে সন্দেহ—Civil Disobedience Committee—অসহযোগীদের কৌন্সিল-প্রবেশের প্রস্তাব—১৯২২ গয়ার কংগ্রেস—কংগ্রেসে মতভেদ—চিত্তরঞ্জন ও স্বরাজ্যদল—স্বরাজ্যদল ও অসহযোগীদল—স্বরাজ্যদল ও মুসলমানদের সহিত প্যাক্ট—ঢাকায় লর্ড লীটনের বক্তৃতা ও তাহার ফল—মন্ত্রীদের বেতন বন্ধ—বাংলায় বিপ্লব ও Ordinance—খদ্দর প্রতিষ্ঠান—সমাজ ও ধর্মে সত্যাগ্রহ।

দ্বিতীয় খণ্ড

ভারতে বিপ্লববাদের ইতিহাস

তৃতীয় খণ্ড

মোসলেম ভারত

—০—

লেখকের নিবেদন

আমার 'ভারত পরিচয়'* গ্রন্থে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস নামে একটি পরিচ্ছেদ আছে। সেই প্রবন্ধটি সংশোধন করিতে গিয়া এই গ্রন্থের উৎপত্তি। আজকাল জাতীয় আন্দোলনের সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; তবে সেগুলি ইতিহাসের উপাদান—ইতিহাস নহে। সেই অভাব দূর করিবার জন্যই এই গ্রন্থ লেখা—তবে তাহা দূর হইয়াছে কিনা জানি না এবং হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই এ প্রকার গ্রন্থলেখার মত উপাদান সংগৃহীত হয় নাই এবং এই সময়ের ইতিহাস লেখার সময়ও হয় নাই। যাই হোক তথাচ শক্তিমত লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

দুই একটি ঘটনা বইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছে—যেমন কাণপুর কমিউনিষ্ট মোকদ্দমা। উহা বিপ্লবের ইতিহাসের অঙ্গীভূত করা উচিত ছিল। প্রবাসী ভারতবাসী সম্বন্ধে শেষ দিকটা অসম্পূর্ণ—কারণ অধিকাংশ ছাপা হইয়া যাইবার পর রাসব্রুক উইলিয়ামসের India 1923-24 পাই। এই গ্রন্থখানি পূর্বে প্রকাশিত হইলে বিশেষ উপকৃত হইতাম। পাঠকদের সুবিধার জন্য গ্রন্থশেষে একখানি গ্রন্থপঞ্জী দিয়াছি। একথা বলা বাহুল্য যে সমস্ত গ্রন্থগুলি ব্যবহার করা লেখকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

আমি ভাল প্রুফ দেখিতে পারি না বলিয়া অনেক ভুল থাকিয়া

---

* ভারত পরিচয় বা বর্ত্তমান ভারতের প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত,—শ্রীযুক্ত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভূমিকা সমন্বিত। পৃঃ ৬১০। হৃষীকেশ সিরিজ নং ৩—বরেন্দ্র লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৸৶০

গিয়াছে। সেগুলি 'মুদ্রাকর প্রমাদ' নয় গ্রন্থকারের প্রমাদ। পাঠকগণ সংশোধন করিয়া পড়িবেন। অনবধানতাবশতঃ ভাষার অনেক ভ্রম হইয়াছে, ছাপার অক্ষরে দেখার পর সেগুলির ত্রুটি পরিলক্ষিত হইল। যদি এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে হয় তবে সেই সব ভুলত্রুটি শুধরাইয়া লইব। আর পাঠকগণ যদি দয়া করিয়া তথ্য, ঘটনা ও মতামতের ভ্রমগুলিকে আমাকে জানাইয়া দেন তবে সেটা কেবল আমার উপকার করা হইবে না—দেশের উপকার হইবে ; কারণ কোনো ভুল সংবাদ বা ভুল মতামত দেশের মধ্যে প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

এই গ্রন্থ ছাপা হইয়া যাইবার পর শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যালের 'বন্দী-জীবন' ২য় খণ্ড দেখিতে পাই। তাহাতে নূতন তথ্য অনেক। বুঝা গেল একই ঘটনা বা একই ব্যক্তি সম্বন্ধে বিবিধ ও বিরুদ্ধ মতামত আছে। সে সব মিলাইয়া দেখিবার মত উপকরণ এখনো প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং মতভেদ অনিবার্য্য।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার নিয়োগী মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের সম্মান বাড়াইয়া দিয়াছেন, এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই গ্রন্থের গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন করিতে বিশ্বভারতী লাইব্রেরীর একজন সহকর্মী আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বিশ্বভারতী-মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দালাল মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হইতে পারিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার, শান্তিনিকেতন
৫ই ফাল্গুন, ১৩৩১

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

(শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত)

প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কত প্রকার শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা প্রমাণসহ বর্ণনা করিয়া শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়স্‌বাল্ মহাশয় "হিন্দু পলিটি" নামধেয় একখানি অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায়, সর্ব্বসাধারণের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বলিতে বর্ত্তমান সময়ে লোকে যাহা বুঝে, ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে, কোন কোন সময়ে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা বহু পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং রাষ্ট্রীয় অধিকার ও স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের আধুনিক চেষ্টা ভারতবর্ষের পক্ষে অশ্রুতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অভূতপূর্ব্ব একটা জিনিষ পাইবার চেষ্টা নহে। কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য, যে, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব-স্থাপনের প্রাক্‌কালে এদেশে এই জিনিষটি ছিল না।

ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত যখন হয়, তখন যে দেশের লোক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এবং সর্ব্ববিধ পৌর ও জানপদ অধিকার চাহিয়াছিল, তাহা নহে ; যদিও ইহা সত্য, যে, আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক আদিগুরু রামমোহন রায়ের মানসপটে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের ছায়া পড়িয়াছিল। কিন্তু, যেমন অন্য অনেক বিষয়ে, তেমনই এই বিষয়েও তিনি স্বীয় সমসাময়িক ব্যক্তিগণের অনেক অগ্রে ও ঊর্দ্ধে ছিলেন।

তাঁহার পরে, যখন এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তখন সামান্য জিনিষের জন্য সামান্যভাবেই তাহার আরম্ভ হইয়াছিল।

কেমন করিয়া সেই ক্ষীণ স্রোতটির উদ্ভব হইয়াছিল, কোন্ পথ ধরিয়া সেই স্রোতটি চলিয়া আসিয়াছে, তাহার কোন্ শাখা কোন্ লক্ষ্য পানে ছুটিয়াছে, কোন্ শাখা বিপথে গিয়া ব্যর্থতার মরুভূমিতে আত্মবিলোপ করিয়াছে বা করিতে বসিয়াছে অথচ সেই ব্যর্থতার ইতিহাস দ্বারাও আমাদিগকে উপদেশ দিতেছে ও সুপথ দেখাইতেছে, কেমন করিয়া সেই গোড়াকার ক্ষীণ স্রোতটি পুষ্ট, বিপুলকায়, প্রবল ও বেগবান্ হইয়াছে—এই সমস্ত কথা শ্রীমান্ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় যোগ দিবার লোক ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছে; ভবিষ্যতে আরও দ্রুত বাড়িবে। কিন্তু যাঁহারা যোগ দিতেছেন ও পরে দিবেন, তাঁহারা এই প্রচেষ্টার অতীত ইতিহাস জানিলে দেশের যত কল্যাণ করিতে পারিবেন, না জানিলে তত পারিবেন না। এই জন্য ইহার ইতিহাস তাঁহাদের জানা উচিত। তা ছাড়া, কৌতূহল তৃপ্তির জন্যও উহা জ্ঞাতব্য।

গ্রন্থখানি রচনার জন্য লেখককে বহু তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। বহিখানিতে এমন অনেক কথা দেখিলাম, যাহা আমি জানিতাম না; তার চেয়ে বেশী কথা দেখিলাম, যাহা জানিতাম কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ইহাও বুঝিতে পারিতেছি, যে, সম্পাদকীয় কাজ করিবার সময় এইরূপ একখানি বহি নিকটে থাকিলে দুর্ব্বল স্মৃতি অনেক সাহায্য পাইবে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে সকল দেশেই হুজুক, দলাদলি, গালাগালি ও অন্তর্বিরোধ থাকায় রাষ্ট্রনীতি জিনিষটার উপরই অনেকে বিরূপ। কিন্তু হুজুক প্রভৃতি আনুষঙ্গিক দোষ আছে বলিয়া আমরা উহার গুরুত্ব বিস্মৃত হইতে পারি না; রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টা জ্ঞানবত্তা, বিচক্ষণতা ও ধীরতার সহিত পরিচালিত হইলে তাহা হইতে যে প্রভূত কল্যাণের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। আমাদের পূর্ব্বজগণ রাষ্ট্রনীতির গৌরব বুঝিতেন। প্রমাণস্বরূপ, শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়স্বাল্

মহাশয় "হিন্দু পলিটি" গ্রন্থে মহাভারত হইতে যে শ্লোক দুটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা নীচে মুদ্রিত করিতেছি:—

"মজ্জেৎত্রয়ী দণ্ডনীতৌ হতায়াং সর্বেধর্মা প্রক্ষয়েয়ুর্বিবৃদ্ধা।
সর্বে ধর্মাশ্চাশ্রমাণাং হতাঃ স্যুঃ ক্ষাত্রে ত্যক্তে রাজধর্মে পুরাণে॥
সর্বে ত্যাগা রাজধর্মেষু দৃষ্টা সর্বাঃ দীক্ষা রাজধর্মেষু যুক্তাঃ।
সর্বা বিদ্যা রাজধর্মেষু চোক্তাঃ সর্বে লোকা রাজধর্মে প্রবিষ্টাঃ॥"

মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৬৩, ২৮—২৯।

রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টাকে সুপথে চালিত করিতে এই পুস্তক পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করিবে বলিয়া, আমার মনে হয়, গ্রন্থকার ইহা লিখিতে পরিশ্রম করিয়া ভালই করিয়াছেন।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৬ ফাল্গুন, ১৩৩১।

——o——

ভারতে
জাতীয় আন্দোলন
প্রথম খণ্ড
জাতীয় আন্দোলনের অভিব্যক্তি
প্রথম পর্ব
কংগ্রেসের পূর্বযুগ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ কোম্পানী নামত না হইলে, কার্য্যতঃ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। শাসনভার পাইয়াও কোম্পানী বহুকাল যাবৎ এ দেশের শিক্ষা দীক্ষা আচার প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। কতক ভয়ে, কতক লোকরঞ্জনার্থে, কতক রাজনীতিবোধে, তাঁহারা সর্ব্ববিষয়েই এ দেশের প্রাচীনকেই অনুবর্ত্তন করিয়া চলিতেন। বিলাতে পরিচালকগণ বৃটীশভারতে খৃষ্টান পাদরীদের প্রবেশ করিবার অনুমতি পর্য্যন্ত দিতেন না; তাঁহাদের ভয় পাছে এতদ্দেশীয় লোকে মনে করে কোম্পানী বাহাদুর তাহাদের খৃষ্টান করিতে চান। এইজন্য প্রথম পাদরীদের দল আসিয়া দিনেমার রাজ্য শ্রীরামপুরে মিশন স্থাপন করেন। এদেশে পশ্চিমের কোন জ্ঞান বা শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য কোম্পানীর মধ্যে প্রথম অবস্থায় কোনো প্রকার আগ্রহ ছিল না। ক্রমে রাজ্য-বিস্তৃতির সহিত রাজকার্য্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, একদল ইংরাজী-জানা অধস্তন কর্ম্মচারীর

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ইংরাজী-শিক্ষা

প্রয়োজন অনুভূত হইলে, কোম্পানী এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের কথা কল্পনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ ছিল।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে স্যর উইলিয়াম্ জোন্স্ কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করিয়াছিলেন; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ভারত ও প্রাচ্য জগতের ইতিহাস, সাহিত্য ও মানব-সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা। জোন্স্, উইলফ্রেড্, উইলকিন্স্, প্রিন্সেপ, কোলব্রুক, হটন, উইলসন্ প্রভৃতি একদল সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিত ভারতের প্রচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহারা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। ভারতের প্রাচীনতার মধ্যে তাঁহারা সকল সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভারতবাসীকে তাহারই মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বিশ খণ্ড পত্রিকায় (Asiatic Researches in 20 Volumes) ভারতের ও প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতার অনেক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

এশিয়াটিক সোসাইটি ও প্রাচীন ইতিহাস

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার যে আয়োজন হয়, তাহা বাঙালীদের নিজের চেষ্টায়। কোম্পানী সে সময় কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন ঠিক করিতে পারেন নাই। ইংরাজী জানিলে সরকারী চাকুরী সহজে মেলে ও ইংরাজদের প্রিয় হওয়া যায় একথা বাঙালী যেমন বুঝিল, অমনি সে ঐ ভাষা আয়ত্ত্বে মন দিল। হিন্দুরা মুসলমান আমলে ফার্শী, উর্দ্দু শিখিয়া, মুন্সীয়ানায় পাকা হইয়াছিল; তাহাদের কাছে ফার্শীও উপজীবিকার জন্য শিখিতে হইয়াছিল, ইংরাজীও উপজীবিকার জন্য শিখিতে হইবে। হিন্দুর নিকট ফার্শী ও ইংরাজীতে কোনো ভেদ নাই। সুতরাং একটিকে ছাড়িয়া অপরটিকে ধরিতে তাহার বিলম্ব হইল না। মুসলমানদের পক্ষে 'ফার্শী' জাতীয়ভাষা, তাহাদের ধর্ম্মের ভাষা, তাহাদের হৃতরাজ্যের

ইংরাজী শিক্ষা ও হিন্দুজাতি

রাজ-ভাষা ; তাহারা হিন্দুদের ন্যায় সহজে সে ভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরাজী ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে পারিল না।

ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়া কেবল হিসাব-নিকাশের কথাই আসিল না ; ইংরাজীভাব, পাশ্চাত্যভাব, পশ্চিমের স্বাধীনতার বাণীও আসিল। রাজা রামমোহন রায় প্রথম বুঝিয়াছিলেন যে ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়াই ভারতের জ্ঞানের দ্বার মুক্ত হইবে। ১৮২৩ সালে তিনি তৎকালীন বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে ভারতে নব-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য যে পত্র লেখেন, তাহাকেই এই নব-যুগের প্রথম ঘোষণা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রাচীন শিক্ষা ও নবীন শিক্ষার মধ্যে কোনটিকে দেশ বরণ করিবে, তাহা লইয়া দেশে খুবই আন্দোলন আলোচনা হইতে লাগিল। বাঙালীদের মধ্যে শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তি —যাঁহাদের মনে পশ্চিমের শিক্ষা পাইয়া স্বাধীনতা ও বিপ্লবের মত্ততা লাগিয়াছিল, তাঁহারা দেশকে পশ্চিমাভিমুখী করিতেই কৃতসংকল্প। আর যাঁহারা প্রাচীনের মোহে মুগ্ধ তাঁহারা সংস্কৃত ও ফার্শী, আরবীর মধ্যে ভারতকে সুপ্ত রাখিতে ইচ্ছুক। রামমোহন ছিলেন এই দুইএর মধ্যে। তিনি একদিকে সংস্কৃত, আরবী, ফার্শী প্রভৃতি প্রাচ্যভাষায় সুপণ্ডিত, হিন্দুধর্ম্মের সৌন্দর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্বে শ্রদ্ধাবান্‌, অপরদিকে য়ুরোপীয় ভাষায়, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে সুপরিচিত। এই উভয়কে জানিয়া তিনি বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞানকে দেশে আনিতে চাহিয়াছিলেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বন্দ

রামমোহন নব্য-বঙ্গের চিন্তা জগতে যুগান্তর আনিলেন ; তাঁহাকে আমরা বিপ্লবীর রাজা বলিতে পারি। কিন্তু পশ্চিমকে গ্রহণ করিয়াও তিনি পাশ্চাত্য হন নাই ; তাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে হিন্দু ছিল, দেশীয় ছিল, জাতীয়ভাবে তেজস্বী ছিল। হিন্দুজাতির কোথায় মহত্ব তিনি তাহা পরিষ্কাররূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং তাহা সযত্নে রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানকে বরণ করিয়াছিলেন

রামমোহন রায় ও শিক্ষা

নব্য অগ্রসরদলের মধ্যে পশ্চিমের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির বিশেষ একটি কারণ ছিল। সেই সময়ে ফরাসী-বিপ্লবের আন্দোলনের তরঙ্গ ভারতের ইংরাজী-শিক্ষিত তরুণ মনকে ভীষণভাবে আলোড়িত করিতেছিল। ডেভিড্ হেয়ার, ডিরোজিও প্রভৃতি যাঁহারা এই সময় শিক্ষা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, তাঁহারা ছিলেন মহা-বিপ্লবী, সমাজ, ধর্ম্ম, সংস্কার প্রভৃতি সমস্তের মধ্যে ভাঙ্গনের নেশা লাগানো ছিল তাঁহাদের কাজ। ইঁহারা প্রচলিত খৃষ্টান ছিলেন না। বঙ্গীয় যুবকগণ এই সকল শিক্ষকের নিকট বিদ্যা লাভ করিয়া মনকে সংস্কার মুক্ত করিয়া প্রাচীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সকল প্রকার সংস্কার—কু-ই হউক আর সু-ই হউক—কেবলমাত্র সংস্কার বলিয়াই নির্বিচারে ভাঙ্গিবার নেশায় ইঁহারা ভাঙ্গিতে লাগিলেন। ফরাসী বিপ্লবের এই ভাঙ্গনের নেশা বাঙালীকে যেমন করিয়া পাইয়াছিল, বোধ হয় আর কোনো জাতিকে তেমন ভাবে পায় নাই।

বঙ্গীয় যুবকদের সামাজিক বিপ্লব

লর্ড বেন্টিঙ্কের সময় স্থির হইল যে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবে। ইহাতে নবীনদল সুখী হইল; সরকারী কাজের জন্য ইংরাজী জানা, রাজভক্ত কর্ম্মচারী পাইবারও সুবিধা হইল। রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষা আনয়ন করিয়া দেশের জড় মনে স্বাধীনতার মন্ত্র দিবার জন্য উদ্গ্রীব ছিলেন, এবং ভারতীয় মনকে ভারতীয় ও একান্তভাবে জাতীয় রাখিবার জন্য এককালীন প্রয়াসী ছিলেন। তিনি হিন্দুসমাজের অসংখ্য দোষ ত্রুটি দেখাইয়াও শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুই ছিলেন; খৃষ্টান ধর্ম্মকে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াও তিনি খৃষ্টান হন নাই ও হিন্দুদের উপর তাহাদের অযথা আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত ছিলেন। রাজার জীবনের ক্ষুদ্র একটি ঘটনা হইতে আমরা সে যুগের জাতীয়ভাবের উন্মেষের একটি পরিচয় পাই। রামমোহন এক রবিবারে তাঁহার

রামমোহন ও জাতীয়তা

খৃষ্টান.বন্ধু আডাম সাহেবের বাড়ী হইতে উপাসনায় যোগ দিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। তখন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব তাঁহার গাড়ীতে ছিলেন। পথিমধ্যে চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন—"দেওয়ানজী, বিদেশীদের উপাসনাতে আমরা যাতায়াত করি, আমাদের নিজের একটা উপাসনার ব্যবস্থা করিলে হয় না?" এই কথা রামমোহনের অন্তরে লাগিল। ইহার ফলে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা নিজেদের জাতীয় জিনিষ হইল। দেশাত্মবোধ হইতে তাঁহারা এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নবযুগে ইহাই মনোজগতে বিদ্রোহ আনিল।

রামমোহন যেমন জাতীয় আত্মবোধের গুরু, তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনেরও গুরু বলিয়া তাঁহাকে স্বীকার করা যায়। দিল্লীর বাদসাহের কতকগুলি অধিকার দাবী করিবার জন্ম তিনি সম্রাট্ কর্ত্তৃক বিলাত প্রেরিত হন। সেই সময়ে কোম্পানীকে নূতন সনদ দিবার জন্য পার্লামেণ্ট হইতে বিশ-বৎসরী তদন্ত-বৈঠক চলিতেছিল। উহার সম্মুখে রাজা রামমোহন রায় ভারতশাসন সম্বন্ধে যে নির্ভীক ও সৎ বিবেচনাপূর্ণ প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শীতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। রাজাই প্রথমে শাসন ও বিচার বিভাগের পৃথক্করণ সম্বন্ধে আন্দোলন করেন। রাজার কাল বর্ত্তমান হইতে প্রায় শত বৎসর পশ্চাতে, তথাচ তিনি জাতীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের জন্ম যে সাধনা করিয়াছিলেন, তাহার জন্ম বর্ত্তমান যুগ, ও ভারতের অনাগত যুগ ঋণী।

রামমোহন ও রাজনীতি আন্দোলন

রামমোহনের পর প্রায় বিশ বৎসর ভারতে বা বাংলা দেশে উল্লেখ-যোগ্য রাজনৈতিক আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। তবে ১৮৩৫ সালে স্যর চার্লস মেট্কাফ মহোদয়ের দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত হইলে, ভারতবাসী ভাবের প্রসার ও রাজনৈতিক অধিকার,

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার ফলে রাজনীতিক শিক্ষা প্রচার

অভিযোগের প্রকাশ করিবার অবসর পাইল। বাঙালী মেটকাফের এই উদারতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া 'মেট্‌কাফ হল' স্থাপন করিল। বাঙালী স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝিয়াছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বেই ভারতে বিধি সঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাস ও বিশেষভাবে বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষা যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষিত যুবকগণ ১৮৫১ সালে কলিকাতা ও বোম্বাইতে 'বৃটীশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। কলিকাতার সভার নেতাদের মধ্যে ছিলেন—প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রাজা দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। বোম্বাই প্রদেশেও বিধিসঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলন (Constitutional agitation) এই সময়ে সুরু হয়। সেখানে জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ, প্রাতঃস্মরণীয় দাদাভাই নৌরজীর চেষ্টায় ১৮৫১ সালে বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। বাংলার ন্যায় বোম্বাইতে নবীন শিক্ষিত যুবকেরা সমাজ সংস্কার ও রাজনীতি আলোচনা একাধারেই চালাইতে ছিলেন। পার্শীদের মধ্যে বিশেষভাবে নিজেদের ধর্ম্মসংস্কারের জন্য ঐ সময়ে সভা স্থাপিত হয়; নৌরজী, বাঙ্গ্‌লী, ফরদন্‌জী প্রভৃতি অনেক কৃতি পার্শীর নাম রাজনীতি ও সমাজ সংস্কারের মধ্যে দেখা যায়। বাংলাদেশে স্যর রাধাকান্ত দেব একদিকে প্রাচীন রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের নেতা, অপরদিকে বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষক ও সভাপতি ছিলেন।

বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

এই সকল বৈঠকী (academic) রাজনীতির পাশেই, ভারতের এক শ্রেণীর মন পূর্ব ও পশ্চিমের সভ্যতা গ্রহণ ও বর্জ্জনের দোটানায় ক্রমশই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল; ইতিহাসে ইহারই প্রকাশ 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ও ফল কি, তাহা

এইখানে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই—ইতিহাস পাঠক মাত্রেই তাহা জানেন। এই বিদ্রোহ তথাকথিত অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে অপেক্ষা-কৃত প্রাচীন পন্থীদের দ্বারা জাগরিত হইয়াছিল। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে উহার প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে কি না বলা যায় না; তবে বর্ত্তমান আন্দোলন কেবলমাত্র তথা-কথিত শিক্ষিত সমাজের সৃষ্টি। সেইজন্য পরযুগে শিক্ষিত রাজনৈতিক-আন্দোলনকারীরা এই অশিক্ষিত জনসঙ্ঘকে যখন দলে টানিবার জন্য আবেগভরে আহ্বান করিতে গেলেন, এবং চেষ্টা করিয়া পরস্পরের মধ্যে পর্বতপ্রমাণ শিক্ষাভিমানের ব্যবধান দূর করিতে গেলেন, তখন উহারা সিপাহী বিদ্রোহের যুগে শিক্ষিতদের ব্যবহার ও তাহাদের পিতৃ-পিতামহদের দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া নবীন আন্দোলনকারীদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিল। শিক্ষিত জনমত ও অশিক্ষিত জনশক্তির মধ্যে যে ভেদ, তাহা বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষার অন্যতম ফল।

সিপাহী বিদ্রোহ ও জাতীয়তা

অযোধ্যা, সাতারা, নাগপুর প্রভৃতি প্রাচীন দেশীয় রাজ্যের বাজেয়াপ্তের ইতিহাস কোম্পানীর কলঙ্কের ইতিহাস। এই সব অন্যায় বাজেয়াপ্তের ফলে দেশমধ্যে যে অসন্তোষ জমিয়া উঠিতেছিল, তাহাই কালে সিপাহী-বিদ্রোহের আকার গ্রহণ করিল। বাংলাদেশের একজন মনীষি লর্ড ডালহৌসীর এই Shortsighted policyর বিরুদ্ধে তাঁহার তেজস্বী লেখনী চালাইতেছিলেন; তিনি হইতেছেন Hindu Patriot পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই পত্রিকার নাম হইতেই বুঝা যায় যে দেশে "স্বদেশ প্রেম" বলিয়া কথাটি আসিয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র বড়লাট বাহাদুরের আত্মসাৎ পলিসির (Policy of Lapse) বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ডালহৌসীর পলিসির বিষময় ফল কি ফলিবে, তাহা বড়লাট বাহাদুর না বুঝিলেও এই বাঙালী রাজনীতিজ্ঞ তাঁহার সহজ প্রতিভাবলে তাহা

হরিশ মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু প্যাট্রিয়ট

হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ও বিদ্রোহান্তে তিনি নিরপেক্ষভাবে ও অবিচলিত চিত্তে ভালকে ভাল ও মন্দকে মন্দ বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তিনি একদিকে যেমন সরকারের সর্বপ্রকার বৈধ শাসনকে সমর্থন করিতেন, তেমনি অপরদিকে ইংরাজগণের সর্বপ্রকার অবৈধ আচরণের পরম শত্রু ছিলেন। শোনা যায় লর্ড ক্যানিংএর আর্দালী হিন্দু প্যাটরিয়ট্ ছাপা হওয়ামাত্র লইয়া যাইত।

সিপাহী বিদ্রোহ দমন হইল। প্রাচীন ভারতের ভারত-স্বাধীন করিবার শেষ চেষ্টা মঙ্গলের জন্যই ব্যর্থ হইল। এ দেশের শাসনভার কোম্পানীর হস্ত হইতে বৃটীশ পার্লামেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিলেন; ইহার ভাল মন্দ ফলাফল দেশের লোক বড় কেহ বুঝিল না। ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে এলাহাবাদের দরবারে বড়লাট লর্ড ক্যানিং মহারাণী

কোম্পানী শাসন হইতে পার্লামেণ্ট

ভিক্টোরিয়ার রাজকীয় ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন। এই শুভদিনে ভারতের সর্বত্রই এই ঘোষণাপত্র পঠিত হইল। উত্তর ভারতের ভীত, আতঙ্কিত জনসাধারণের মনে পুনরায় সাহস ও প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। এই ঘোষণাপত্রকে ভারতের একটি অমূল্য দলিল বলিয়া এতদ্দেশীয় রাজনীতিজ্ঞেরা বহুকাল গর্ব করিতেন; কিন্তু ইহা কেমনভাবে এ-পর্য্যন্ত পালিত হইয়া আসিতেছে তাহার আলোচনা এখানে প্রয়োজন নাই।

এই সব রাজনৈতিক ঘটনার পাশে মানুষের মনকে নাড়া দিতে পারে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিতেছিল। ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্গ-সমাজের পক্ষে মাহেন্দ্র-ক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে

সামাজিক বিপ্লব

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন, নীলের হাঙ্গামা ও হরিশ মুখোপাধ্যায়ের প্যাট্রিয়টে ঘোর প্রতিবাদ, বাংলা-সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে ঈশ্বর গুপ্তের

তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, "সোমপ্রকাশের" অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন ও হিন্দুসমাজের মধ্যে রক্ষণশীল দলের জাগরণ এবং ধর্ম্ম ও সমাজ সংরক্ষণের প্রয়াস, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার বহুল প্রচলন প্রভৃতি ঘটনাগুলি প্রায় একই কালে ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটি বঙ্গসমাজকে এমন প্রবলরূপে আন্দোলিত করিতেছিল যে প্রত্যেকটিরই পৃথক ইতিবৃত্ত গভীরভাবে আলোচনীয়।

ভারতের সাধারণ অধিবাসীদের মনে জাতীয় ভাব উদ্বুদ্ধ করিতে ও শাসিত ও শাস্তা অথবা ইংরাজ ও এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিরোধ ও দূরত্ব সৃষ্টি করিতে যে সব ঘটনা অত্যন্ত প্রকোটভাবে সাহায্য করিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে ঐ যুগের নীলকরের হাঙ্গামা। নীলকরের ব্যাপার রায়ত ও সাহেব কুটীয়ালের গ্রাম্য রাজনীতি ছিল; কিন্তু তাহাই ক্রমে দেশের আলোচনা, আন্দোলনের বিষয় হইল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই যশোহর, নদীয়া, পাবনা প্রভৃতি জেলাতে ইংরাজ বণিকেরা কোম্পানী করিয়া নীলের চাষ আরম্ভ করেন। তাঁহারা অল্প ব্যয়ে অধিক আয় করিবার উদ্দেশ্যে যে-সব পন্থা অবলম্বন করিতেন, তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়। দরিদ্র কৃষকগণ নীলকরদের নিকট হইতে অর্থদাদন লইত; এবং একবার দাদন লইলে তাহার জটিল জাল হইতে সহজে উদ্ধার পাইত না; ফলে তাহারা নীলকরদের দাসরূপে পরিণত হইত। নীলকরগণ জোর করিয়া উৎকৃষ্ট জমিতে নীল বুনাইত, বলপূর্ব্বক তাহাদিগের গোলাঙ্গলাদি ব্যবহার করিত; আদেশানুসারে কাজ করিতে না পারিলে বা না চাহিলে প্রহার, কয়েদ, গৃহদাহ প্রভৃতি নৃশংস অত্যাচার চলিত। ভদ্র গৃহস্থকে অপরাধী মনে করিয়া নীলকরগণ কঠোর শাস্তি দিতে দ্বিধা বোধ করিত না। এমন কি আবিষ্কারের ভয়ে কোনো কোনো আসামীকে বন্দী করিয়া এক কুঠি হইতে অপর কুঠিতে চালান করা

নীলকরের হাঙ্গামা ও ইংরাজ বিদ্বেষ

হইত; এমনও হইয়াছে যে সে-লোকের পরে আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সকল অত্যাচার এতই অসহ্য ও রায়তদের প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা এমন একান্ত হইয়া উঠিল যে গভর্ণমেণ্ট নূতন আইন করিতে বাধ্য হইলেন। তাহাতে বিবাদ মিটিল না। রায়তেরা ধর্ম্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে নীলের দাদন তাহারা লইবে না, নীলের চাষও করিবে না। ইহাতে নীলকরগণের উপদ্রব আরও বাড়িল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী-দের সকল সময়ে প্রতিকার পাওয়া যাইত না। তখনও বাংলাদেশের গ্রামের মধ্যে প্রাণ ছিল, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধের কথা তখন কেহ কল্পনা করিত না; সুতরাং রায়তেরা একজোটে নীলকরগণকে বাধা দিতে লাগিল। যশোহর জেলায় গ্রামের মধ্যে এই সময়ে যুবক শিশিরকুমার ঘোষ খুবই কাজ করিয়াছিলন। কলিকাতায় শিক্ষিত মহলে এই আন্দোলন ক্রমে সুরু হইল। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে' নীল-করের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক লিখিতে আরম্ভ করেন। স্যর পিটার গ্রাণ্ট ছিলেন সেই সময়কার ছোটলাট। তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। একবার দেশভ্রমণে বাহির হইয়া ছোটলাট বাহাদুর নীলের বিরুদ্ধে রায়তদের মনোভাব কিরূপ তীব্র তাহার আভাস পাইয়াছিলেন। অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক বুঝিয়া গভর্ণমেণ্ট এক কমিশন বসাইলেন। তদন্ত-বৈঠকের প্রতিবেদন ও তদুপরি ছোটলাট বাহাদুরের মন্তব্যে নীলকর সাহেবদের অসংখ্য কুকীর্ত্তি ও অত্যাচার কাহিনী প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইহার পর রায়তদের অনেক অভিযোগ দূর হইল।

'নীলদর্পণ' ও লঙের কারাগার

কিন্তু ইংরাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও আলোচনা দেশময় শাস্তা ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান বাড়াইতে লাগিল। নীলকরগণের কুৎসিত ব্যবহার সাধারণ লোকের মনে কেবল ঘৃণার ছাপ রাখিয়া গেল। এই সময়ে

আবার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটক অ-নামে প্রকাশিত হইল। এই নাটক শিক্ষিত সমাজের মনের মধ্যে নীলকরের অত্যাচারের যে চিত্র অঙ্কিত করিল, তাহা জাতীয় আত্মবোধ উদ্বোধিত করিতে সহায়তা করিল।

হরিশ্চন্দ্র অল্প বয়সে মারা যান। নীলকর সাহেবগণ তাঁহার উপর এমনি বিরক্ত ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নীর উপর প্রতিশোধ লইতেও তাহারা কুণ্ঠাবোধ করে নাই। মোকর্দ্দমায় বিধবা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যান। 'নীলদর্পণে'র অনুবাদের জন্য লঙ্‌ সাহেবের কারাবাস ও জরিমানা হয়। জরিমানার টাকা কালীপ্রসন্ন সিংহ আদালতে গিয়া দিয়া আসেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব

শিক্ষিত সমাজের অন্তরের মধ্য দিয়া তখন ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের ঝড় চলিতেছিল। ১৮৬৫ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমাজ ত্যাগ করিয়া স্বয়ং নূতন সমাজ সৃষ্টি করিলেন। ভারতের জাতীয় ইতিহাসে বর্ত্তমানে এই ঘটনাটি অকিঞ্চিতকর বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব সমগ্র ভারতের সমাজ-তন্ত্রকে নাড়াচাড়া দিয়াছিল একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ধর্ম্ম-উপদেশ দান ও নির্বিচারে একই সামাজিক অধিকার সকলকে দানের কথা ভারতবর্ষ বহুকাল হইতে ভুলিয়া ছিল; ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা প্রচার করিয়া দেশের মধ্যে নূতন শক্তি সৃষ্টি করিল ও স্বাধীন চিন্তার পথ প্রদর্শন করিল।

এই সময় হইতে ভারতের সহিত বিলাতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আরম্ভ হয়। বাংলাদেশ হইতে কৃতি ছাত্রগণ বিলাতের পরীক্ষার পাশ দিবার জন্য ইংলণ্ড গমন করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম I. C. S.; শ্রীমনোমোহন ঘোষ প্রথম হিন্দু ব্যারিষ্টার। ইঁহাদের আগমনের

কিছুকাল পরে আরও তিন জন যুবক সিবিল সার্বিসের জন্য গমন করেন। তাঁহাদের নাম উত্তরকালে বাংলাদেশে কেন, সমগ্র ভারতে সুপরিচিত হয়। ১৮৬৩ শ্রীবিহারীলাল গুপ্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক সঙ্গে বিলাতে গমন করেন। তাঁহারা সিভিল সার্ভিস পাশ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ লইয়া ফিরিয়া আসিলে লোকে বুঝিল বাঙালীর ছেলে মেধায় শক্তিতে ইংরাজের ছেলের অপেক্ষা হীন নহে। জাতীয় আত্মশক্তি বোধের ইহাও অন্যতম কারণ। উত্তরকালে এই তিনজন বাঙালীই ভারতের জাতীয় জীবন গঠনে বিশেষভাবে সহায়তা করেন; শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্তই শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের পৃথক বিচারের বিরুদ্ধে যে পত্র লেখেন তাহারই ফলে ইলবার্ট বিলের আন্দোলন সুরু হয়। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ইংরাজজাতি কেমন করিয়া ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস করিয়াছে তাহার ইতিহাস লিখিয়া অমর হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ "Bengalee" দৈনিক প্রকাশ করিয়া ও নানাভাবে দেশের সেবা করিয়াছেন। নব্যবঙ্গের বিধিসঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরু তিনিই। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ভারতের প্রথম 'জাতীয় সঙ্গীত' রচয়িতা। মোট কথা য়ুরোপের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হওয়াতে বাঙালী যুবকদের মনে জাতীয়তার ভাব বৃদ্ধিই পাইল, এবং তাঁহারা যে ইংরাজের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন।

বিলাতের সহিত ভারতীয় ছাত্রদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ

এই সময়ে বাংলার একদল শিক্ষিত যুবক বাংলার অতীত গৌরব স্মরণ করাইবার জন্য ও বিশেষভাবে হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করিবার জন্য "হিন্দুমেলা" স্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় প্রথমে এই হিন্দুমেলার Idea প্রকাশ করেন। শ্রীনবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ছিলেন ইহার উদ্যোক্তা।

১৮৬৭ সাল হইতে প্রতি বৎসর 'হিন্দুমেলা' খুব জাঁকের সহিত করা হইত। কলিকাতায় অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি এই মেলায় যোগ দিতেন এবং ঐ মেলায় প্রদর্শনের জন্য নানাপ্রকার জিনিষ পাঠাইতেন; নানাপ্রকার ফল মূল ও পুষ্প এবং শিল্পকার্য্য প্রদর্শিত হইত; একবার একখানি তাঁতও ছিল। মেলা উপলক্ষে ব্যায়াম, ক্রীড়া ও পাইকদিগের খেলা হইত এবং কবিতাও পঠিত হইত; কেহ কেহ বক্তৃতাও করিতেন। আমাদের শিল্প ধ্বংস হইতেছে একথা স্বদেশী আন্দোলনের প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে এই যুবকেরা বুঝিয়াছিলেন; মনোমোহন বসু দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—

'হিন্দুমেলা' ও প্রথম জাতীয়ভাব

"দেশে তাঁতি কর্ম্মকার, করে হাহাকার
সুতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার।"
আমাদের দেশলাই কাঠি তাও আসে পোতে
খেতে শুতে বস্‌তে প্রদীপ জ্বালাতে—
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।"

জাতীয় ভাবে জাতীয় সঙ্গীত রচনা ইতিপূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম জাতীয় সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। (কংগ্রেস—হেমেন্দ্রপ্রসাদ)

বোম্বাইএর বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন দশ বৎসর কাল নানারূপ লোকহিতকর কাজ করিয়া ১৮৬১ সালে লোপ পায় এবং ১৮৭১ সালে উহা পুনর্গঠিত হইলেও পূর্বের ন্যায় শক্তিশালী হইতে পারিল না। বোম্বাই ছিল পার্শীদের আন্দোলনের কেন্দ্র। পুণানগরী মারাঠাদের জাতীয় জীবনের কেন্দ্র ছিল। ১৮৭৫ কি ৭৬ সালে এইখানে কৃষ্ণজী লক্ষণলুলকর সীতারাম হরি চিপলুণকর, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে প্রভৃতি মারাঠা গৌরবগণ "সার্ব্বজনিক সভা" স্থাপন

বোম্বাইতে রাজনীতি

করেন। পরযুগে বোম্বাই প্রদেশে যে জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হয় তাহার সূচনা এই সময়ে।

মাদ্রাস প্রদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইতে সময় লাগিয়াছিল। এই প্রদেশের অভাব অভিযোগ ও জনমত স্থাপনের জন্য ঐ সময়ে কোন ভাল সংবাদপত্র পর্য্যন্ত ছিল না। শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য আয়ার (ইনি স্যর সুব্রহ্মণ্য নহেন) বীর রাঘবচারিয়ার ও আরও কয়েকজনে মিলিয়া একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। ইহার নাম রাখা হইল "হিন্দু।"

মাদ্রাসে রাজনীতি ও "হিন্দু" পত্রিকা

পত্রিকাখানি প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল, কয়েক বৎসর পরে দৈনিকে পরিণত হয়। সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রায় বিশ বৎসর কাল 'হিন্দু'র সম্পাদকতা করেন। তাঁহার সম্পাদকতায় 'হিন্দু' দক্ষিণ ভারতের সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। ইহা ক্রমে ভারতের জাতীয় দলের মুখপত্ররূপে পরিগণিত হয়। ইহা স্বাধীনভাবে জনমত ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করে। সুব্রহ্মণ্য আয়ারের প্রবন্ধাবলী সমগ্র মাদ্রাসকে কেন ভারতবর্ষকে আন্দোলিত করিত। লর্ড রীপণ কোন গুরুতর বিষয়ে জনমত জানিতে হইলে, প্রথমেই হিন্দু পত্রিকা খুলিয়া দেখিতেন। ১৮৮৪ সালে মাদ্রাসে "মহাজন সভা" স্থাপিত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যে উক্ত প্রদেশের সকল শ্রেণীর লোকের অনুকূলতা ও উৎসাহ পাইয়া এই সভা মাদ্রাসে খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

১৮৬৯ হইতে ১৮৮০ সালের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটিল, যাহার ফলে দেশের মধ্যে দেশাত্মবোধ বৃদ্ধি পাইল। লর্ড মেয়ো যখন ভারতের বড়লাট, তখন শাসন পদ্ধতির মধ্যে কতকগুলি সংস্কার সাধিত হয়। এ যাবৎ প্রাদেশিক শাসন কেন্দ্রগুলির বিশেষ কোন স্বাধীনতা ছিল না—সামান্য ব্যয় করিতে হইলেও ভারত

প্রাদেশিক শাসনের দায়ীত্ব বৃদ্ধি

সরকারের অনুমতি লইতে হইত। লর্ড মেয়ো ভারত সরকার হইতে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাসমূহের কতকগুলি বিষয়ে স্বাধীন করিয়া দিলেন। ইহাতে প্রাদেশিক শাসনের দায়ীত্ব ও গুরুত্ব কিয়দ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ইঁহার সময়ে (১৮৬৯) মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা ভারত-ভ্রমণে আসেন। ইংলণ্ডের রাজপরিবারের সহিত ভারতের সাক্ষাৎ পরিচয় এই প্রথম। লর্ড নর্থব্রুকের সময়ে ১৮৭৫ সালে স্বয়ং প্রিন্স অব্ ওয়েলস (পরে সপ্তম এডোয়ার্ড) ভারত পরিদর্শন করিতে আসেন। সে সময়ে ভারতের আপামর সাধারণে রাজভক্তির যে নিদর্শন দেখাইয়াছিল তাহা দেখিয়া রাজকুমার খুবই প্রীত হইয়াছিলেন।

লর্ড লীটনের শাসন

১৮৭৬ সালে লর্ড লীটন ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও বড়লাট হইয়া আসিলেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক লর্ড লীটন ছিলেন ইঁহার পিতা। বড়লাট বাহাদুর পিতার সাহিত্যানুরাগ পাইয়াছিলেন; কিন্তু ভারতের ন্যায় সুবৃহৎ দেশের পরিচালক হইবার মত অশেষগুণ তাঁহার ছিল না। ভারতের শাসনভার লইবার কয়েক মাস পরেই তিনি ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারতের প্রাচীন রাজধানী দিল্লীতে মুসলমান বাদসাহগণের কায়দায় এক বিরাট দরবার আহ্বান করেন ও মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বৃটীশ শাসনকালে এমন জাঁকজমক, এত অর্থব্যয় করিয়া বৃটীশরাজের গৌরব প্রদর্শন করা হয় নাই। সুতরাং সাধারণ লোকের মনের উপর ইহার প্রভাব খুবই ভাল হইল। কিন্তু দেশের শিক্ষিত সমাজ ইহাতে সুখী হইতে পারিলেন না; তাঁহাদের কাছে এই অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে ভারতের দৈন্যের কথা, দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। শিক্ষিত সমাজের অসন্তোষের আরও একটি কারণ ছিল [illegible] লোক

অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছিল। অনুমান ৫২ লক্ষ লোক অনাহার ও অনাহারজনিত পীড়ায় মারা পড়ে। ভারতের দক্ষিণে দারুণ দুর্ভিক্ষজনিত অন্নাভাব, আর উত্তর-ভারতে দরবারে আনন্দউচ্ছ্বাস ও অপরিমিত ব্যয়-বাহুল্য—এই অসামঞ্জস্য শিক্ষিত শ্রেণীকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিল।

দক্ষিণের দুর্ভিক্ষ ও দিল্লীর দরবার

লীটনের সময়ে ভারত-সীমান্তে আফগনিস্থানের সহিত দ্বিতীয়বারের যুদ্ধ হয়; ভারতের রাজকোষ হইতে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই সীমান্ত-সমর চালানো হইল; এ ছাড়াও বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়া পশ্চিম সীমান্ত সুদৃঢ় করা হইল। ভারতের প্রজার প্রদত্ত অর্থ হইতে ভারতের বাহিরের যুদ্ধের ব্যয় কেন দেওয়া হইবে, তাহা শিক্ষিত শ্রেণী বুঝিতে অক্ষম হইয়া খুবই আন্দোলন ও সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

সীমান্ত যুদ্ধ ও সমর ব্যয়

আরও দুইটি কাজের জন্য লীটন ভারতবাসীদের নিকট চিরকালের মত অপ্রিয় হইয়া গেলেন। প্রথমটি হইতেছে অস্ত্র আইন বা Arms Act। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষকে একবার নিরস্ত্র করা হয়। লীটনের সময় এক Arms Act পাশ হয়; দেশীয়দের পক্ষে বন্দুক তরবারি প্রভৃতি আত্মরক্ষার সম্বল রক্ষা করা দোষণীয় বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু য়ুরোপীয় বা য়ুরেশীয়দের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ হইল না; ইহাতেও এদেশের লোকেরা আপনাদিগকে অপমানিত ও বঞ্চিত বোধ করিতে লাগিল। দেশীয় বিদেশীয়দের মধ্যে এই ভেদ রাজনীতির দিক হইতে খুবই অবিবেচনার কাজ হইল। লীটনের দ্বিতীয় অবিবেচনার কাজ হইল দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ।

Arms Act পাশ

কিছুকাল হইতে দেশীয় কাগজগুলি গভর্ণমেন্টের কার্য্যকলাপ সমা-

লোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সরকার-পক্ষীয়েরা বলিতেন যে দেশীয় কাগজের যে-সব নমুনা পাওয়া যায়, তাহা মোটেই শ্রুতিসুখকর নহে। ১৮৭৮ সালের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে বড়লাটের সভায় এক আইন পাশ হইল; তাহার মর্ম্ম এই :—"বৃটীশ ভারতবর্ষে ভারত-বর্ষীয় ভাষার কোন সংবাদপত্র, পুস্তক বা কাগজাদিতে, গভর্ণমেণ্টের প্রতি সাধারণের অভক্তি জন্মাইবার, সাধারণ শান্তি নষ্ট করিবার, কিংবা গভর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারীর কোন কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত কোন কথা দৃষ্ট বা ছবি থাকিলে, যে ছাপাখানায় ঐ সংবাদপত্র, পুস্তক ও কাগজাদি ছাপা হয়, তাহার সমস্ত সরঞ্জাম গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিবেন। সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্রের মুদ্রাকর (প্রিণ্টার) ও প্রকাশককে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ কিংবা রাজধানীর পুলিশ কমিশনরের নিকট উপস্থিত হইয়া, নিয়মিত টাকা গচ্ছিত রাখিয়া, একখানি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে। ঐ সকল সংবাদপত্রের কোনখানিতে রাজ-ভক্তির বিরুদ্ধে, সাধারণ শান্তির বিরুদ্ধে অথবা সরকারী কর্ম্মচারীগণের শাসন-কার্য্যের বিরুদ্ধে, কোন কথা লেখা হইলে, সেই সংবাদপত্রের মুদ্রাকর ও প্রকাশক, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ অথবা পুলিশ কমিশনরের নিকট যে টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছেন, তাহা বাজেয়াপ্ত হইবে।"

দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ

লর্ড লীটনের ব্যবস্থাপক সভায় এ আইন সহজেই পাশ হইয়া গেল, কারণ তখন বে-সরকারী সভ্য নামেমাত্র থাকিত। এই আইন বিলাতের সেক্রেটারী অব্ ইণ্ডিয়ার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন; কিন্তু স্যর এরস্কিন পেরি, স্যর উইলিয়ম ম্যুর, কর্ণেল ইবুল, মান্দ্রাসের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর ডিউক অব্ বাকিংহাম, স্যর আর্থার হবহাউস এই চণ্ড-নীতির অত্যন্ত নিন্দা করিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন। স্যর এরস্কিন পেরি দীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া বলিলেন যে "এই আইন কেবল ভারত-বাসীদের অসন্তোষ-জনক নহে, আমরা রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে যে উদারনীতি

অবলম্বন করিয়াছি, তাহারও সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যেরূপ অনভিজ্ঞ, তাহাতে ভারতবর্ষীয় স্বাধীন সংবাদ-পত্র হইতে অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারি।" স্যর উইলিয়ম মূ্যর লিখিলেন যে "১৮৫৭ সালের ন্যায় ঘোরতর বিপদের সময় কিছুকালের জন্য এইরূপ আইন জারী করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে; কিন্তু এক্ষণে ভারত-বর্ষে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজ করিতেছে।" তিনি স্বেচ্ছাচারী ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দিবার বিরোধী ছিলেন। তা ছাড়া উপস্থিত আইন ইংরেজী সংবাদপত্রসমুদয়কে বাদ দিয়া কেবল দেশীয় সংবাদপত্রসমুদয়কেই নিগড়বদ্ধ করিয়া বৃটীশ-সরকার পক্ষপাতিত্ব দোষে দূষিত হইতেছেন। কর্ণেল ইয়ুলও ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ডিউক অব্ বাকিংহাম, হবহাউস সকলেই নানাদিক হইতে এই আইনের বিরুদ্ধে লিখিলেন। কিন্তু অবশেষে উহা পাশ হইয়া গেল।

ইণ্ডিয়া অফিসের অনেকের বাধা সত্ত্বেও পাশ হইল

'দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ যে-সকল বিষয় কঠোরভাবে আন্দোলন করিত, তাহা এই,—প্রথমত য়ুরোপীয়দের অধিক অধিকার, এক অপরাধে য়ুরোপীয় ও এতদ্দেশীয় অপরাধীদিগের দণ্ডের প্রভেদ; য়ুরোপীয়দের ঔদ্ধত্য ও দেশীয়দের প্রতি অসদ্ব্যবহার; ইংরাজ সংবাদপত্রের বিদ্বেষভাবের পাল্টা জবাব; এবং দেশীয় রাজদরবারে রেসিডেণ্টদের অনিষ্টজনক অসদ্ব্যবহার।' (হবহাউসের মন্তব্য হইতে)। এই সব বিষয়ের তীব্র সমালোচনা হইত, কিন্তু বিদ্রোহ-প্রচার কখনো হয় নাই। এই সময় বাংলাদেশের একখানি পত্রিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা শিশিরকুমার ঘোষ সম্পাদিত "অমৃতবাজার পত্রিকা।" এই পত্রিকাখানি ১৮৬৮ সালে যশোহরের একটি গ্রাম হইতে প্রকাশিত হয়। আরম্ভ হইতে শিশিরকুমার ইংরাজ কর্ম্মচারী ও কুটীয়ালদের কুকীর্ত্তির কথা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সরকার

শিশিরকুমার ও "অমৃতবাজার"

বহুবার শিশিরকুমার ও তদীয় পত্রিকাকে জব্দ করিবার চেষ্টা করেন। অবশেষে ১৮৭৮ সালের ৯ আইন পাশ হইবে জানিতে পারিয়া শিশিরকুমার যথাসময়ে পত্রিকাকে 'ইংরাজী' ভাষায় প্রকাশ করিলেন। বাংলার জাতীয়-জীবনের ইতিহাসে এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি সে যুগের তেজস্বিতার পরিচায়ক। আইন পাশ হইলে লীটন যে বিদ্বেষ ও অসন্তোষ দূর করিবেন ভাবিয়াছিলেন, ফলে তাহার বিপরীতটি ঘটিল; শাসক ও শাসিতের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধান বাড়িয়া চলিল। লীটনের এই হঠকারিতা ও রাজনীতিজ্ঞ-অনুচিত কার্য্য জাতীয় আন্দোলনকে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিল।

বিবিধ রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও আধ্যাত্মিক কারণের সমাবেশ, ও ইংরাজী-শিক্ষার গুণে পাশ্চাত্য-জগতের সহিত তুলনামূলক ভাবে বিচার করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায়, ভারতের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে একটা রাজনীতিক চেতনা জাগিয়া উঠিতেছিল। এই অসন্তোষ প্রকাশের প্রথম প্রয়াস ১৮৭৬ সালে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন। পূর্বোল্লিখিত বৃটীশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সভা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নব্য বঙ্গের আশা আকাঙ্ক্ষার পক্ষে এই পুরাতন প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট ছিল না। যুবক সুরেন্দ্রনাথ ইহার কিছুদিন পূর্বে সিবিল সার্বিস হইতে লাঞ্ছিত হইয়া দেশের দিকে মন সংযোগ করিলেন ও দেশসেবায় ব্রতী হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ, রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম যুবক নেতা ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা, পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজন তেজস্বী যুবক এই নুতন সভা স্থাপন করিলেন। শ্যামাচরণ সরকার ইহার প্রথম সভাপতি; তাঁহার পরে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি হন; আনন্দমোহন ইহার প্রথম সম্পাদক।

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্

ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন স্থাপিত হইবার পর এক বৎসরে বিলাতের সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় প্রবেশের বয়স কমাইয়া উনিশ বৎসর করা হইল। কিছুকাল হইতে ভারতবাসীরা এই পরীক্ষায় সসম্মানে পাশ করিয়া সিবিল সার্বিসের কার্য্য পাইতেছিল। এই ব্যবস্থা ইংলণ্ডের চাকুরী-অন্বেষী যুবকদের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়াই হউক, অথবা ভারতীয় যুবকের পক্ষে উচ্চ রাজকর্ম্ম সুলভ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় মনে করিয়াই হউক, বিলাতে সিবিল সার্বিস সম্বন্ধে উনিশ বৎসরের এই অদ্ভুত নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া লোকের সন্দেহ হইল। উনিশ বৎসর বয়সের মধ্যে ভারতীয় বালকদের পক্ষে এ দেশের উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া বিলাতে গিয়া উক্ত সময়ের মধ্যে সিবিল সার্বিসে প্রবেশ লাভ করা খুবই কঠিন। বিলাতে ও ভারতবর্ষে এককালীন সিবিল সার্বিসের পরীক্ষা গৃহীত হইবার জন্য কিছুকাল হইতে এদেশে আন্দোলন চলিতেছিল; এক্ষণে এই নিয়ম পাশ হওয়াতে শিক্ষিত যুবকগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। কলিকাতায় বিরাট সভা করিয়া ভারত-সচিবের এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা হইল। ১৮৭৭ সালে ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন যুবক সুরেন্দ্রনাথকে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রচারকরূপে নানাস্থানে প্রেরণ করিলেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ও পঞ্জাবের প্রত্যেকটি প্রধান নগরীতে গিয়া সিবিল সার্বিসের বয়স বৃদ্ধি ও একইকালে বিলাতে ও ভারতে পরীক্ষা-গ্রহণের প্রস্তাব করিয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়াইলেন। পর বৎসরেও তিনি পশ্চিম-ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে এই উদ্দেশ্যে গমন করেন। তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলন কি লইয়া হইত ভাবিলে বর্ত্তমানে অনেকের আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহাই বর্ত্তমানের সূচনা; এবং উত্তরকালে, যে সুরেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের একছত্র নেতা ও রাজনৈতিক গুরু বলিয়া দেশের পূজা পাইয়াছিলেন, তাঁহারও রাজনীতিতে হাতে-খড়ি এইখানে।

সিবিল সার্বিস ও রাজনীতি

সুরেন্দ্রনাথ ও রাজনীতি

ভারতবর্ষের অভাব অভিযোগের আলোচনা ও আন্দোলন যে কেবল এদেশেই হইতেছে তাহা নহে; ইংলণ্ডে ভারতের দুই একজন বন্ধু চিরদিনই দেখা গিয়াছে। তাঁহারা ভারতের প্রতি সুবিচারের জন্য বরাবর আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। কোম্পানী আমলের প্রথম দিকে মহামতি বার্ক (Burke), ও উহার শেষের দিকে Henry St. George Tucker-এর মত লোক স্বজাতিদের অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। জন ব্রাইট্ (John Bright) চিরদিন ভারতের জন্য পার্লামেণ্টে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে প্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত মিঃ ফসেট (Fawcett) ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন।

বিলাতে ভারত-বন্ধু

১৮৬৫ সালে মিঃ ফসেট পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হন। ভারতের শাসনকার্য্যে ভারতবাসীদের সংখ্যা ও সামর্থ্য এত অল্প বলিয়া তিনি প্রতিনিয়ত তাহার তীব্র সমালোচনা করিতেন। কিন্তু পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান এত অল্প এবং সভ্যদের জানিবার ঔৎসুক্যও এত ক্ষীণ যে, তাঁহার সকল যুক্তি তর্ক অরণ্যে রোদনের ন্যায় ব্যর্থ হইত।

সিভিল সার্বিসের পরীক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত ভারতীয়দের সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়াছিল। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে বিলাতে এবং ভারতবর্ষের কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাস মহানগরীতে একই কালে competitive পরীক্ষা গৃহীত হউক। ১৮৭১ সালে তাঁহার সভাপতিত্বে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য এক রাজকীয় কমিশন বা তদন্তবৈঠক বসে। ১৮৭৪ সালে পার্লামেণ্টের নূতন নির্বাচনের সময় মিঃ ফসেট্ পরাভূত হইয়া সভ্যশ্রেণীচ্যুত হন। কলিকাতার অধিবাসীরা তাহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে ৭৫০০ টাকা উপঢৌকন দিয়া পুনরায় সভ্য হইবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। এই সময়ে ভারতের জনমত সুস্পষ্ট

মিঃ ফসেট্ ও ভারতীয় বজেট

আকার ধারণ করে নাই বলিয়া, তৎকালীন ভারত-সচিব ও গভর্ণরগণ এমন সব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, যাহার জন্য সমগ্র ইংরাজ জাতি কলঙ্কের ভাগী হইয়া উত্তরকালে নিন্দিত হইয়াছে। ১৮৭৫ সালে লর্ড সেলিসবেরী ভারতের রাজকোষ হইতে অর্থ লইয়া রাজ-অতিথি তুর্কী-সুলতানকে ভোজ দিলেন। ভারতবর্ষ হইতে ইহার ব্যয় কেন প্রদত্ত হইল—এবিষয়ে ফসেট সাহেব প্রতিবাদ করেন। লর্ড সেলিসবেরীর এই কার্য্যকে তিনি 'মহৎ নীচত্ব' বলিয়া অভিহিত করেন। এই সময়ে আবিসিনিয়ার সহিত ইংরাজদের এক যুদ্ধ হয়। ভারতবর্ষে আসিতে পথে আবিসিনিয়ার উপকূল পড়ে; ভারতবর্ষে ইংরাজদের আসা-যাওয়ার পথে যুদ্ধ হইল বলিয়া, উহার ব্যয় ভারতকে বহন করিতে হইবে স্থির হইল; ফসেট ইহারও প্রতিবাদ করিলেন ও অবশেষে স্থির হইল ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে ভারতসরকার অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করিবেন, অপরার্দ্ধ বৃটীশ রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে! ১৮৬৯ সালে ডিউক অব্ এডিনবরা ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি এদেশে ভ্রমণকালে ভারতীয় রাজাদিগকে কিছু কিছু উপঢৌকন দিয়াছিলেন; এই উপঢৌকন (!) বৃটীশ রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইল না, ভারতের অর্থভাণ্ডার হইতেই তাহা গৃহীত হইল! প্রিন্সঅব্ ওয়েলস ভারত-সাম্রাজ্য পরিদর্শন করিতে আসিলেন; সেই ভ্রমণের ব্যয় সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষ হইতে আদায় করিবার কথা উঠিল; মিঃ ফসেট এই অদ্ভুত বিচারের ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু ফল বিশেষ হইল না; তিনলক্ষটাকা ভারতবর্ষের রাজকোষ হইতে দিতে হইল। এই সব ব্যবহারের ফলে ভারতের শিক্ষিতশ্রেণীর মন যে ক্রমেই তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা সে-যুগের অদূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞেরা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা দেশের জনমতকে অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্যশাসন করিতে চাহিতেছিলেন এবং জনমত যখন তীব্র সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিল, তখনই তাহার

রাজনৈতিক অদূরদর্শীতা

মুখবন্ধ করিয়া দিয়া ভাবিলেন রোগের প্রতিকার হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে দূরত্ব ও বিরোধ বাড়িয়া চলিল।

১৮৮০ সালে বিলাতে রাজনৈতিক রক্ষণশীল দলের পরাজয় হইলে লর্ড লীটন কাজ ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার স্থানে মহামতি লর্ড রীপন ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও শাসক হইয়া আসিলেন। রীপন উদারনীতিতে বিশ্বাস করিতেন, মানুষকে বিশ্বাস করিয়া সন্দেহ করিতেন না, বা দায়িত্ব দান করিয়া ভয় পাইতেন না। ভারতে আসিয়া তাঁহার প্রথম কাজ হইল আফগানিস্থানের আমীরের সহিত সন্ধিস্থাপন ও সখ্যবন্ধন। রীপন আমীরের সহিত যে সখ্যস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা প্রায় চল্লিশ বৎসর অক্ষুণ্ণ ছিল, এমন-কি মহাযুদ্ধের ঘোর দুর্দ্দিনেও তাহা অটুট ছিল। রীপন আর একটি উদার কর্ম্মের জন্য জনপ্রিয় হইলেন। মহীশূরের মিত্ররাজ্য ১৮৩১ সালে কু-শাসনের জন্য বৃটীশসরকার স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করেন। ত্রিশ বৎসর পরে ১৮৬১ সালে সরকার এই প্রাচীন রাজ্য প্রাচীন হিন্দু রাজপরিবারের হস্তে সমর্পণ করিতে মনস্থ করেন; কিন্তু সে সময়ে রাজা নাবালক ছিলেন। ১৮৮১ সালে রীপন মহীশূরের প্রাচীন রাজ্যে হিন্দু রাজপরিবারের রাজাকে অভিষিক্ত করিলেন। ইহাতে বৃটীশরাজের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়িল।

রীপন ও উদারনীতি

দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে যে আইন লর্ড লীটন ১৮৭৮ সালে পাশ করিয়াছিলেন, তাহা রীপন উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে দেশের লোক যেন নিশ্বাস ফেলিয়া আরাম বোধ করিল, সরকারও দেশীয় জনমত জানিয়া নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইলেন। এই সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় রীপন মহোদয় ঘোষণা করিলেন যে জাতীয় স্বরাজ্য পাইবার পূর্বে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন (Local Self-Government) প্রথমে প্রয়োজন। দেশের লোককে

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা; স্থানীয়-স্বায়ত্ত শাসন।

স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য ক্রমশ উপযুক্ত করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষ বহুযুগ পরাধীন ; আত্মনির্ভর, আত্মবিশ্বাস ও মিলিত হইয়া কার্য্য করিবার শক্তি তাহার নষ্ট হইয়াছে। সেই শক্তিবিকাশের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইল। তাঁহার সময় হইতে ম্যুন্সিপালটি ও লোকাল বোর্ডের শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়।

রীপন শাসন-বিভাগের অন্যান্য কোঠায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই সময়ে শাসন-কার্য্যের ভিতরে য়ুরোপীয় ও দেশীয়দের মধ্যে বিশেষ ভেদ করা হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিলাত-প্রত্যাগত বাঙালী যুবকগণের মধ্যে 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা'র জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত সিবিল সার্বিসের লোক ছিলেন। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিবার সময় এই বিসদৃশ ব্যবস্থার জন্য নিজেকে অপমানিত মনে করিলেন। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াও তাঁহার আদালতে শ্বেতাঙ্গ অপরাধী সাহেবের বিচার করিতে পারিবেন না। ১৮৮২ সালে তিনি বঙ্গের ছোটলাটের নিকট বিচারালয়ে এই বর্ণগত ভেদের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করিয়া এক মন্তব্যলিপি প্রেরণ করেন। পর বৎসর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তৎকালীন আইন-সদস্য (Law-Member) মিঃ ইলবার্ট এক বিল উপস্থিত করিলেন। বিলের মর্ম এই যে বিচারালয়ে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ কোনো ভেদ থাকিবে না। দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট শ্বেতাঙ্গের বিচার হইবে. এই প্রস্তাবে সমগ্র য়ুরোপীয় সমাজ ক্ষেপিয়া উঠিল। চারিদিকে বিলের বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন সুরু হইল ; য়ুরোপীয়েরা একযোগে ইহার প্রতিবাদ করিল। দেশময় Volunteer Organisation গঠিত হইল ; শ্বেতাঙ্গদের সহিত কৃষ্ণাঙ্গ ফিরেঙ্গিরা পর্য্যন্ত যোগদান করিয়া দেশময় ভীষণ আন্দোলন উত্থাপিত করিল। ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাট রীপন ব্যতীত আর কোন য়ুরোপীয় সদস্যই বিলের সমর্থন করেন নাই। বাহিরে সাহেবেরা আস্ফা-

ইলবার্ট বিলের রাজনীতিক শিক্ষা

জন করিয়া বেড়াইতে লাগিল ও বিল পাশ হইলে তাহারা কি করিবে সে সম্বন্ধে অনেক আজগুবী কল্পনা সাহেবমহলে ও বাঙালীমহলে ধোঁয়াইতে লাগিল। এমন কি বড়লাটকে জোর করিয়া জাহাজে তুলিয়া এদেশ হইতে বিদায় করিবে এরূপ কথাও তাহারা ভাবিয়াছিল। ভারতবাসীদের রাজনৈতিক আন্দোলনের চেষ্টা তখনো সুস্পষ্টাকার ধারণ করে নাই। তাহাদের বিচ্ছিন্ন ও ক্ষীণ কণ্ঠের ব্যর্থ আস্ফালনে সরকার ও বেসরকার ইংরাজ কর্ণপাত করিবার কোনো কারণ তখনো খুঁজিয়া পায় নাই। বিল পাশ হইল না; কিন্তু দেশীয় ও বিদেশীয়দের মধ্যে বিরোধ ও বিচ্ছেদের রেখাটা সুস্পষ্ট করিয়া অঙ্কিত হইল। ভারতবাসীদের চক্ষু খুলিয়া গেল; সংবদ্ধ শক্তি অল্প হইলে দেশমধ্যে কিরূপ আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার উদাহরণই ইলবার্ট বিল আন্দোলনের শিক্ষা। হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি ব্যঙ্গ-চিত্র সাহিত্যে রাখিয়া গিয়াছেন—সমসাময়িক রাজনীতির উহাই একমাত্র নিদর্শন।

লর্ড রীপনের সময়ে শিক্ষা সম্বন্ধে এক বৈঠক বসে। শিক্ষা এতদিন পর্যান্ত উপরের শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; বাংলাদেশে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমবেত চেষ্টায় বহুশত উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু শিক্ষা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আশানুরূপ বিস্তৃতি লাভ করে নাই। শিক্ষা-কমিশন দেশের 'দেশীয়' বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য উপদেশ দিলেন এবং মধ্য ও ইংরাজী শিক্ষার জন্ত দেশের লোকদের চেষ্টা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সেইদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। দেশে সস্তায় পাশ্চাত্য-শিক্ষা ক্রমশই বাড়িয়া চলিতেছিল। কিন্তু সে শিক্ষা কেবলই 'লেখা-পড়া'র শিক্ষা; চাকুরী, ওকালতী ও ডাক্তারী ছাড়া যুবকদের যাইবার পথ ছিল না। রাজনীতি, রাজ্যশাসন, সৈনিক-বিভাগ, নৌবিভাগ, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি কর্মে প্রবেশের উৎসাহ বা সুযোগ

রীপন ও শিক্ষা বিস্তার

তাহারা পাইত না। অথচ চাকুরীর সংখ্যা অসংখ্য নয়। দেশময় এই দরিদ্র 'ভদ্রলোক' যুবকদের আর্থিক অভাব জনিত কষ্ট দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার ও সভ্যতার প্রধান দোষ হইল যে, বহু সহস্র যুবক সামান্য ইংরাজী-শিক্ষা ও উপাধি পাইয়া দেশের নাড়ীর সহিত যোগছিন্ন হইয়া গেল। তাহারা যে-শিক্ষা পাইয়াছে তাহার ফলে বাহিরের জীবন সংগ্রামে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত; আবার গ্রামে ফিরিয়া পৈতৃক কর্ম্ম করিতেও অপারক ও অনিচ্ছুক। দেশের শিক্ষিত যুবকদের যথোপযুক্ত জীবিকা সংস্থান না হওয়ায়, সরকারী উচ্চপদগুলি সাহেব দিয়া পূর্ণ করায়, বে-সরকারী রেলওয়েতে বা সদাগরী অপিষ প্রভৃতিতে অনুরূপ নীতি অনুসৃত হওয়ায়, দেশের মধ্যে চঞ্চলতা ও অসন্তোষ বাড়িতে লাগিল। জাতীয় জাগরণের ইহাও অন্যতম কারণ।

মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের অন্নকষ্ট ও অসন্তোষ

———o———

দ্বিতীয় পর্ব

কংগ্রেস যুগ

ইলবার্ট বিলের পরাজয়ের আঘাত পাইয়া বাংলাদেশের মনীষিগণের মনে প্রথমে এই কথাটি জাগিল যে সমগ্রদেশের মিলিত ও সংবদ্ধ চেষ্টা ব্যতীত রাজনৈতিক আন্দোলন কার্য্যকারী হইবে না। মহারাজ যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর ধনে মানে সেই সময়কার শ্রেষ্ঠব্যক্তি; তাঁহারই নেতৃত্বে কলিকাতায় National League স্থাপিত হয়।

নেশনাল লীগ ও কনফারেন্স

১৮৮৩ সালে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এক জাতীয় মহাসভা (National Conference) আহ্বান করিলেন। কলিকাতার বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখস্থ পুরাতন 'আলবার্ট হলে' তিন দিন এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কংগ্রেসের কথা তখনো কেহ কল্পনা করেন নাই বটে; কিন্তু ঐ শ্রেণীর একটি প্রতিষ্ঠানের অভাব যে অনুভূত হইতেছিল, এই কন্‌ফারেন্স তাহার প্রমাণ। এই কন্‌ফারেন্সের প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিলেন আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রসভার কল্পনা এই সময়ে আর এক ক্ষেত্রে কতকগুলি মনীষির মনে উদিত হইয়াছিল। শ্রীমতী আনি বেসান্ত লিখিয়াছেন যে ১৮৮৪ সালে মাদ্রাসে থিওজফিক্যাল সোসাইটির যে অধিবেশন হয়, তাহাতে যে সব প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়জন ও তাঁহাদের কয়জন বন্ধু মোট ১৭ জন দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাওয়ের গৃহে সমবেত হইয়া এ বিষয়ের আলোচনা করেন।

কংগ্রেসের প্রথম আভাস,

"হিন্দু" সম্পাদক সুব্রহ্মণ্য আয়ার, আনন্দচার্লু, নরেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি সেদিন উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মনের মধ্যে এই অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা জাগিল যে নিখিল ভারতের প্রতিনিধিদের

লইয়া রাজনীতি চর্চ্চা করিতে হইবে। ইহাই কংগ্রেস-স্থাপনের প্রত্যক্ষ কারণ না হইলেও পূর্ব্বোক্ত কনফারেন্সের ন্যায় দেশের সুধীগণের মনে একটা মিলিবার ইচ্ছা জাগ্রত করিল।

ঠিক এই সময়ে সরকারী মহলেও এই লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। ভারতবাসীদের রাজনীতি চর্চ্চার জন্য আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া একজন সহৃদয় ইংরাজ সেটিকে আকার দানের ইচ্ছা করিলেন। এই মহানুভব রাজকর্মচারীর নাম মিঃ এ, ও, হিউম। ইনি সিবিল সার্বিসের লোক ছিলেন। তাঁহার চারিত্র-মাধুর্য্যে তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের দুর্দিনে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে প্রজাদের শান্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভারতবাসীদের আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্গতি দূর করিবার জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা বহুদিনের। ১৮৮৩ সালে কম হইতে অবসর লইয়া মিঃ হিউম শিক্ষিত ভারতবাসীদের সাধুচেষ্টা, সদুদ্দেশ্য ও ন্যায্য দাবীর সহিত আপনাকে অঙ্গীভূত করিলেন। তাঁহার মনে হয় যদি বৎসর বৎসর ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সমবেত হইয়া সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা করেন, তবে তাহাতে সুফল ফলিতে পারে। প্রথমে তিনি উক্ত সভায় রাজনীতিক আলোচনা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৮৮৫ সালে তিনি তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফরিণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করেন। লর্ড ডাফরিণ বলিলেন, বিলাতে যেমন একদল মন্ত্রী হইয়া শাসনকার্য্য পরিচালন করেন, আর একদল প্রতিপক্ষ (Opposition) থাকেন, এদেশে তেমন নাই। এদেশের সংবাদপত্রে লোকমত প্রতিফলিত হইলেও, তাহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। এ অবস্থায় ভারতীয় রাজনীতিকেরা যদি বৎসর বৎসর সমবেত হইয়া শাসনপ্রণালীর দোষ ত্রুটি দেখাইয়া দেন ও সংশোধনের উপায় নির্দেশ করেন, তবে শাসক ও শাসিত সকলেরই উপকার হয়। মিঃ হিউম লর্ড ডাফরিণের কথানুসারে এই সভা সম্বন্ধে

মিঃ হিউম ও কংগ্রেস-কল্পনা

বিভিন্ন প্রদেশের রাজনীতিকদের নিকট তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সকল প্রদেশের রাজনীতিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মিলিত হইলে, তাহাদের শক্তি ও মনোভাব কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা প্রথমে কেহই অনুমান করিতে পারেন নাই। প্রথম তিন বৎসরের কংগ্রেস সরকার ও লর্ড ডাফরিণের সুদৃষ্টিতে ছিল; তারপর ১৮৮৮ সালে চতুর্থ বৎসরে যেবার এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, সেইবার অকস্মাৎ বড়লাট বাহাদুরের মত ও ব্যবহারের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল।

১৮৮৫ সালের বড়দিনের ছুটির সময়ে পুণা নগরীতে ভারতের জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশনের কথা হয়; সেখানকার 'সার্বজনিক সভা' ইহার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু উক্ত সময়ে পুণাতে কলেরা মহামারী দেখা দেয় বলিয়া সভার অধিবেশন বোম্বাই সহরে স্থানান্তরিত করা হইল। বোম্বাই 'প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েশন' অল্প সময়ের মধ্যে সম্বর্দ্ধনার যথোপযুক্ত আয়োজন করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। বোম্বাইএর নেতাদের মধ্যে তেলাঙ্গ ও ওয়াচার নাম এই প্রথম অধিবেশনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। এই সভার নাম হইল 'ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্রেস'। এই অধিবেশনের প্রথম সভাপতি বাঙালী—শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee)। প্রথম অধিবেশনের সভ্যগণ নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না; তাহার পর হইতে কংগ্রেসে নির্বাচন পদ্ধতিই চলিয়া আসিতেছে। এই সময় হইতে ভারতের রাজনীতিক মতামত কংগ্রেসই প্রকাশ করিতেছে। প্রারম্ভে কংগ্রেসের যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা আজ বিশেষ করিয়া জানা প্রয়োজন, কেন না মূল হইতে বর্ত্তমানের creed এর অনেক পার্থক্য হইয়া পড়িয়াছে।

১৮৮৫ কংগ্রেস স্থাপন

কংগ্রেসের মত-বিশ্বাস

ইহার উদ্দেশ্য ছিল (১) ভারত সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যাঁহারা দেশের কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন। (২) পরিচয়ে

ফলে জাতিগত, ধর্মগত ও প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার যথাসম্ভব দূরীকরণ ও লর্ড রীপনের শাসনকালে যে জাতীয় একতার সূত্রপাত হইয়াছে তাহার পুষ্টি-সাধন। (৩) ভারতের উন্নতির পথের বাধাগুলিকে ন্যায্য ও বিধিসঙ্গত আন্দোলনের দ্বারা দূর করিয়া ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে সখ্যতা স্থাপন।

১৮৮৪ হইতে ১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের এগারটি অধিবেশনের পর নেতৃগণ বুঝিতে পারিলেন যে জাতীয় মহাসভার উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে তাহার একটা নিশ্চিত লক্ষ্য ও নির্দিষ্ট কার্য্য-প্রণালী স্থির থাকা চাই। যদিও এই রাজনৈতিক সভা ভারতের কল্যাণ কামনায় স্থাপিত হইয়াছিল; তথাপি নেতারা এমনি পাশ্চাত্য সভ্যতা, পদ্ধতি ও ভাষার মোহে আবিষ্ট ছিলেন যে তাঁহারা সাধারণ লোকের সহানুভূতি বা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই; অপরদিকে রাজকর্মচারী ও ইংরাজ সংবাদপত্র সমূহের বিষ নজরে তাঁহারা বরাবরই ছিলেন। তাঁহারা সর্বদাই কংগ্রেসের নিন্দা করিতেন।

১৮৮৪—১৮৯৫ কংগ্রেস

১৮৯৫।৯৬ সাল হইতে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে নূতন শক্তি ও নূতন চেষ্টা পরিলক্ষিত হইল। দেশের মধ্যে মফঃস্বলেও রাজ-নৈতিক আন্দোলন এই সময় হইতে সুরু হয়। জাতীয় মহাসমিতি সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসীর স্বার্থ আলোচনা হয়, সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশের স্থানীয় স্বার্থ সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্ন অনালোচিত থাকিয়া যাইত। ইহা লক্ষ্য করিয়া বঙ্গদেশের অগ্রণীগণ কেবল বাঙালীদের জন্য একটি রাজনৈতিক সম্মিলন করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। এই সম্মিলনই "বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি" নামে অভিহিত হয়। ১৮৮৮ সালে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। ১৮৯২ সাল ব্যতীত বরাবরই কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র বাড়ীতে ইহার অধিবেশন হইয়াছিল। ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত রাজধানীতে

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি-স্থাপক

বৎসরে একবার করিয়া সকলে মিলিত হই মাত্র, দেশমধ্যে রাজনীতিক শিক্ষা ও আন্দোলন প্রচার করিবার কেহ ভাবেন নাই। ১৮৯৪ সালে কংগ্রেস অধিবেশনের পর যখ ঙ্গদেশের প্রতিনিধিগণ মাদ্রাস হইতে জলপথে কলিকাতায় ফিরিতেছিতে তখন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি'র অধিবেশন পর্য্যায়ক্রমে বাংলাদেশের ভিন্ন জেলায় করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হয়। প্র অধিবেশন বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের উদ্যোগে ১৮ সালে বহরমপুরে হয়। তদবধি একাল পর্য্যন্ত এর ভিন্ন (১৯০২ সাল) প্রাদেশিক সভার অধিবেশন বঙ্গের বিভিন্ন স্থে পর্য্যায় ক্রমে হইয়া আসিতেছে। এইরূপ একটি প্রাদেশিক সভার না আমরা পরে দিব।

মফঃস্বলের রাজনীতি আন্দোলন

বাংলাদেশের অগ্রণীরা যেমন রাজনীতিকে শব্যাপী করিবার জন্য জেলায় জেলায় উহার অধিবেশনের চেষ্টা বতেছিলেন, ভারতবর্ষের পশ্চিমে মহারাষ্ট্রদেশেও রাজনীতিকে জাতীয় জীনের অঙ্গীভূত করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। এই নূতন আন্দোলনের নেতা ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। তিলক মারাঠা জাতির মধ্যে 'সার্বজনি গণপতি' পূজার প্রবর্ত্তন করেন। দশ দিন ধরিয়াই উৎসব চলিত ও ঐ দিনে মহারাষ্ট্র জাতির তীত গৌরব, শিবাজীর অক্ষয় কীর্ত্তি কলাপ তাহা ধর্মপ্রীতি প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা হইত। ইহার কিছুকাল পূর্বে (১৮৯৩) পুণা নগরীতে গো-বধ-নিবারণী সভা স্থাপিত হইয়াছিল। এই ব্যাপার বোম্বাইতে হিন্দু ও অ-হিন্দুর মধ্যে বিরোধ সঞ্চারিত হয়। হিন্দুজাতীয়তার উহাই প্রথম আত্মবোধের বিকৃতরূপ। 'সার্বজনিক গণপতি-পূজা' প্রবর্ত্তিত হওয়ায় হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়তার নূতন রূপ দেখা দিল। ১৮৯৫ সালে মারাঠাদের ধর্মবোধের সহিত রাজনৈতিক বোধ ও অতীত গৌরবের যোগ সাধন করিবার জন্য তিলক "শিবাজী উৎসব" প্রবর্ত্তন করিলেন। এই

তিলক ও মহারাষ্ট্র জাতি

দুই অনুষ্ঠানের জোরোরাষ্ট্রদের মধ্যে নূতন জাতীয়তার ভাব দেখা দিল।

শিবাজী উৎসব

লক রায়গড়ে শিবাজীর ভগ্ন সমাধি-মন্দির সংস্কৃত ান। তদবধি মহারাষ্ট্রদের মধ্যে প্রতি বৎসর শিবাজী-উৎসব অা হইয়া আসিতেছে। শিবাজী যে ধর্মরাজ্য স্থাপন করিবার জন্যাত্রবলের সহায় লইয়াছিলেন, একথা মহারাষ্ট্র জাতির মনের মধ্যেঙ্কিত করিবার জন্যই এই নব উৎসবের স্থাপনা। দামোদর ও বালকৃষ্ণাপেকর নামক দুইজন যুবক মহারাষ্ট্র বালক ও যুবাদের শারীরিকয়াম চর্চার জন্য এক সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির প্রধান উদ্দেহন্দুধর্ম্মের কণ্টক দূরীকরণ।'

এই সময় ভারতবদের মনকে বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল করিবার আরও একটি কারণ আসিয়া জুটিল।১৮৯৬ সালে বোম্বাই প্রদেশে প্লেগ দেখা দিল। প্লেগ নূতন ব্যাধি। কার ব্যাধি দমন করিবার জন্য রোগীদিগকে বাড়ী হইতে লইয়া পৃথক্স্থাপ্লেগ-হাসপাতালে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহিন্দুর মনে খুবই পীড়াদায়ক; তার উপর প্লেগ হাসপাতালগুলির অব ও ব্যবস্থা অত্যন্ত বীভৎস রকমের শোচনীয়।

১৮৯৭ বোম্বাইএর প্লেগ র‍্যাণ্ড-হত্যা

েকের পীড়ার চেয়ে পীড়ার চিকিৎসা ও প্রতিষেধের উর ভয় ও ঘৃণা অধিক হইল। দেশময় সরকারের উর লোকের একটা বিরাগ ভাব হইল; ব্যাধি, অন্নাভাব সবেরই জন্য যন সরকার পরোক্ষভাবে দায়ী। ১৮৯৭ সালে প্লেগের জন্য শিবাজীউৎসব শিবাজীর জন্মদিনে না হইয়া তাঁহার অভিষেকের দিন ১৩ই জুন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। ১৮ই জুন তিলক তাঁহার পত্রিকা "কেশরী"তে উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ, উৎসবে পঠিত একটি কবিতা প্রকাশিত হইল। এই ঘটনার চারিদিন পরে ২২শে জুন মিঃ র‍্যাণ্ড ও লেফ্‌নেন্ট আয়ার্ষ্ট গুপ্তঘাতকের হাতে পথিমধ্যে নিহত হইলেন। মিঃ র‍্যাণ্ড পুণার প্লেগ-অফিসার ছিলেন।

শিবাজী উৎসবের কয়েকদিন পরে, ও 'কেশরী'তে পূর্বোক্ত প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইবার পরে, এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া সরকার তিলককেই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী করিলেন। বিচারালয়ে তিলক দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন ও তাঁহার প্রতি ১৮ মাস কারাবাসের আদেশ হইল। প্রিভিকৌন্সিল পর্য্যন্ত মোকর্দমা চালাইয়াও কোনো ফল হইল না। এই ঘটনায় ভারতবর্ষ ও বিশেষভাবে বোম্বাই প্রদেশ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সরকার যে উদ্দেশ্যে শাস্তি দিলেন, ফল ঠিক তার বিপরীত হইল; লোকের মনের মধ্যে শাস্তির ভয় দূর হইল, বিচারের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিল। তিলকের বিচারের সময় নয়জন জুরীর মধ্যে ছয়জন সাহেব-জুরী তাঁহাকে দোষী ও তিনজন দেশী-জুরী নির্দোষ বলায়, সাহেবদের প্রতি সাধারণভাবে অবজ্ঞা দেশমধ্যে প্রচারিত হইল। নূতন জাতীয়তাবোধের ইহাই প্রথম স্পন্দন।

তিলকের কারাগার

১৮৯৮ সালে লর্ড কর্জন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলেন। তাঁহার মত সুপণ্ডিত, কর্মী, জবরদস্ত লাট ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে কখনো আসেন নাই। কিন্তু কর্জন রক্ষণশীল ছিলেন; ভারতবাসীদের ন্যায্য দাবী ও অধিকারের উপর তাঁহার না ছিল সহানুভূতি, না ছিল শ্রদ্ধা। এদিকে রাজনৈতিক আন্দোলন ও আলোচনার ফলে, সংবাদ-পত্রাদির সমালোচনার জন্য, দেশের শিক্ষিত লোক সরকারের সকল কর্মকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের কোনো কাজ বা কথার মধ্যে ঘুণাক্ষরে কোনো অভিপ্রায় চাপা থাকিলে, তাহা দেশের শিক্ষিত সমাজের কাছে ধরা পড়িত এবং সরকারকে তাহার জন্য জবাবদিহি করিয়া ছাড়িত। এই রকম সময়ে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কার করিবার জন্য কর্জন

লর্ড কর্জন ও দেশের মনোভাব

যখন নূতন বিধি প্রণয়ন করিতে মনস্থ করিলেন, তখন ভারতবাসীরা তাঁহার এই কার্য্যের মধ্যে কোনো নিগূঢ় অভিপ্রায় আছে বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিল। একদল লোক বলিলেন, ভারতের উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিবার জন্য এই নূতন ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা না হইয়া শিক্ষা পূর্বাপেক্ষা বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং শিক্ষার Quality উচ্চদরের হইয়াছে। এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বার্ষিক উপাধি-বিতরণ সভায় লর্ড কর্জন Convocation Speechএ প্রসঙ্গচ্ছলে পূর্বদেশীয়দের স্বভাব সম্বন্ধে কয়েকটি অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহাতে শিক্ষিত ভারতবাসী আপনাদিগকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করেন। বড়লাটের এই উক্তির প্রতিবাদ করিবার জন্য টাউন-হলে বিরাট সভা আহুত হইল; ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ এই সভার সভাপতি হন। ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকের মন ক্রমে এমনি হইয়াছিল যে লাট বড়লাটের কোনো সামান্য অসঙ্গত কথা তাহারা নীরবে সহ্য করিত না।*

কিন্তু লর্ড কর্জন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে চির-অমর হইয়াছেন তাঁহার অপর কীর্তির জন্য; সেটি হইতেছে বঙ্গচ্ছেদ বা Partition of Bengal। পূর্বে বঙ্গদেশ বলিতে আজকালকার বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বুঝাইত। একজন ছোটলাটের পক্ষে এত বড় প্রদেশের কাজ অত্যন্ত বেশী হইয়া উঠিয়াছিল। ভারত সরকার ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে ঘোষণা করিলেন যে বাংলাদেশ বিভক্ত করা হইবে। বাঙালীর এ ব্যবস্থা পছন্দ হয় নাই। লর্ড কর্জন বাঙালীর মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের চেষ্টাকে সুনয়নে দেখিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি বাঙালী জাতির মধ্যে ভেদনীতির অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। পূর্ববঙ্গ মুসলমান-প্রধান। তিনি স্বয়ং তথায় গমন করিয়া মুসলমানদিগকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য বলিলেন যে, পূর্ববঙ্গ নূতন প্রদেশে পরিণত হইলে তথায়

১৯০৩ বঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব

মুসলমানের প্রাধান্য হইবে। ঢাকার নবাব প্রভৃতি অনেকে সেই কথায় ভুলিলেন এবং স্বদেশী-আন্দোলন আরম্ভ হইলে এই ভেদনীতির ফল যে সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছিল তাহা প্রমাণিত হইল।

বাংলার চারিদিকে বঙ্গচ্ছেদ রদ করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়া সভা হইল; আবেদন নিবেদনের অন্ত থাকিল না। ১৯০৩ সালে মাদ্রাসে যে কংগ্রেস হয় তাহাতে লালমোহন ঘোষ মহাশয় সভাপতি হন। এই সভাতে বঙ্গভঙ্গ-প্রস্তাবের প্রতিবাদ হয়। ১৯০৩ সালের শেষ হইতে ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত বাংলাদেশে খুব কম ২০০০ সভায় সরকার বাহাদুরের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট মনে করিলেন শাসনকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে বঙ্গচ্ছেদ করাই কর্ত্তব্য; প্রজাদের অযথা ভাবোচ্ছ্বাসে কর্ণপাত করিতে গেলে রাজকার্য্যেরই হানি হইবে। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বা ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন ভারত-গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে ঢাকা চট্টগ্রাম ও রাজসাহী-বিভাগ আসামের সহিত মিলিত হইয়া "পূর্ববঙ্গ-আসাম" নামে পৃথক একটি প্রদেশ হইল; ঢাকা হইল ইহার রাজধানী, শিলং হইল গ্রীষ্মাবাস। প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান-বিভাগ পূর্বের ন্যায় বিহার উড়িষ্যার সহিত যুক্ত থাকিয়া বঙ্গদেশ বলিয়া পরিচিত থাকিল। দুই বৎসরের সানুনয় অনুরোধ, সুযুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া দেশের জনমতকে অগ্রাহ্য ও অপমান করিয়া সরকার যখন বাঙালীজাতিকে বিভক্ত করিলেন, তখন শান্ত 'ভীরু' বাঙালীর প্রাণেও সরকারকে জব্দ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। ইহাই "স্বদেশী আন্দোলন।" বঙ্গচ্ছেদ বাংলার বা ভারতের নূতন জাগরণের কারণ নহে, ইহা স্বদেশী আন্দোলনের উপলক্ষ মাত্র।

প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ

স্বদেশী-আন্দোলনের সময় হইতে দেশময় যে স্বাদেশিকতা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইল, তাহা বঙ্গভঙ্গের আকস্মিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রসূত নহে। বঙ্গচ্ছেদ-আন্দোলন তাহার উপলক্ষ মাত্র, জাতীয় জাগরণের কারণ নহে। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি কেমন করিয়া সাহিত্যের মধ্য দিয়া, সঙ্গীতের ভিতর দিয়া, সাময়িক-পত্রিকা প্রচারের দ্বারা ও ইংরাজী-শিক্ষা বিস্তারের ফলে ভারতবাসীদের মনে দেশাত্মবোধ জাগিতেছিল।

বঙ্গভঙ্গ জাতীয় জাগরণের উপলক্ষ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও খৃষ্টান ধর্ম বিস্তারের ফলে দেশের ধর্ম, আচার, সংস্কার, ইতিহাস প্রভৃতি ভারতীয় Culture এর সমস্ত অঙ্গই অতিরিক্ত পরিমাণে ও অযথাভাবে নিন্দিত হইয়া আসিতেছিল। ইহার জন্য প্রধানত খৃষ্টান পাদরীগণ ও পাদরীদের স্কুল-কলেজে-পড়া ইংরাজী-শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য সভ্যতামুগ্ধ দেশীয়েরা দায়ী। ইহার বিরুদ্ধে দেশ মধ্যে রক্ষণশীল গোঁড়াদল ছিল; কিন্তু তাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া তাঁহাদের মতকে তথা-কথিত শিক্ষিত সমাজ সহজে গ্রহণ করিত না। সাধারণ ইংরাজী-শিক্ষিত লোক প্রাচীন Culture এর উপর সাহস করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিত না এবং জোর করিয়া অবিশ্বাস করিবার মত সাহস তাহাদের ছিল না। ইহারা আত্মবিস্মৃত জাতি বলিয়া নিজের শক্তির উপর শ্রদ্ধা হারাইয়াছিল। অতিরিক্ত শ্রদ্ধা ও অতিরিক্ত নিন্দার ফলে যথার্থ দৃষ্টি কাহারও হইতে পারে নাই।

প্রাচীন সভ্যতার স্তুতি-নিন্দা

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে একদল ইংরাজ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি আঁলোচনা আরম্ভ করেন। য়ুরোপে জার্মেনী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের অনেকে প্রাচ্য সভ্যতার মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এদেশে ইংরাজী-শিক্ষা বিস্তারের ফলে ভারত-মুগ্ধ

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের গবেষণা পাঠে দেশীয়দের মনেও গর্ব জাগিতে লাগিল।

য়ুরোপে ভারতীয় শাস্ত্রাদির আলোচনা

যখন লোকে দেখিল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র বেদ, পুরাণ, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ গ্রন্থাদি লণ্ডন, প্যারীস, বার্লিন, সেণ্টপিটার্সবার্গ, রোম প্রভৃতি মহানগরীতে মুদ্রিত হইতেছে, সেদেশের লোকেও উহা পাঠ, তর্জমা, এমন কি প্রশংসাও করিতেছে,—তখন এই আত্মবিস্মৃত জাতির মধ্যে প্রাচীন ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা নূতনভাবে জাগ্রত হইল।

ভারতের জাতীয় বা দেশাত্মবোধ স্পষ্টভাবে জাগ্রত হইবার পূর্বে ধর্ম সম্বন্ধে আত্মবোধ দুই কারণে জাগ্রত হইল। প্রথমতঃ খৃষ্টান ও অন্যান্য সংস্কারকদের নিকট হইতে হিন্দুধর্ম ও সমাজের গালি ও নিন্দা শুনিতে শুনিতে, মানুষের মনে নিজের ভাল মন্দ সমস্তটাকে সাফাই করিয়া তাহাকে সমর্থন করিবার যে জিদ্ চাপে, তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুসমাজ নিজের সমস্তটাকে সমর্থন করিতে ও বজায় রাখিতে প্রয়াসী হইল। দ্বিতীয়তঃ অপর একশ্রেণীর য়ুরোপীয় পণ্ডিত ভারত-ইতিহাসের অতিরঞ্জিত প্রাচীনত্ব, পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি আলোচনা করিয়া এতদ্দেশীয় সহজ-বিশ্বাসী, শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত লোকেদের মনে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মূঢ় আভিজাত্যাভিমান সৃষ্টি করিল। এ সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। মোটকথা বাহির হইতে নিন্দা ও প্রশংসা আমাদিগকে জড়তা হইতে জাগ্রত করিবার পথে সমভাবে সহায়তা করিয়াছে।

বাংলা-সাহিত্য বাংলাদেশে এই নূতন আন্দোলনের বিস্তারকল্পে অনেকখানি দায়ী। বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা এই নব-হিন্দু-জাতীয়তার গুরু বলিতে পারি। তাঁহার উপন্যাসগুলির ভিতর ও বিশেষভাবে "আনন্দমঠে"র মধ্যে তিনি এই ভাবকে পরিস্ফুট করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র ও সঙ্গীত ভারতের জাতীয় মন্ত্র ও জাতীয় সঙ্গীত

হইয়াছে। হিন্দু দেবী দুর্গা ও দেশমাতৃকে তিনি এক করিয়া নূতন ভাবে সৃষ্টি করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হিন্দু জাতীয়তার কথা জাগিতেছিল; সেইজন্য তিনি মুসলমানদের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। তাঁহার লেখার মধ্যে জাতীয় (National) ভাবের অপেক্ষা হিন্দু-জাতীয়তার ভাব বেশী ফুটিয়াছে। সেইজন্য তিনি হিন্দুদের নিকট অধিক প্রিয় হইয়াছেন এবং দেশে হিন্দু-জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত করিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য জাতীয়-জীবন গঠনে আংশিকভাবে সার্থক হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দু জাতীয়তা

এই সময়ে 'থিওজফিক্যাল সোসাইটি' স্থাপনের জন্য মাডাম্ ব্লাভাস্কি ও মিসেস্ অ্যানি বেসান্ত ভারতবর্ষে আসিলেন। তাঁহারা প্রাচ্যের ধর্ম, আচার, নীতি সম্বন্ধে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত ও মুগ্ধ মত ও বিশ্বাস লইয়া আসিয়াছিলেন। থিওজফিষ্টগণ বলিতে লাগিলেন যে, ভারতের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবনের তুলনা হয় না, এখানকার জাতিভেদ সমাজ-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, এখানকার আচার-ব্যবহারের ভিত্তিও বিজ্ঞানের উপর। এদেশের লোক বিদেশীর নিকট হইতে নিজ ধর্ম সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র পাইয়া অত্যন্ত আশ্বস্ত হইল—ধর্ম বিষয়ে সে যে হীন নহে তাহা তাহাদের কাছে প্রমাণিত হইয়া গেল। ইহারই কিছুকাল পরে শশধর তর্কচূড়ামণি 'হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা' প্রকাশিত করিতে থাকেন; তাহাতেও অর্দ্ধশিক্ষিত ও তথা-কথিত শিক্ষিত-শ্রেণী আত্মপ্রসাদ লাভ করিল ও নিজ ধর্ম ও জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে উগ্রভাবে সচেতন হইয়া উঠিল।

হিন্দুস্থান ও মাদ্রাসে থিওজফি ও হিন্দুজাতীয়তা

থিওজফি আন্দোলনের সমসাময়িককালে 'আর্য্য-সমাজে'র আন্দোলন সুরু হয়। আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী বুঝিয়াছিলেন যে ভারতের অসাড় মনকে জাগ্রত করিতে হইলে, তাহার সম্মুখে বিশেষ

একটা কোনো বস্তু বা 'Ideaকে খাড়া করিয়া সেইটাকে Idealize করিয়া ভারতের মনকে মুগ্ধ করিতে হইবে। সেইজন্য তিনি বেদকেই আর্য্যদের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর বলিয়া প্রচার করিলেন। লোকের মন কল্পনাবলে অতীতের মধ্যে স্বর্ণময় যুগের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যাহাদের বর্তমান দুঃখময়, ভবিষ্যত অজ্ঞাত, তাহাদের পক্ষে অতীতের সুখস্বপ্ন দেখিয়া আত্মতৃপ্তি সম্ভোগ ব্যতীত আর কি আনন্দ আছে? সেই অতীত গৌরবের সহিত বর্তমান দুর্গতির তুলনায় মানুষের মন অশান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। পঞ্জাবের শিক্ষিত অধিকাংশ লোকই 'আর্য্য-সমাজী।' জাতীয় আন্দোলনে ইহাদের সহায়তা সর্বাপেক্ষা অধিক পাওয়া গিয়াছে।

পঞ্জাবে আর্য্য-সমাজ ও হিন্দুজাতীয়তা

বাংলাদেশে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব বিশেষভাবে জাতীয় জীবন-গঠনে সহায়তা করিয়াছে। তাঁহার প্রাণের সর্বাপেক্ষা মহৎ আকাঙ্ক্ষা ছিল ভারতবর্ষকে বড় করা। যখন তিনি শিকাগোর বিখ্যাত নিখিল-ধর্ম্ম সভাতে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়া দেশে ফিরিলেন, তখন লোকে তাঁহাকে যে অভ্যর্থনা দিল তাহা অতুলনীয়। ইহা যেন একটা ভারতের আধ্যাত্মিক জয়। অধীন জাতির আত্মপ্রসাদ লাভের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইল। ইহার উপর যখন মিস্ নোবল্ খৃষ্টধর্ম ও সমাজ ত্যাগ করিয়া আসিয়া "ভগিনী নিবেদিতা" নাম গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন হিন্দুধর্মের ও হিন্দু-জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে লোকের আর কোন সন্দেহ থাকিল না। বিবেকানন্দ দেশের কিশোর মনের মধ্যে দেশভক্তি ও ধর্মে মতি আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম ও দেশভক্তি প্রতিশব্দের ন্যায় হইয়া গেল। ভারতের হিন্দু 'জাতীয়তা' হিন্দুধর্মে নিষ্ঠার উপর, দেশসেবার উপর, কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। বিবেকানন্দের সন্ন্যাসীর দল

বঙ্গদেশে স্বামী বিবেকানন্দ ও জাতীয়ভাব

উদাসীন নহে ; তাঁহারা অক্লান্ত কর্মী ও দেশসেবক। নব্য-ভারতে হিন্দু জাতীয়-জীবন গঠনে বিবেকানন্দের স্থান সর্বোচ্চে। স্বামীজি প্রবর্তিত নর-নারায়ণের সেবা, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, জাতীয় জীবনে নূতন শক্তি আনয়ন করিল,—যুবকদের কর্মপন্থা বিস্তারিত হইল।

মহারাষ্ট্রে তিলকের জাতীয় ভাব

বোম্বাই প্রদেশে মারাঠা জাতির মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত এই নব হিন্দুজাগরণকে আশ্রয় করিয়া হয়। সেখানকার 'গোবধ-নিবারণ সভা', 'সার্বজনিক গণপতি-পূজা', 'হিন্দুধর্মের কণ্টক-শোধন' প্রভৃতি অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মূলে ছিল হিন্দু-জাতীয়তা বোধকে জাগ্রত করিবার আকাঙ্ক্ষা। 'শিবাজী-উৎসব' প্রবর্তিত হইলে দেশমধ্যে স্বদেশপ্রীতি ও স্বধর্মে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইল। মহারাষ্ট্রদেশে 'শিবাজী-উৎসবে'র বার্ষিক মেলা মারাঠা জাতির মধ্যে বিশেষভাবে নব-জাতীয়তা বোধ সঞ্চারিত করিতে সহায়তা করিয়াছে। পুণার প্লেগ-অফিসার মিঃ র‍্যাণ্ডের হত্যার পর হত্যাকারী চাপেকর বৃটীশ বিচারালয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া দেশের পূজ্য হইল! এই হত্যা-সংক্রান্ত অপরাধে লিপ্ত করিয়া সরকার বাহাদুর তিলককে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন ; ইহার ফলে, দেশমধ্যে যে আন্দোলন উত্থাপিত হয় তাহাও জাতীয়তা গঠনে বিশেষভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধেও এই সময়ে দেশের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। প্রাচীন হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে ভারতের তরুণ মনকে গঠিত করিবার জন্য দুইটি প্রতিষ্ঠান বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঘটনা দুটি সমসাময়িককালে বহির্জগতের নিকট অজ্ঞাত থাকিলেও, ইহা সেই যুগের চিন্তাশীল লোকের মনোভাব প্রকাশ করিতেছে।

হিন্দুজাতীয় শিক্ষা 'শান্তিনিকেতন' ও 'গুরুকুল'

আর্য্য-সমাজের নেতা পণ্ডিত মুন্সীরাম (পরে শ্রদ্ধানন্দ স্বামী) কয়েক জন পণ্ডিতকে লইয়া বৈদিক আর্য্য-ধর্মানুযায়ী 'গুরুকুল' নামক বিদ্যায়তন (হরিদ্বারের

নিকট কাঙ্গরী নামে একটি স্থানে) স্থাপন করিলেন। বাংলাদেশেও ঐ একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" স্থাপন করিয়াছিলেন ; এই বিদ্যালয়টি উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহে বাসের আদর্শে স্থাপিত হইল। দুইটি বিদ্যালয়ই সরকারী সাহায্য গ্রহণ করে নাই। বিদ্যালয় দুইটিই প্রাচীন ভারতের গৌরব রক্ষার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ইহারাই যথার্থ জাতীয় বিদ্যালয়। তবে এগুলি গোঁড়া-হিন্দুসমাজের দ্বারা স্থাপিত হয় নাই। বোলপুর-ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও প্রধান সহায় ছিলেন ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায়। ব্রহ্মবান্ধব খৃষ্টান সন্ন্যাসী ছিলেন ; কিন্তু তিনি খৃষ্টকে গ্রহণ করিয়াছিলেন—'খৃষ্টানী'কে নহে ; তাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে হিন্দু ও ভারতীয় ছিল। জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠায় তাঁহার নাম রবীন্দ্রনাথের সহিত অক্ষয়ভাবে যুক্ত থাকিবে। প্রাচীন 'হিন্দু' শিক্ষা প্রবর্তনের এই চেষ্টা, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্ণিত বিচিত্র Hindu Revivalismএর অন্যতম ফল।

ভারতবাসীর অন্তরের মধ্যে নানাদিকের চিন্তাস্রোত ও ঘাতপ্রতিঘাত আসিয়া তাহাকে যেমন স্বদেশ ও প্রাচীনমুখী করিতেছিল, তাহার জাতীয়তা-বোধকে জাগ্রত করিতেছিল, তেমনি বাহিরের কতকগুলি ঘটনাও তাহাকে স্বদেশ-প্রেমিক, দেশবৎসল, ও বলশালী করিতে সাহায্য করিয়াছিল। ভারতবাসী দুর্বল ; সুতরাং পথেঘাটে, আপিসে, ষ্টীমারে, রেলে, জুটমিলে, চা-বাগিচায় অনেক সময়ে সবলকায় শ্বেতাঙ্গদের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। সুযোগ এবং সামর্থের অভাববশতঃ লোকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া থাকিত ; এবং যখন শ্যামাকান্ত প্রভৃতি বলিষ্ঠ বাঙালীর হাতে সাহেব-নিপীড়নের কাহিনী অতিরঞ্জিত-আকারে লোকেদের মধ্যে প্রচারিত হইত, তখন সকলেই মনে মনে খুসী হইত। যেবার প্রিন্স রণজিৎ সিংহ তাঁহার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের লইয়া দিগ্বিজয় করিয়া ফিরিলেন, তখন

ভারতবাসীর মনে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ হইল। বুয়র যুদ্ধে' ক্ষুদ্র বুয়রজাতিকে বশ মানাইতে ইংরাজদের দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল; ইহাতে লোকে যে কেবল ইংরাজের দুর্বলতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিল তাহা নহে, পরাজয়ের সময় মনে মনে খুসীই হইত। আবার যে বুয়রজাতির সহিত যুদ্ধে বৃটীশ রাজকোষের বহু কোটি টাকা ব্যয়িত হইল, এবং বহু অমূল্য প্রাণ নষ্ট হইল, সেই বুয়রগণ পরাজিত হইয়াও কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্বায়ত্ব-শাসন পাইল,—তখন ভারতবাসীদের মনে একাধারে ক্ষোভ ও বিদ্বেষে পূর্ণ হইল। ইহার পর রুশজাপানের যুদ্ধের সময় ভারতবাসীদের সহানুভূতি ছিল জাপানের সহিত। রুশের পরাজয় যেন পশ্চিমের পরাজয়, জাপানের জয় যেন পূর্বের জয়। অন্নভোজী, হেমচন্দ্রের 'অসভ্য-জাপান' প্রবল প্রতাপান্বিত রুশকে পরাভূত করিয়াছে, এ গৌরবের অংশ ভারতবাসীও কিছু গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক।

আত্মপ্রতিষ্ঠার বিচিত্র কারণ

এই সময়ে ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থার ইতিহাসবিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য কিরূপভাবে বাড়িতেছে, ইংরাজ কোম্পানী ও সরকার কিরূপে বৃটীশ শিল্পী-কারিকরগণের স্বার্থের নিকট ভারতীয় শিল্পী-দের ন্যায্য দাবীদাওয়া নষ্ট করিয়াছেন, কিরূপে ভারতের অধিবাসীগণ ক্রমশই কৃষিজীবি হইতেছে ইত্যাদি বিষয় গ্রন্থসমূহে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে দাদাভাই নৌরজীর "ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও বৃটীশ-ভারতে বৃটীশ-অনুচিত শাসন" (The Poverty and Un-british Rule in British India) নামক গ্রন্থ সর্বপ্রথম। শ্রীযুক্ত মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে লিখিত ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে গবেষণার কয়েকটি প্রবন্ধ পথ খুলিয়া দিল। বলিতে গেলে তাঁহারই প্রদর্শিত পথে পরবর্ত্তী যুগে জোশি,

নৌরজী, ডিগ্‌বী, রমেশ দত্ত প্রভৃতির কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ

গোখ্‌লে, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ চলিয়াছিলেন। কিন্তু যে গ্রন্থখানি সর্বাপেক্ষা অধিক আন্দোলন ও আলোচনা উত্থাপিত করিয়াছিল সেটি একজন ইংরাজের লিখিত। মিঃ উইলিয়াম ডিগ্‌বী লিখিত Prosperous British India বা "সমৃদ্ধ ভারত অথবা ১৮৫০ সালে ২ পেনি, ১৮৮০তে ১½ পেনি, ১৯০০তে ¾ পেনি" নামক গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গ করিয়া গ্রন্থখানির নাম 'সমৃদ্ধ-ভারত' রাখা হইয়াছিল। তিনি বহুশত পুঁথি ও সরকারী নথি ঘাঁটিয়া যে-সকল তথ্য প্রকাশ করেন, তাহা পাঠ করিয়া য়ুরোপের উপর মন বিরূপ না হইয়া থাকিতে পারে না। ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে আরও দুইখানি বই এই সময়ে রচিত হয়। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিতে করিতে ভারতীয় কৃষকদের বিশেষভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি ভারতবাসীদের দারিদ্র্যের ইতিহাস অনুসন্ধানে মন দেন। তাঁহার গবেষণার ফল Economic History নামে দুই খণ্ড গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। সিবিল সার্বিস হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাতে অবস্থান কালে কোম্পানীর যুগের অনেক পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া, পার্লামেণ্টের পুরাতন নথি খুঁজিয়া তিনি তথ্যসমূহ আবিষ্কার করেন। লর্ড কর্জনকে তিনি প্রকাশ্যভাবে কয়েকখানি পত্র লিখিয়া কৃষকদের দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করেন। সরকার বাহাদুর দত্তমহাশয়ের যুক্তিগুলি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু সরকারের জবাবে কেহই সন্তুষ্ট হয় নাই, কারণ দেশের দারিদ্র্য কাহাকেও পুঁথি পড়িয়া অনুভব করিতে হয় না। স্যর হেনরী কটন আসামের চীফ-কমিশনর ছিলেন; তাঁহার শাসনকালে তিনি জনপ্রিয় হইয়াছিলেন; ভারতবাসীর ন্যায্য দাবীর প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল। তিনি 'New India' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থখানি বিখ্যাত ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত বঙ্গানুবাদ

করিয়া দেশমধ্যে কটন সাহেবের অভিমত প্রচার করিতে বিশেষ সহায়তা করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে সখারাম গণেশ দেউস্কর নামক জনৈক বঙ্গপ্রবাসী মারাঠা ব্রাহ্মণ 'দেশের কথা' নামক একখানি গ্রন্থরচনা করেন। 'দেশের কথা' প্রধানতঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করিয়াই রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে রাজদ্রোহাত্মক কিছুই ছিল না। তবে এই গ্রন্থখানিতে কেবল ইংরাজ-শাসনের অভাবাত্মক দিকটাই দেখানো হইয়াছিল; সরকারী বা সাধারণ ইংরাজ-লিখিত গ্রন্থ যেমন ভারত-বর্ণনকালে তাহার দুঃখদারিদ্র্য প্রভৃতির কথা উল্লেখ না করিয়া, কেবল তাহার বাহ্যিক আড়ম্বর ও উপকরণের তালিকাদানে বৃটীশ-শাসনের অসাধারণ শ্রীসম্পদ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন; তেমনি 'দেশের কথা,' ভারতের দারিদ্র্য ও দুঃখের জন্য কেবলমাত্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারী ও ইংরাজ সরকারকে দায়ী ও দোষী করিয়া লিখিত; এখনো ঐ শ্রেণীর গ্রন্থের অভাব নাই। সরকার 'দেশের কথা'র কয়েকটি সংস্করণের পর উহার ছাপা ও প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।

দেউস্কর ও 'দেশের কথা'

এই সব রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক গ্রন্থ প্রকাশের ফলে যেমন দেশের শিক্ষিত যুবকদের মনে বৃটীশ-শাসন ও বৃটীশ জাতির প্রতি ভিতরে ভিতরে একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিতেছিল, তেমনি কতকগুলি দেশীয় পত্রিকা সাধারণ শিক্ষিত লোকের মধ্যে অসন্তোষ প্রচারের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। রীপনের সময় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইলে লোকে নির্ভীকভাবে সরকারী ও সাহেবী অন্যায়ের প্রতিবাদ ও সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাঁহারা বৃটীশ ভারতের প্রজার অধিকারের দাবী করিয়া অনেক অপ্রিয় সত্য বলিতেন।

দেশীয় পত্রিকাদের স্বাধীন মত

এইরূপ যখন দেশের মনোভাব তখন বঙ্গচ্ছেদ ঘোষিত হইল। দেশের মন পূর্ব হইতে বিবিধ কারণে তিক্ত হইয়াছিল; সুতরাং এই "বঙ্গচ্ছেদ"কে আশ্রয় করিয়া দেশ হঠাৎ বারুদ-জলার মত জ্বলিয়া উঠিল। আন্দোলন আরম্ভ হইবামাত্র দেশমধ্যে 'নরম' ও 'চরম'পন্থী বলিয়া দুই দল হইয়া গেল। যাঁহারা কংগ্রেসে নিয়মিতভাবে মিলিত হইয়া দেশের অভাব অভিযোগ আবেদন নিবেদন করিতেন ও বিধি-ন্যায্য উপায়ে ইংরাজদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত ও সহানুভূতির উদ্রেক করিবার আশা রাখিতেন—তাঁহারা 'নরমপন্থী' বলিয়া অভিহিত হইলেন; এবং যাঁহারা নিজ আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া দেশকে জাগ্রত করিয়া স্বরাজলাভের উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন, তাঁহারা 'চরমপন্থী' বলিয়া বিদিত হইলেন। কিন্তু এই সব বাকবিতণ্ডার বাহিরে দেশের মধ্যে আরও একটি আন্দোলনের ক্ষীণস্রোত সকলের অন্তরালে প্রবাহিত হইতেছিল—তাহাই উত্তরকালে বৈপ্লবিক আন্দোলন রূপে প্রকাশিত হইল। সে সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

বঙ্গদেশে নরমপন্থী চরমপন্থী বিপ্লবপন্থী

——০——

তৃতীয় পর্ব

স্বদেশী-আন্দোলন যুগ

১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখ বাংলাদেশে 'বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের' জন্মদিন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় বিলাতী দ্রব্য 'বয়কট' বা বর্জন করিবার কথা প্রস্তাব করিলেন। প্রথম যে আন্দোলন সুরু হয়, তাহা ছিল কেবল রাজনৈতিক। ইংরাজ সরকারকে জব্দ করিবার জন্যই বয়কট অস্ত্র গৃহীত হইল। সেই সময় এক প্রকার 'প্রতিজ্ঞা-পত্র' প্রকাশিত হয়; তাহাতে লেখা ছিল যে 'যতদিন বঙ্গচ্ছেদ রদ না হয়, ততদিন বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিব।' অল্প কয়দিনের মধ্যে ইহাই স্বদেশী আন্দোলনের আকার ধারণ করিল। লোকে 'বঙ্গচ্ছেদ রদে'র সর্ত্ত কাটিয়া দিয়া সহি করিত। দেশমধ্যে শিল্পোন্নতির জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা দেখা দিল। লোকে মোটা 'বোম্বাই কাপড়' পরিতে সুরু করিল। সেসব কাপড়ের নমুনা পাওয়া আজকাল দুষ্কর।

বয়কট বা বর্জ্জননীতি

৩০শে আশ্বিন ১৩১২ বা ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ বঙ্গচ্ছেদ ঘোষিত হইল। সেই দিনকে বাঙালী একাধারে আনন্দ ও বিষাদের দিন করিয়া লইল। বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়াছে ইহাতে যেমন বাঙালী ব্যথিত, বাঙালী-জীবনে বঙ্গচ্ছেদ নূতন শক্তি আনিয়াছে তাহাতে সে তেমনি হর্ষিত হইল। বাংলাদেশ যে বিভক্ত হইয়াছে বাঙালী ইহা অস্বীকার করিল। রবীন্দ্রনাথ তখন পূর্ণোদ্যমে এই জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবানুসারে বাঙালী এই দিনটিকে পবিত্র 'রাখিবন্ধনে'র দ্বারা জাতীয়

বঙ্গচ্ছেদ ও রাখি-বন্ধন

বন্ধনকে দৃঢ় করিল; তিনি সেই সময়োপযোগী "বাংলার মাটি বাংলার জল" নামে অমর সঙ্গীতটি রচনা করিয়া দেশবাসীর কণ্ঠে উপহার দিলেন। ঐ দিনই কলিকাতায় পার্শীবাগানের মাঠে Federation Hall বা মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল—আনন্দমোহন বসু ইহার ভিত্তি স্থাপন করিলেন। বঙ্গচ্ছেদের পরই বাঙালী নেতাদের চেষ্টায় 'জাতীয় ধন ভাণ্ডার' বা National Fund প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে অনেক টাকা উঠিয়াছিল এবং এক সময়ে লোকে ভাবিয়াছিল যে উক্ত টাকা হইতে Federation Hall নির্মিত হইবে; কিন্তু সে প্রস্তাব কথনো কার্য্যকারী হয় নাই।

দেশমধ্যে 'স্বদেশী' আন্দোলন পূর্ণবেগে চলিতে লাগিল। প্রতি গ্রামে, প্রতি সহরে, প্রতি বাজারে বিরাট জনসভা আহুত হইতে লাগিল; স্থানীয় লোকেরা কলিকাতার বিখ্যাত বিখ্যাত বক্তাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিতেন। বিলাতী কাপড়, বিলাতী লবণ, চিনি, মনোহারী সামগ্রী বর্জন করিতে তাঁহারা সকলকে উপদেশ দিতেন। এই সকল বক্তৃতা সর্বদা ভাবোন্মত্ততা বিরহিত হইত না এবং নিছক বৈজ্ঞানিক যুক্তি ধরিয়াও চলিত না। সুতরাং দেশমধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হইল।

স্বদেশী আন্দোলন ও পিকেটিং

স্কুল কলেজের ছেলেরা বাজারে বাজারে পিকেটিং সুরু করিল; অর্থাৎ কাহাকেও বিলাতী সামগ্রী কিনিতে দেখিলে স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাকে অনুনয়, বিনয়, ভয়, পর্য্যন্ত দেখাইয়া দেশী দ্রব্য কিনিতে প্রবৃত্ত বা বাধ্য করিত। সহরে সহরে স্বদেশী গোলা প্রতিষ্ঠিত হইল। দেশী কাপড় চোপড় মাথায় করিয়া স্কুল কলেজের ছাত্রেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া স্বদেশী আন্দোলনের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। কোনো কোনো স্থলে 'স্বদেশী'র নামে নিরক্ষর লোকের উপর রীতিমত জুলুম হইত বলিয়া সরকারী কাগজে রিপোর্ট পাওয়া যায়। বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গে ও বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের চেষ্টায় বরিশাল জিলায় 'বয়কট' বিশেষভাবে সফলতা লাভ করিয়াছিল।

বরিশালের অনেক 'গঞ্জে' এক পয়সায় বিলাতী লবণ বা চিনি পাওয়া যাইত না। অশ্বিনীবাবুর অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও সাধারণের উপর তাঁহার প্রভূত প্রভাব দেখিয়া সরকার বাহাদুর খুবই বিরক্ত হইলেন এবং স্বদেশকে ভালবাসিবার সাহস ছিল বলিয়া সাহেব শাসনকর্তাদের নিকট যথেষ্ট অবমাননা ও উৎপীড়ন তিনি সহ্য করিয়াছিলেন। এই দেশব্যাপী 'বয়কট' আন্দোলনের ফল বৎসর দু'এর মধ্যে দেখা গেল ; ১৯০৮ সালের লক্ষ্মীপূজার সময়ে মাড়য়ারী বণিকেরা বিলাতী কাপড় আমদানী কমাইয়া দিল। ম্যানচেষ্টারের কলওয়ালারাও এই আন্দোলনের ফল অচিরেই বুঝিতে পারিল।

ছাত্রেরা রাজনৈতিক সভায় যোগদান করে, পিকেটিং করে, রাস্তায় রাস্তায় মাতৃনাম গাহিয়া বেড়ায়,—এতদিন পরে জাতীয় জীবনে দেশাত্ম-বোধের আনন্দ-আবেশ প্রকাশ করিবার অবসর পাইয়া লোকে দিশাহারা।

'স্বদেশী'তে ছাত্র ও সার্কুলার

সরকার বাহাদুর কখনই এসব আন্দোলন নীরবে সহ্য করিতে পারেন না ; সুতরাং 'স্বদেশী আন্দোলনের' হুজুগে ছাত্রগণ যাহাতে যোগদান করিতে না পারে, এজন্য এক সার্কুলার বা ইস্তাহার প্রচার করেন ; তৎকালীন গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী রিস্‌লী সাহেব এই সার্কুলার বাহির করিয়াছিলেন বলিয়া উহা Risley's Circular নামেই পরিচিত ছিল। ইতিপূর্বেই বাংলাদেশের কোনো কোনো বিদ্যালয়ে রাখিবন্ধনের দিন ছাত্রেরা নগ্নপদে উপবাসী হইয়া গিয়াছিল বলিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিল। সরকারী সার্কুলারের প্রতিবাদ করিবার জন্যই উৎসাহী যুবকগণ বয়স্কদের

এণ্টি-সার্কুলার সোসাইটি

সাহায্যে ও প্ররোচনায় Anti-circular Society স্থাপন করিল। কিছুকালের জন্য এই সমিতি দেশের মধ্যে বিশেষ কাজ করিয়াছিল ; স্বেচ্ছাসেবকসঙ্ঘ গঠন, স্বদেশী সামগ্রী বিক্রয় ও রাজনীতি প্রচার প্রভৃতি কার্য্য করিয়া দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই সময়ে বালক যুবকদের মধ্যে

যেসব তরুণ নেতা ও বক্তাদের প্রভাব পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ৺রমাকান্ত রায় অন্যতম। তিনিই প্রথম জাপানে স্বদেশীশিল্প শিক্ষা করিবার জন্য গমন করেন। স্বদেশীযুগের প্রথম বৎসরেই তিনি মারা যান। অপর জনপ্রিয় যুবক-নেতা ছিলেন শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু; তিনি এন্টি-সার্কুলার সোসাইটির প্রধান সভ্য ছিলেন; তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় বিপুল জনতা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া থাকিত। অন্যান্য প্রবীণ নেতাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ তখন দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়ে একছত্রাধিপতি দেশসেবক ও বীররূপে বিরাজিত। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, আবুল কাসেম, লিয়াকৎ হোসেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মোহিতচন্দ্র সেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি অনেক বক্তা, লেখক এই সময়ে ছিলেন; ইঁহাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র বিশেষভাবে জাতীয় আন্দোলনের নূতন দল গঠনে সহায়তা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ জাতীয় জীবন গঠনে কতখানি সহায়তা করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিতে পাইব।

বাংলার নেতৃগণ

১৯০৫ সালের শেষে ডিসেম্বর মাসে কাশীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়; সভাপতি ছিলেন মহামতি গোখ্‌লে। এই সভায় বঙ্গভঙ্গের কথা উঠে। সভায় স্থির হইল যে বাংলাদেশের গৃহীত স্বদেশী ও বয়কট ভারতের সর্বত্র গৃহীত হইবে। কংগ্রেসের এই অধিবেশনের সুর পূর্বের অধিবেশন-গুলি হইতে বিশেষ তফাৎ দেখা গেল। বাংলার একজন প্রতিনিধি প্রিন্স অব্‌ওয়েলসের (বর্ত্তমান পঞ্চম জর্জ্জ) আগমন উপলক্ষে কংগ্রেসের অভিনন্দন প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই। বাংলায় যে নূতন ভাব দেখা দিতেছিল এসব তাহারই চিহ্ন।

কাশী কংগ্রেস ও বয়কট

১৯০৬ সালের গুড্‌ফ্রাইডে (এপ্রিল মাসে), ১৩১৩ সালের ১লা বৈশাখ

বাংলার জাতীয় ইতিহাসে বিশেষ দিন। ঐদিন বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইবার কথা। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর নিখিল-বঙ্গের নেতাদের এই প্রথম মিলন। এই সভায় বাংলার সকল নেতাই উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশের নানা জেলা হইতে প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত এ, রসুল সভাপতি।

বরিশাল প্রাদেশিক সমিতি

পূর্ববঙ্গ-আসাম তখন পৃথক প্রদেশ। স্যর ব্যামফিলড ফুলার ছোটলাট; তিনি দুর্দন্ত প্রতাপে পূর্ববঙ্গ শাসন করিতেছিলেন। তাঁহার আদেশে প্রকাশ্যস্থানে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বরিশালের প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনকালে লাটসাহেব ফুলারের ইঙ্গিতমত ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব এমার্সনের আজ্ঞানুসারে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি নিষেধ হইল। অভ্যর্থনা সমিতি প্রকাশ্যস্থলে 'বন্দেমাতরম্' বলিবেন না অঙ্গীকার করায় এই জাতীয় সভা আহ্বান করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র ও এন্টি-সার্কুলার সোসাইটির স্বেচ্ছাসেবকগণ 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ নিষেধ আছে শুনিয়া দুঃখে ও ক্ষোভে অভ্যর্থনা-সমিতির আতিথ্যগ্রহণ করিলেন না। কলিকাতা ও মফঃস্বলের প্রতিনিধিগণ পথে আসিবার সময়ে সর্বত্র লোকদিগকে মাতৃনাম শুনাইলেন। বরিশালে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা ও স্বেচ্ছাসেবকগণ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের উক্ত আদেশ মানিতে রাজি হইলেন না। সরকারী পক্ষ হইতে এই সভা লইয়া এমন কাণ্ড করিতে লাগিলেন যেন দেশের মধ্যে একটা কোনো আকস্মিক বিদ্রোহ হইয়াছে। সভায় যাইবাব পথে পুলিশে ঘোড়সোয়ারে ছাইয়া গেল। এন্টি-সার্কুলার সোসাইটির সুসংবদ্ধ সুসংযত স্বেচ্ছাসেবকগণ 'বন্দেমাতরম্' ব্যাজ (Badge) পরিয়া রাস্তার একপাশ দিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাইতেছিল। পুলিশের রাগ ও আক্রোশ ইহাদের উপর পড়িল। প্রথমে ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নামক একজন স্বেচ্ছাসেবককে পুলিশসাহেব Kemp স্বয়ং প্রহার করিলেন। ইহারই কিছুক্ষণ পরে প্রতিনিধিগণ যখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সভাপতি রসুলকে প্রত্যুদগমন করিতেছিলেন, তখন সহসা মিছিলের পশ্চাতভাগে সোসাইটির যুবকদের উপর অকারণ আক্রমণ হইল। যুবকগণের হাতে একগাছি লাঠি পর্য্যন্ত ছিল না; তাহারা 'বন্দেমাতরম্' হাঁকিতে লাগিল, মারও খাইতে লাগিল। ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী ও চিত্তরঞ্জন গুহ বিশেষভাবে আহত হইল। কোনো যুবক প্রহার খাইয়া পলায়ন করে নাই; পুলিশের ভয় বাঙালী যুবকদের ভাঙ্গিয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ তখন অখণ্ড বাংলার নেতা; পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব এমার্সনের কাছে লইয়া যায়। এমার্সন সুরেন্দ্রনাথের প্রতি যেরূপ অভদ্র রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না; তিনিই সমস্ত নষ্টের মূল বলিয়া ম্যাজিষ্টেট্ সাহেব তাঁহাকে চারিশত টাকা জরিমানা করিলেন!

বরিশালে পুলিশ-জুলুম

বরিশালের সমিতি ভাঙ্গিবার চেষ্টা না করিলে ও যথাবিধি সভার অধিবেশন, বক্তৃতা-প্রদান ও শ্রবণ, প্রস্তাব-উত্থাপন, সমর্থন, গ্রহণ, সংশোধন, বর্জ্জন প্রভৃতি হইতে দিলে দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন যত প্রসার না লাভ করিত,—সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া, নেতাদের অপমান করিয়া, স্বেচ্ছাসেবকদের আহত করিয়া, সুরেন্দ্রনাথকে লাঞ্ছিত করিয়া, ফুলারের শাসন-সরকার বাংলাদেশে জাতীয় আন্দোলন দশগুণ বাড়াইয়া তুলিতে সাহায্য করিলেন। প্রিয়নাথ গুহ মহাশয় 'যজ্ঞভঙ্গ' নামক বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির ইতিহাসের ভূমিকায় ১৩১৪ সালে লিখিয়াছিলেন—"বরিশাল প্রাদেশিক সমিতি সংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহ রক্তাক্ষরে বাঙালীর স্মৃতিপটে লিখিত থাকা কর্ত্তব্য। সভ্যতাভিমানী বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের রাজত্বে প্রকাশ্য দিবালোকে বিনা অপরাধে রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত লোকগণের প্রহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত বোধ হয় বরিশালে প্রাদেশিক সমিতি

উপলক্ষেই প্রথম দেখা গিয়াছিল।" ঐ দিন হইতেই বাঙালীর জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হইয়াছে।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় সময়োপযোগী এক উদ্দীপনাপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিলেন—"আজ বরিশাল পুণ্য বিশাল হলো লাঠির ঘায়ে।" রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুট্‌বে ততই" "বিধির বাঁধন কাট্‌বে তুমি, এতই শক্তিমান্"। কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্যের "অবনত ভারত চাহে তোমারে", দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "বঙ্গ আমার, জননী আমার" ইত্যাদি সঙ্গীত দেশমধ্যে জাতীয়ভাব জাগ্রত করিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিল। বরিশালের আঘাতে সমগ্র বঙ্গদেশ জাগিল; 'বয়কট' আন্দোলন ভীমবেগে চলিতে লাগিল। বরিশালের আঘাতেই প্রথম একদল যুবকের মধ্যে আত্মশক্তি লাভের বাসনা জাগিল, প্রতিহিংসা লইবার প্রবৃত্তি জাগিল। এই ঘটনাটি বাঙালী যুবকদিগকে বিপ্লবের পথে লইয়া যাইতে বিশেষভাবে সহায়তা করিল। উল্লাসকর লিখিয়াছেন যে বরিশালের ঘটনা তাঁহাকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করিয়াছিল।

জাতীয় সঙ্গীত রচনা

আমরা পূর্ব্বেই রিস্‌লী-সার্কুলারের কথা বলিয়াছি। সরকার স্কুল কলেজের ছাত্রদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে নিষেধ করিয়া দিলেন; হেড্‌মাষ্টার, প্রিন্সিপাল, ইন্‌স্‌পেক্টর প্রভৃতি শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত সরকারী, বে-সরকারী কর্ম্মচারীগণ ছেলেদের উপর খুব কড়া খবরদারী আরম্ভ করিলেন; কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৭ই আগষ্ট বা ১৬ই অক্টোবরের সভায় যোগদান, নগ্নপদে বিদ্যালয়ে আগমন, সভা-সমিতিতে বালকসুলভ বক্তৃতাদান প্রভৃতি "রাজনৈতিক" অপরাধে ছাত্রদের উপর রীতিমত শাস্তি দেওয়া হইতে লাগিল। এরূপ উৎপাত মফঃস্বলের স্কুলেই বেশী হইয়াছিল। রঙ্গপুরে ইহার প্রতিবাদ করিয়া প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় খোলা হয়।

ছাত্রদের উপর জুলুম

কলিকাতায় উৎসাহী যুবকদের মধ্যে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 'বয়কট' করিবার আন্দোলন উপস্থিত হইল। দেশে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কথা চলিতে লাগিল। ১৯০৬ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্' বা National Council of Education স্থাপিত হইল। মৈমনসিংহের উদার দেশপ্রেমিক তরুণ জমিদার শ্রীব্রজেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী পাঁচলক্ষ টাকা মূল্যের এক বিষয় এই বিদ্যালয়ের জন্য দান করিলেন; শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ বিস্তর অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক একলক্ষ টাকা দান করিলেন। বাংলাদেশে ধনেমানে জ্ঞানে এমন একটি বড় লোক ছিলেন না, যাঁহার নাম এই পরিষদের সহিত যুক্ত হয় নাই। বিদ্যালয় স্থাপিত হইল; টেকনি-ক্যাল বিভাগ, গবেষণা বিভাগ, কলেজ, পাঠশালা স্থাপিত হইল; লাইব্রেরী দানে দানে ভরিয়া উঠিল। নিম্নতম শ্রেণী হইতে সর্বোচ্চ এম, এ ক্লাস পর্য্যন্ত খোলা হইল; রাতারাতি শাখা-প্রশাখাযুক্ত বটগাছ যেন প্রান্তরের মাঝে জন্মিল। কিন্তু তাহা জাতীয় জীবনের যথার্থ মৃতসঞ্জীবনী রসদ্বারা পুষ্ট হয় নাই বলিয়া অচিরেই ম্লান হইয়া গেল।

জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন

দেশে নূতন ভাব-স্রোত আসিয়াছিল বলিয়া জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে কতকগুলি স্বার্থত্যাগী অসাধারণ প্রকৃতির লোক আসিয়া জুটিল। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ বড়োদা কলেজের সহকারী-অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। সেখানে তিনি বার বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন। বাংলাদেশে নূতন প্রাণ আসিয়াছে দেখিয়া তিনি তথায় আর থাকিতে পারিলেন না; জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কার্য্যে নামমাত্র মাসহারা লইয়া যোগদান করিলেন। এই কর্মে আর একজন সাধুচরিত্র লোক যোগদান করিলেন—তাঁহার নাম আজ বাহিরের লোকে খুবকম জানে; তিনি হইতেছেন শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

জাতীয় শিক্ষায় অরবিন্দ ঘোষ

সতীশবাবু ডন্ সোসাইটি (Dawn Society) নামে একটি সভা স্থাপন করেন এবং ডন্ ম্যাগাজিন (Dawn Magazine) নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত করিলেন; সেই সম্পর্কে তাঁহার সংস্পর্শে কতকগুলি মেধাবী যুবক আসেন। তিনি ও তাঁহার ক্ষুদ্র সঙ্ঘটি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সহিত যোগযুক্ত হইলেন। এই সূত্রে বাংলাদেশের কয়েকটি উজ্জ্বল রত্ন আসিয়া জাতীয় শিক্ষার কর্মে যোগ দিলেন যেমন শ্রীবিনয়কুমার সরকার, শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীহারাণচন্দ্র চাকলদার, শ্রীকিশোরী মোহন গুপ্ত প্রভৃতি। সেযুগে সর্বত্যাগী বিনয়কুমারের দৃষ্টান্ত ছাত্রমহলে আদর্শ ছিল। কিছুদিন কাজ করিবার পর কমিটির সহিত অরবিন্দ বাবুর মতান্তর উপস্থিত হইল। তিনি পরিষদের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক সংবাদপত্র পরিচালন করিবার জন্য বন্দেমাতরম্ (Bande Mataram) নামক নূতন জাতীয় কাগজের সম্পাদক-সঙ্ঘে যোগ দিলেন। কলিকাতার দেখাদেখি বাংলার মফঃস্বল-সহরে এমন কি পূর্ববঙ্গের বহুগ্রামে, বাংলার বাহিরেও বহুস্থলে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ সে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ কি আকার ধারণ করিয়াছে! মফঃস্বলের সে-সব বিদ্যালয়ই বা কোথায়?

Dawn Society ও শিক্ষা বিস্তার

বাংলাদেশের এই বিচিত্র রাজনৈতিক আন্দোলন ও আলোচনার মধ্যে নবীন দলের বিশিষ্টতা ক্রমশই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। এই সময় হইতে বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে 'জাতীয় বীর'দিগের লইয়া উৎসব করিবার বিশেষ ধুম পড়িয়া গেল। মহারাষ্ট্রদের মধ্যে শিবাজী-উৎসবের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বাংলাদেশেও শিবাজী-উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। কলিকাতায় 'ভবানী পূজা ও 'শিবাজী-উৎসব উপলক্ষে মহারাঠা-

জাতীয় দলের জাগরণ

বীর তিলক ও খাপার্দে কলিকাতায় আসিলেন; তিন দিন ধরিয়া উৎসব, পূজা চলিল। দেশের মধ্যে ভাবের নূতন বন্যা আসিল। বাংলাদেশেও 'শিবাজী-উৎসব' হইল; এই উৎসবের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর। দেউস্করের 'দেশের কথা'র উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি। তিনি 'হিতবাদী'র সহকারী সম্পাদক ছিলেন; কলিকাতার 'ন্যাশনাল কলেজে'র বাংলার ও ইতিহাসের অধ্যাপনা করিতেন। এই মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের চেষ্টায় 'জাতীয় বীর'দের সম্বন্ধে জাতীয় আত্মবোধ বাংলাদেশে বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে 'শিবাজী-উৎসব' সম্বন্ধে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহা ভাবের দিক হইতে, সাহিত্যের দিক হইতে একটি অমূল্য সম্পদ; দুঃখের বিষয় তাঁহার এই বিখ্যাত কবিতাটি কাব্য-গ্রন্থে নাই। শিবাজী-উৎসবের সহিত বাংলাদেশে বাঙালী-বীরদের উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটক এই সময়ে দেশের মধ্যে জাতীয়তাবোধ উদ্বোধিত করিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিল। প্রতাপাদিত্য উৎসব আরম্ভ হইল; 'সীতারাম-উৎসব' সুরু হইল; বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে যেরূপভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা ইতিহাস-প্রমাণিত নয় বলিয়া যশোহরের অন্ধ-উকিল যদুগোপাল বাবু সীতারামের নূতন জীবনী লিখিলেন। দেশে Hero-worship এর নূতন ধুম পড়িয়া গেল।

বাংলাদেশে শিবাজী-উৎসব

বাংলায় বীরপূজা

তিলক, খাপার্দের কলিকাতায় আগমন, ভবানীপূজা, শিবাজী-উৎসব, অন্যান্য বীরদের পূজা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও প্রবন্ধাবলী, অরবিন্দের রচনাবলী, বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতা, 'সন্ধ্যা'র আবির্ভাব প্রভৃতি বিচিত্র কারণ বাংলার নবীনদলকে ক্রমেই প্রচীনদের হইতে মতামত, উপায় ও উদ্দেশ্য বিষয়ে পৃথক

মতভেদের সূত্রপাত

করিয়া দিতেছিল। দেশের মধ্যে দুইটি দলের সূচনা হইল। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেস হইবার কথা। নবীন দলের নেতারা তিলককে সভাপতি করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু তখনও ইঁহাদের দল পুষ্ট হয় নাই; সুরেন্দ্রনাথ তখনো দেশের নেতা; সুতরাং প্রবীণদলের ইচ্ছা ও মতানুযায়ী দাদাভাই নৌরজী সভাপতি মনোনীত হইলেন।

১৯০৬ সালের কংগ্রেস

১৯০৬ সালের কলিকাতার কংগ্রেস প্রাচীন-তন্ত্রের শেষ অধিবেশন। এই অধিবেশনে কাশী-কংগ্রেসের বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হইল, বঙ্গচ্ছেদ রদ করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হইল। সভাপতি মুসলমান সমাজকে এই আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলন সুরু হইলে যাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন অবতীর্ণ হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে দেশের ভবিষ্যত সম্বন্ধে একটা বড় রকম Idealism ছিল; তাঁহারা কংগ্রেসের 'আবেদন আর নিবেদনে' শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন। নৌরজী কংগ্রেসে বলিয়াছিলেন 'আমরা স্বরাজ চাই।' এই 'স্বরাজ' শব্দটির অর্থ এখন পর্য্যন্ত পরিষ্কৃত হয় নাই—এবং তখন ত' নয়ই। কংগ্রেসের আদর্শ ছিল খুব জোর উপনিবেশক শাসন-পদ্ধতি বা Dominionএর শাসন-ব্যবস্থা লাভ; ঐরূপ একটা কিছু সুবিধা ইংরাজের নিকট হইতে পাইলে তাঁহারা খুসী। কিন্তু নবীন দল মুক্তিকেই স্বরাজ বলিলেন, তাহার রূপ তাঁহারা দিতে পারিলেন না। তবে একটা কথা জোর করিয়া বলিলেন যে 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।' নূতন দলের সহিত প্রাচীন দলের পার্থক্য এইখানেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

ভারতবর্ষের সর্বত্রই নেতাদের মধ্যে ভারতের মুক্তির আদর্শ ও তাহা লাভের উপায় লইয়া মতভেদের সূত্রপাত হইল। কাগজে পত্রে একদল অপর দলকে মডারেট বা 'নরমপন্থী' ও একদল অপর দলকে এক্‌ষ্ট্রীমিষ্ট বা

চরম বা গরমপন্থী বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, গোখলে, ফিরোজশাহ মেঠা ও কংগ্রেসের প্রবীণ সভ্যেরা নরমপন্থীদের দলভূক্ত; বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, লিয়াকৎ হোসেন, তিলক প্রভৃতি চরমপন্থীদের নেতা। বাংলাদেশে এই নূতন জাতীয় ভাব প্রচার করিবার জন্য সেই সময়ে অনেকগুলি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই আত্মবিস্মৃত জাতির নূতন জাতীয়-চেতনাকে ভাষাদান করিবার জন্য কত লেখক, কত বক্তা, কত কবি চেষ্টা করিয়াছিলেন! মহারাষ্ট্র দেশেও 'কেশরী' ও 'কাল' এই নবীন ভাবনাকে দেশমধ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন। বাংলাদেশে 'বন্দেমাতরম', 'স্বরাজ', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' 'কর্মযোগীন্' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের একখানিও আজ নাই।

নরমপন্থী চরমপন্থী

জাতীয় দলের সংবাদপত্র

কিন্তু জাতীয় আন্দোলনে ভাব ও পত্রিকার ভাষায় মধ্যে যুগান্তর আনিল 'যুগান্তর' নামে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম হইতেই এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে দেশের মধ্যে গোপনে একটি ক্ষুদ্র চক্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করিতেছিল। এ পত্রিকা তাঁহাদেরই মুখপত্র। ইহার ভাব ও ভাষা সাধারণ পত্রিকা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। শারীরিক শক্তির দ্বারা বৃটীশ শক্তিকে পরাভূত করিতে হইবে এই মত তাঁহারা প্রচার করিতেছিলেন! শারীরিক ব্যায়ামচর্চার জন্য 'অনুশীলন-সমিতি' কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালীর ছেলে শরীরে দুর্বল এ অপবাদ ঘুচাইবার জন্য বাংলাদেশের নানাস্থানে এই সময় হইতে 'অনুশীলন সমিতি' স্থাপিত হইল; গীতাপাঠ, রাজদ্রোহাত্মক সাহিত্যপাঠ ও আলোচনা, বর্তমান রণনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা, লাঠি, তরবারী

যুগান্তর ও বিপ্লববাদ

খেলা, ছোরা প্রভৃতির ব্যবহার—এই সব শিক্ষাদান সমিতিগুলির প্রধান কাজ ছিল। যুগান্তরের লেখকগণ দেশের লোককে বুঝাইতেন যে হত্যা পাপ নহে, গীতার দোহাই দিয়া ধর্মের জন্য হত্যা করা প্রকারন্তরে সমর্থিত হইতেছিল! এই বিপ্লববাদের কথা পর পরিচ্ছেদে আলোচনা করিব। যাহাই হউক 'যুগান্তরের' বিপ্লবাদের প্রচারের ফল অচিরেই দেশমধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

অনুশীলন সমিতি

১৯০৭ সালের জুলাই মাসে 'যুগান্তরের' সম্পাদকের প্রথম জেল হয়। ভারতের অন্যত্র এই শ্রেণীর সাহিত্য ও পত্রিকাও প্রচারিত হইতেছিল। হিন্দীতে 'হিন্দস্বরাজ', মারাঠীতে 'কেশরী' ও 'কাল' দেশে অশান্তি ও অসন্তোষ প্রচারের জন্য বিশেষভাবে দায়ী ইহা সরকার মনে করেন। ১৯০৬ সালে আগষ্ট মাস হইতে 'বন্দেমাতরম্'প্রকাশিত হয়; বিপিনবাবু ইহার সম্পাদকসঙ্ঘে ছিলেন। 'বন্দেমাতরমে'র কোনো লেখার জন্য অরবিন্দ ঘোষকে পুলিশ ধরে। বিচারালয়ে বিপিনবাবু ইংরাজের কোর্টে সাক্ষী দিবেন বলেন; সেই অপরাধে তাঁহার ছয়মাস জেল হয়। অরবিন্দ মুক্তি পাইলেন। বিপিনচন্দ্র জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেশে রীতিমত উৎসব হইল, নগরে নগরে রোশনাই জ্বলিল। সরকারের কাছে লাঞ্ছিতকে গৌরবদান করিয়া লোকে ইহা বুঝাইত যে দুই পক্ষের ন্যায় অন্যায়ের মাপকাটি সম্পূর্ণ পৃথক্।

যুগান্তর ও বন্দেমাতরমের মামলা

কংগ্রেসের সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। সেবার সুরাটে কংগ্রেস হইবার কথা। এদিকে কিন্তু নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে রাজনৈতিক মতান্তর ক্রমেই মনান্তরে পরিণত হইতেছিল। ১৯০৬ সালে কলিকাতার কংগ্রেসে স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষার যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তিলক-প্রমুখ জাতীয় দলের নেতৃগণ সুরাট-কংগ্রেসে তাহা গ্রহণ করাইতে চেষ্টা

করেন। কিন্তু একদল মডারেট এই সকল প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। এ ছাড়া বিরোধের আরও কারণ ছিল। নবীনদল তাহাদের নূতন আদর্শের বার্তাবহদিগকে সম্মানিত করিতে ইচ্ছুক; ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে নূতন প্রাণ আসিয়াছে, তাহারই প্রমাণ দেখাইবার জন্ম ব্যগ্র। ১৯০৬ সালেই তাহারা তিলককে জাতীয় রাষ্ট্র-পরিষদের সভাপতি করিতে চাহিয়াছিল; সেবার হইতে পারে নাই। এবার তাহারা পঞ্জাবের অন্যতম নেতা শ্রদ্ধেয় লালা লাজপত রায়কে সভাপতি করিতে চাহিল। লাজপত রায় ইংরাজদের শাসনে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, সেইজন্যই নিখিল ভারতীয় প্রতিনিধিসঙ্ঘ কংগ্রেসে তাঁহাকে সম্মানিত করিতে চাহিল। লাজপত রায় ইহার কিছুদিন পূর্বে নির্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার নির্বাসনের কারণ এই :—

নরম ও চরম-পন্থীদের মধ্যে কংগ্রেসে মতভেদ

কিছুকাল হইতে পঞ্জাবে রায়তদের মধ্যে প্রজাসত্ব ও রাজস্ববিষয়ক ব্যাপার লইয়া অশান্তি চলিতেছিল। রাওলপিণ্ডিতে প্রথম হাঙ্গামা হইল। উত্তেজিত জনতা ডাকঘর লুট করে, একটি গির্জ্জাঘর ভাঙ্গিয়া তাহাতে প্রবেশ করে—ইত্যাদি অনর্থ ঘটিয়াছিল। সরকার বাহাদুর লালা লাজপত রায় ও শিখনেতা সর্দার অজিত সিংহকে এই হাঙ্গামার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী করিলেন এবং ১৯০৭ সালের ৯ই মে তারিখে (১৮১৮ সালে ৩ নং রেগুলেশন অনুসারে) বিনা বিচারে নির্বাসিত করিলেন। পঞ্জাব হইতে বাংলা, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ ভারতসরকারের এই ব্যবহারে অত্যন্ত চঞ্চল ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। লোকে এই শান্তির যুগে কোম্পানী আমলের শতবর্ষ পুরাতন ঐ আইনের কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। তারপর তাঁহারা যখন মুক্তি পাইলেন, একদল লোকে লালাজীকে কংগ্রেসের সভাপতি করিতে চাহিল। সরকার

লাজপত রায়ের নির্বাসন

কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত অপমানিত নেতাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া সরকারের কার্য্যের উপযুক্ত প্রতিবাদ হইবে মনে করিলেন। মডারেটদের প্রভাব তখন কংগ্রেসে প্রবল; সুতরাং শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় সভাপতি মনোনীত হইলেন। এই সব ব্যাপার লইয়া রাজনৈতিক বৈঠকে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল।

১৯০৭ সুরাট কংগ্রেস

সুরাটের-কংগ্রেস অধিবেশনের দিন প্রাচীন দল ও নবীনদলের মধ্যে বিরোধ ও মতান্তর, বিদ্বেষ ও মনান্তরে পরিণত হইল। একদিকে তিলক, খাপার্দে, অরবিন্দ প্রভৃতি জাতীয় দলের নেতারা, অপরদিকে সুরেন্দ্রনাথ, মেঠা, রাসবিহারী, গোখলে প্রভৃতি নরমপন্থীদের নেতা। রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতির পদে বরণ করিবার প্রস্তাব উঠিলে মহারাষ্ট্র প্রতিনিধিদের মধ্যে হইতে তিলক আপত্তি তুলিলেন। সভায় তর্ক, বিতর্ক আরম্ভ হইল; তর্ক বচসায়, বচসা গালাগালিতে ও অবশেষে গালাগালি মারপিটে পরিণত হইল। শোনা যায় একখানি জুতাও বিশিষ্ট নেতাদের লক্ষ্য করিয়া ছোঁড়া হইয়াছিল; কেহ বলেন উহা নরমপন্থীদের দলের কর্ম, কেহ বলেন উহা চরমপন্থীদের কার্য্য। শেষকালে পুলিশ আসিয়া সভার উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করে!

চরমপন্থীদের কংগ্রেস ত্যাগ

সুরাট-কংগ্রেসের পর হইতে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিচ্ছেদ সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিল। চরমপন্থীরা তখনো দলে পুষ্ট হয় নাই; সুতরাং প্রবীণ মডারেট নেতাদের পক্ষে মুষ্টিমেয় চরমপন্থীদিগকে constitutional পন্থা অবলম্বন করিয়া কংগ্রেস হইতে দূর করা কঠিন হইল না; কংগ্রেসের যে নূতন creed বা মতবিশ্বাস প্রণীত হইল, তাহাতে নবীনদলের কাহারো স্বাক্ষর দান করা অসম্ভব। সুতরাং তাঁহারা কংগ্রেস হইতে ১৯০৭ সালে বাদ পড়িয়া গেলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম হইতেই জাগ্রত-ভারতের নবীন প্রাণে জাতীয়ভাব বিচিত্ররূপ গ্রহণ করিতেছিল; রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্পকলা, বাণিজ্য, ব্যবসায়ে ভারতবাসীদের শক্তি প্রকাশিত হইতে লাগিল। সর্বত্র শিল্পোন্নতির সাড়া পড়িয়া গেল; অসংখ্য যৌথকারবার, মোজা গেঞ্জির কল, নিব, বোতাম, কলম, কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বিচিত্র প্রচেষ্টার মধ্যে একদল যুবক ভারতবর্ষকে মুক্তির পথে চালনা করিবার জন্ম বিপ্লবের গোপন পথ গ্রহণ করিয়াছিল। সে খবর বাহিরের সাধারণ রাখে নাই।

স্বরাজ সাধনের বিচিত্র চেষ্টা

১৯০৮ সালের ৩রা মে তারিখে মজঃফরপুরে এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইল। মিঃ কেনেডী নামক একজন ইংরাজ ব্যারিষ্টারের পত্নী ও তাঁহার কন্যা বোমার দ্বারা নিহত হন। এই হত্যার ব্যাপার এই:—মিঃ কিংসফর্ড নামক কলিকাতার জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট কলিকাতায় কয়েকটি রাজনৈতিক মোকদ্দমার বিচার করেন। তিনিই 'বন্দেমাতরম্' ও 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রিণ্টারদিগকে শাস্তি বিধান করেন। কিন্তু সব চেয়ে যাহা তৎকালীন যুবকদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছিল—তাহা হইতেছে সুশীলকুমার সেন নামক একজন উৎসাহী 'স্বদেশী' বালককে ১৫ বেত মারা। মিঃ কিংসফর্দ এই শাস্তি বিধান করেন। কিংসফর্দের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্ম বিপ্লবীরা ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লচন্দ্র চাকী নামক দুইজন তরুণ যুবককে প্রেরণ করে। মিঃ কিংসফর্দ সেই সময়ে মজঃফরপুরে বদলী হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত বোমাটি তাঁহারই উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু ভুলক্রমে মিসেস্ কেনেডী ও তাঁহার কন্যা নিহত হইল। ক্ষুদীরাম ধরা পড়িল; প্রফুল্ল ধরা পড়িবার পূর্ব্বেই আত্মহত্যা করিল। এই ঘটনা

১৯০৮ মজঃফরপুর হত্যাকাণ্ড

বিপ্লববাদের প্রথম আভাস

ঘটিবার পর দেশের লোক ও সরকার বুঝিলেন যে দেশের মধ্যে একটি বিপ্লবের আয়োজন চলিতেছে। এই ঘটনার কয়দিন পরেই মাণিকতলার বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয় ; এ সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের পর ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়া গেল। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করিয়াছিল সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই দুই যুবক ও বিশেষভাবে ক্ষুদিরাম দেশের 'বীর' বলিয়া পূজিত হইতে লাগিল।

ক্ষুদিরামের ফাঁসি ও দেশের বিকৃত মনোভাব

বাংলাদেশের মধ্যে এমন একটা মানসিক পরিবর্তন আসিয়াছিল যে, ক্ষুদিরাম যে নিরপরাধীর হত্যাকারী সেযে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, লোকে এসব কথাকে গৌরবের সহিত স্মরণ করিতে লাগিল! তাহার ছবি বাঙালীর ঘরে ঘরে তখন শোভা পাইয়াছিল।

বাংলাদেশের স্বদেশী-আন্দোলন বাংলার সীমানা বহুকাল ছাড়িয়াছিল। মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ড ও মাণিকতলার বোমার আবিষ্কার ও তদ্‌সংক্রান্ত মোকদ্দমার কথা দেশময় প্রচারিত হওয়ায় সকলেই বুঝিল, রাজনীতিক আন্দোলন প্রাচীন বাঁধা-পথ ছাড়িয়া নূতন বাঁকা-পথ ধরিয়াছে,—নূতন বাংলার নবীন-দল রুশিয়ার পথ অবলম্বন করিয়াছে। তিলক তাঁহার 'কেশরী' পত্রিকায় বোমা-নিক্ষেপ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি

বিপ্লব সম্বন্ধে তিলকের মত

দেশের তদানীন্তন অবস্থা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলেন যে বোমা-নিক্ষেপের ব্যাপার নিতান্ত গর্হিত, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু সরকারের দমন-নীতি ও অন্যান্য কঠোর ব্যবস্থার দোষে এইরূপ ঘটিয়াছে। এখন অবস্থার প্রতীকারের জন্য যদি কঠোরতর দণ্ডনীতির ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে দেশে বিদ্রোহ বিস্তারেরই সম্ভাবনা। বিদ্রোহ নিবারণের উপায়, নানাবিষয়ে সুব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া দেশবাসীর অসন্তোষ দূর করা।

সরকার সাব্যস্ত করিলেন যে তিলক এই প্রবন্ধগুলিতে কৌশলে বোমা ব্যবহারেরই সমর্থন করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি দণ্ডার্হ। সরকার তিলকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা খাড়া করিলেন; বিচারের সময় তিলক স্বয়ং আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য যেসব যুক্তি দেন, তাহা খুবই সুযুক্তিপূর্ণ ছিল। তিলকের প্রবন্ধ মারাঠা ভাষায় লিখিত; তাঁহার মামলার বিচারে জুরীদের মধ্যে সাতজন ছিলেন ইংরাজ ও দুইজন পার্শী। কেহই মূল মারাঠী বুঝেন না; পার্শী জুরীদ্বয় তাঁহাকে নির্দোষ ও সাহেব সাতজন তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বিচারে বা সেই যুগের লোকদের বিশ্বাস মত বিচারের অভিনয়ে তিলকের ছয় বৎসর কারাবাসের হুকুম হইল। ইংরাজ সরকার অশান্তি, আন্দোলন দমন করিবার উদ্দেশে এই শাস্তি দিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না; বরং তিলকের কারাগার-নিক্ষেপের জন্য সমগ্র ভারত অশান্ত হইয়া উঠিল, রাজনৈতিক আন্দোলন তিলমাত্র কমিল না।

তিলকের কারাদণ্ড

সরকার বাহাদুর এইখানে ক্ষান্ত হইলেন না; তাঁহারা ধর্ষণনীতি সবেগে চালাইতে লাগিলেন। ইতিপূর্বেই সরকার পূর্ববঙ্গের বহুস্থলে 'প্যুনিটিভ' পুলিশ বসাইয়া গ্রামবাসিদের মনে শাসনের প্রতি একাধারে ভয় ও ঘৃণার ভাব জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বহু পত্রিকার প্রিণ্টারদের জেল হইয়াছিল; 'সন্ধ্যা'র সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নামে সরকার এক মাম্‌লা খাড়া করেন; কিন্তু মামলার শুনানী শেষ হইবার পূর্বেই পুণ্যাত্মা ব্রহ্মবান্ধব আদালতের শাস্তি এড়াইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। খানা-তল্লাসী, গোয়েন্দা বিভাগের গুপ্তচরদের দৌরাত্ম্য, ভেদনীতি প্রভৃতি বিচিত্র ও বিবিধ উপায়দ্বারা স্বদেশী-আন্দোলনের মূলোচ্ছেদের চেষ্টা চলিতে লাগিল। বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের যে কয়জন নেতা, কর্মী ও

সরকারের দমন-নীতি

সহায়ক ছিলেন—তাঁহাদের উপর এইবার সরকারের কোপদৃষ্টি পড়িল। নিম্নলিখিত ব্যক্তি কয়জন নির্বাসিত হইলেন ;—(১) শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র—ইনিই 'বয়কট' প্রস্তাব করেন, এবং সে-সময়ে নির্ভীক-ভাবে সরকারের সমালোচনা করিতেন। (২) অশ্বিনী-কুমার দত্ত, (৩) সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৪) ভূপেশ-চন্দ্র নাগ ; পূর্ববঙ্গে বরিশাল জিলায় অশ্বিনীবাবু ও তাঁহার সহ-কর্মীদের ফুলারের কঠোর শাসনকে ব্যর্থ করিয়া দেশ হইতে বিলাতী সামগ্রী নির্বাসিত হইয়াছিল। (৫) মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ছিলেন 'নবশক্তি'র সম্পাদক ; কাগজখানির প্রিণ্টার পূর্বেই জেল খাটিয়াছিল ; মনোরঞ্জনবাবু চরমপন্থীদের অন্যতম নেতা ছিলেন। (৬) শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় অন্যতম সম্পাদক ছিলেন,—চরমপন্থীদের মধ্যে বিশিষ্ট নেতা ও বক্তা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। (৭) সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ইনি সর্বপ্রথম জাতীয়-বিদ্যালয় স্থান করিবার জন্য একলক্ষ টাকা দেন। (৮) শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, যুবকদের ও এন্টি-সার্কুলার সোসাইটির নেতা। (৯) পুলিনবিহারী দাস, ঢাকার অনুশীলন-সমিতির নেতা ; পূর্ববঙ্গের যুবকদের শিক্ষা-গুরু। ইহাদের সকলকেই ১৯০৮ সালে ১১ই ডিসেম্বর তারিখে ১৮১৮ সালের ৩ নং আইনানুসারে নির্বাসিত করা হইয়াছিল। বাংলাদেশের সমস্ত নেতাই আবদ্ধ হইলেন। ইতিপূর্বে আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় অরবিন্দ ধরা পড়িয়া হাজতে আটক ছিলেন ; বিপিনচন্দ্র ছয়মাস জেল খাটিয়া ফিরিয়াছেন। বাংলাদেশ চরমপন্থী নেতাশূন্য হইল। ইহার ফল যে সরকারের দিক হইতেও ভাল হইল তাহাও নয় ; নেতাশূন্য বাংলার যুবকেরা দেশের মুক্তির জন্য গোপনপথ অনুসরণ করিল ; তাহার ফল বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল।

১৯০৮-বাংলার নেতাদের নির্বাসন

সরকার এই রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করিবার জন্য একের পর এক আইন পাশ করিতে লাগিলেন। Public Meetings Act

অনুসারে সভার সময়, স্থান ও ভাষা সম্বন্ধে কড়াকড়ি হইল; Press Act অনুসারে ছাপাখানার মালিককে টাকা জমা রাখিতে বাধ্য করা হইল। এ ছাড়া সরকার 'সিডিশন আইন' রাজদ্রোহ-উত্তেজক সভার আইন পাশ করিয়া ও বিভিন্ন বিভাগ হইতে অসংখ্য হুকুম জারি করিয়া, দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের সকলপ্রকার প্রকাশ্য পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৯০৮ সালে যে-সব আইন পাশ হইয়াছিল, তাহার ফলে পূর্ব-বঙ্গের কতকগুলি সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল। যখন জনসাধারণের চোখের উপর হইতে প্রকাশ্য সভা-সমিতি উঠাইয়া দেওয়া হইল, তখন তাহারা গোপন পথে চলিল; দেশের মধ্যে বিপ্লববাদ গোপনে গোপনে সংক্রমিত হইল; বোমার মাম্‌লার বিচার ফল দেখিয়াও বিপ্লবপন্থীদের চক্ষু ফুটিল না।

বিবিধ আইন পাশ

বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের প্রথম হইতে মুসলমান সমাজ এই জাতীয় আন্দোলনে অন্তরের সহিত যোগদান করে নাই; ইহার প্রধান কারণ উক্ত সমাজে শিক্ষা তখনো তেমন প্রসার লাভ করে নাই। লর্ড কর্জন পূর্ব-বঙ্গকে পৃথক্ করিয়া মুসলমানদের বিশেষভাবে পরিতুষ্টির ব্যবস্থা করেন; ইহাতে মুসলমানেরা মুগ্ধ হইয়া দেশের সমগ্রের কল্যাণের কথা বিস্মৃত হইল ও সম্প্রদায়গত আপাত-সুবিধার জন্ত লালায়িত হইয়া জাতীয়-আন্দোলনকে নষ্ট করিতে বসিল। অবশ্য কয়েকজন মুসলমান-নেতা এই আন্দোলনে প্রাণমনে যোগদান করিয়া, অসংখ্য নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন ও হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন না তুলিয়া "জাতীয়" প্রশ্ন হিসাবে স্বদেশী-আন্দোলনকে দেখিয়াছিলেন। সে যুগের এই কয়জন নেতার নাম বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—এ, রসুল, লিয়াকৎ হোসেন, মিঃ গফুর, আবদুল কাসেম, ফজলল হক্।

স্বদেশী আন্দোলন ও মুসলমান সমাজ

হিন্দু-রাজনীতিক আন্দোলনকারীরা 'হিন্দু' জাতীয়তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ

হইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; বিশিষ্ট নেতারাও মুসলমান-দের সহিত ছুঁৎমার্গের সীমানা পার হইয়া মিশিতে পারিতেন না; এমন কি মফঃস্বলে হিন্দু-মুসলমান নেতারা বক্তৃতা করিতে গিয়াছেন; হিন্দু নেতা জল-পান করিবেন বলিয়া মুসলমান "ভ্রাতা"কে ঘরের একটু বাহিরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এইরূপ কৃত্রিম "প্রেমে" জাতীয় জীবন গড়ে না। হিন্দুরা স্বদেশী-আন্দোলনের দলপুষ্টির জন্য ও রাজনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মুসলমানকে আহ্বান করিতেছিলেন, যথার্থ প্রীতির জন্য বা মিলনের জন্য সে ডাক আসিয়াছিল কি না সন্দেহ। হিন্দুদের এই আন্তরিক দুর্বলতা পদে পদে ধরা পড়িতে লাগিল। তাহার উপর সরকারের ভেদনীতি ছিল। এসব কারণ ছাড়া Pan-Islam আন্দোলনও ভারতের মুসলমান সমাজকে আলোড়িত করিতেছিল; শাসনপ্রণালীর মধ্যে সম্প্রদায়গত নির্বাচন, শিক্ষা চাকুরী প্রভৃতির ভাগের আভাস-আয়োজন এই সময় হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বাধিবার কারণের অভাব ছিল না।

হিন্দু-মুসলমানের মিলনে বাধা

পূর্ব-বঙ্গে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ দেখা দিল। মৈমনসিংএর জামাল-পুরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গেল। কুমিল্লাতে দাঙ্গায় লোক মারা পড়িল। 'পাবনাস্থ মুসলমানেরা' অকথ্য ভাষায় হিন্দুদের গালি দিয়া, তাহাদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে লোকদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু সরকার অপরাধীকে কোনোপ্রকার শাস্তি না দিয়া কেবলমাত্র একবৎসরের জন্য 'ভাল হইয়া থাকিবা'র মুচলেখা লইয়া ছাড়িয়া দিলেন (কংগ্রেস পৃঃ ১৯৪)। এইরূপ বিচার দেখিয়া সাধারণের সন্দেহ হইয়াছিল যে হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতি শাসকদের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া তাঁহারা সুবিচার করিতে অসমর্থ। ভারতের নূতন

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ

জাগরণকে নষ্ট করিবার বিবিধ উপায়ের মধ্যে এই ভেদনীতি অন্যতম, এ কথা সাময়িক পত্রিকাসমূহ ইঙ্গিত করিতেন।

বঙ্গচ্ছেদ-আন্দোলন স্বদেশী-আন্দোলনে, ও স্বদেশী-আন্দোলন রাজনৈতিক মুক্তির জন্য জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইল। তখন ইংরাজ শাসন-কর্তারা বুঝিলেন যে শাসন-তন্ত্রের মধ্যে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন, নতুবা ভারতবাসীকে শান্ত রাখা যাইবে না। গোখ্‌লে প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞেরা ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় বহুকাল হইতে শাসনপদ্ধতির মধ্যে ভারতবাসীদের অধিকতর অধিকার দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলেন। কংগ্রেসও এ বিষয়ে বহুকাল হইতে আবেদন নিবেদন করিতেছিলেন; এবং ১৮৯৮ সালে ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকটি ভারতীয় সভ্যের পদ বাড়াইয়া তখনকার মত তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়াছিলেন। ১৯০৭ সালে লর্ড মিণ্টো বলিলেন যে ভারত-শাসনের মধ্যে সংস্কার সাধিত হইবে; ১৯০৮ সালে লর্ড মিণ্টো ও ভারতসচিব মর্লী উভয়ে মিলিয়া শাসনবিভাগে কতকগুলি সংস্কার করিলেন; ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয়দের সংখ্যা বাড়িল, প্রশ্নোত্তর করিবার অধিকার বৃদ্ধি পাইল, এমনি ছোটখাটো অনেক আপাত-সুবিধা হইল; কিন্তু এই সঙ্গে সম্প্রদায়গত নির্বাচনের ব্যবস্থা হওয়াতে দেশের মধ্যে বিরোধের বীজ উপ্ত হইল। জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে সাম্প্রদায়িকতা যে কত বড় অন্তরায়ের কারণ হইয়াছে তাহা প্রতিদিন লক্ষিত হইতেছে। হিন্দু-মুসলমানের মধুর সম্বন্ধ সেই হইতে নষ্ট হইতে সুরু হইয়াছে।

১৯০৮ মর্লী-মিণ্টো শাসন সংস্কার

সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-প্রথা

মর্লী-মিণ্টো সংস্কার ভারতে শান্তি আনিতে পারিল না। রাজনীতিক আন্দোলনকারীদের মধ্যে 'নরমপন্থী'রা অল্প-বিস্তর সকলেই নূতন সংস্কারে সুখী হইলেন; 'চরমপন্থীরা' অল্পে সুখী হইতে পারিলেন না। কিন্তু

বিপ্লববাদীদের কেহই কোনপ্রকার সংস্কারে সুখী নহেন, তাঁহারা চান আমূল সংস্কার। রাজনৈতিক ডাকাতি, হত্যা বাংলাদেশের নানাস্থানে পুনরায় দেখা দিল। ১৯০৬ সাল হইতে বাংলাদেশে যে খুন ডাকাতি আরম্ভ হয়, তাহা বন্ধ করিতে সরকারকে অনেক কষ্ট করিতে হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি সরকার "অনুশীলন সমিতি" বা তজ্জাতীয় সমিতিগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা এতদিনে প্রকাশ্য-ভাবে সমিতিতে একত্র হইয়া, অন্তরালে গুপ্তকর্মপন্থায় চলিত, এখন হইতে সবখানিই গোপনে চলিতে লাগিল। বাংলাদেশ গুপ্ত-সমিতিতে ছাইয়া গিয়াছিল। ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত গুপ্তহত্যা, ডাকাতি, পুলিশের লোক খুন ইত্যাদি করিয়া, কেবল ভয় দেখাইয়া সরকারকে বিব্রত করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। বাংলার বাহিরেও এই বিপ্লববীজ ছড়াইয়াছিল; ১৯১২ সালে লর্ড হার্ডিংজ যখন নূতন দিল্লীতে শোভাযাত্রা করিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এ ছাড়া কতকগুলি ষড়যন্ত্র-মাম্‌লা কলিকাতায়, ঢাকায়, হাওড়ায়, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে চলিতেছিল। (বাঙ্গালার বিপ্লববাদ)।

শাসন-সংস্কারে শান্তি আসিল না

বিপ্লবকারীদের দৌরাত্ম্য ও ডাকাতি

১৯১১ সাল ভারতের পক্ষে স্মরণীয়। ভারতের সম্রাট্ এ পর্য্যন্ত কখনো এদেশে আসেন নাই। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী তাঁহাদের সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভারতবর্ষে ২রা ডিসেম্বর তারিখে পদার্পণ করিলেন। ১২ই ডিসেম্বর দিল্লী-মহানগরীতে মহাআড়ম্বরে তাঁহাদের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। দিল্লী দরবারে সম্রাট্ ঘোষণা করিলেন যে বাংলার অঙ্গচ্ছেদ রদ হইল ও অখণ্ড বাংলাদেশের শাসনভার একজন গভর্ণরের উপর অর্পিত হইল। বিহার-উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর একটি পৃথক্

১৯১২ সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীর ভারত ভ্রমণ

প্রদেশ করিয়া একজন ছোটলাটের হস্তে প্রদত্ত হইল। আসাম পূর্বের মত চীফ-কমিশনরের হস্তে ফিরিয়া গেল। রাজঘোষণার দ্বিতীয় বিধানে রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী-নগরীতে স্থানান্তরিত হইল। ১৫ই ডিসেম্বর সম্রাট্ সম্রাজ্ঞী উভয়ে নূতন দিল্লীর ভিত্তি-পাষাণ প্রোথিত করিলেন।

বঙ্গচ্ছেদ রদ ঘোষণা

বঙ্গচ্ছেদ বিনা চেষ্টায় রদ হয় নাই। কংগ্রেসে ও মডারেটগণ বিধি-সঙ্গত আন্দোলন, ও ন্যায্যপথে থাকিয়া নিজেদের দাবীদাওয়া কোন দিন ছাড়েন নাই। বিলাতে স্যর হেনরী কটন্, মিঃ হারবার্ট পল, কেয়ার হার্ডি, মিঃ নেভিনসন, মিঃ ব্লাণ্ট (W. S Blunt), মিঃ হিণ্ডম্যান প্রভৃতি ভারতবন্ধুগণ পার্লামেণ্টে ও পত্রিকাদিতে ভারতের অভিযোগ সর্বদাই জ্ঞাপন করিতেন। মিঃ মর্লীর পরে লর্ড ক্রু ভারতসচিব হন। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে বিলাতে প্রেরণ করেন; তিনি লর্ড ক্রুর সহিত দেখা করিয়া বঙ্গচ্ছেদের কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন। এ ছাড়া বাংলার অশান্তিও বঙ্গচ্ছেদ রদের কারণ। সরকার মনে করিলেন যে বঙ্গচ্ছেদ রদ করিলে দেশের শান্তি ফিরিবে। কিন্তু বঙ্গচ্ছেদ যখন রদ হইল, তখন বাঙালীর মন রাজনৈতিক লাভ-লোকসানের হিসাবনিকাশ করিতেছে না; তাহারা চাহিতেছিল 'স্বরাজ'।

বিলাতে বঙ্গচ্ছেদ রদের আন্দোলন

১৯০৭ সালের সুরাট-কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাইবার পর এক বৎসরের মধ্যে চরমপন্থীদের একজন নেতাও কারাগারের বাহিরে ছিলেন না, সে কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। জাতীয় দলকে বিব্রত দেখিয়া মডারেটগণ মাদ্রাসে কংগ্রেস নিজেদের মত-মতই করিলেন। এই অধিবেশনে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছিল, নিয়মাদিও বিধিবদ্ধ

১৯০৭-১৮ কংগ্রেসের ইতিহাস

হইল। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ১৯০৮ হইতে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত যতদিন উহা প্রাচীন মড়ারেটদলের হাতে ছিল, ততদিন মোটামুটি এইরূপ ছিল—"বৃটীশ-সাম্রাজ্যের স্বায়ত্ব-শাসন-সম্পন্ন দেশগুলির (Self-Governing Dominions) ন্যায় শাসনপ্রণালী লাভ এবং সাম্রাজ্যের শাসনে তাহাদের ন্যায় অধিকার ও দায়িত্ব সম্ভোগের উদ্দেশ্যেই এই জাতীয় মহাসমিতি গঠিত।

কংগ্রেসের মত-বিশ্বাস পরিবর্তিত

বর্তমান শাসনপ্রণালীর ধীর অথচ অপ্রতিহতভাবে সংস্কার করিয়া আইনসঙ্গত উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে। জাতীয় একতা বৃদ্ধি, জাতীয় ভাবের উদ্বোধন এবং দেশের মানসিক, নৈতিক, আর্থিক ও বাণিজ্যসম্বন্ধীয় উন্নতিসাধন করাও এই মহাসমিতির কর্তব্য।" ১৯০৮ সালের মাদ্রাস-কংগ্রেস গৃহীত Creedএর কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি; নূতন Creedএর ফলে জাতীয় দলের কোনো সদস্যের পক্ষে কংগ্রেসে যোগদান করা সম্ভব হইল না। ইহার পর প্রতিবৎসর যথারীতি কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, কিন্তু এ সব প্রাণহীন সভা;—প্রতিনিধি-সংখ্যা বাঁকিপুরে ২০৭ জন মাত্র হইয়াছিল। ১৯১৪ সালে য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়; ভারতবাসী সকল দ্বন্দের কথা ভুলিয়া সাম্রাজ্যকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইল। মাদ্রাসের কংগ্রেসে প্রাদেশিক লাটসাহেব পদার্পণ করিলে সকলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। ১৯১৫ সালের

প্রাণহীন কংগ্রেস

বোম্বাইতে এইরূপই নির্জীব সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ (S. P. Sinha) সভাপতি হন। তিনি বলিলেন যে স্বায়ত্বশাসন লাভই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য, কিন্তু স্বরাজ পাইতে ভারতবাসী এখনো উপযুক্ত হয় নাই। এই শ্রেণীর মতামত লইয়া কংগ্রেস তখন কাজ করিতেছিলেন; সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে কংগ্রেস কতদূর জনমত প্রকাশ করিতেছিল। কংগ্রেস দেশের সর্বশ্রেণীর শ্রদ্ধা হারাইয়া, ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

১৯১৪ সালের প্রথমদিকে লোকমান্য তিলক তাঁহার দীর্ঘ ছয় বৎসরের নির্বাসন হইতে মুক্ত হইয়া দেশে ফিরিলেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ, তেজস্বিতা বিন্দুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি পুনরায় রাজনীতিক আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এই বৎসর শ্রীমতী আনি বেসান্ত রাজনীতিতে যোগদান করিয়া কংগ্রেসের বিভিন্ন দল ও তদীয় নেতাদের মিলনের চেষ্টা করেন। কিন্তু বোম্বাইএর মডারেটগণের জন্য সে-সব চেষ্টা ফলবতী হইল না। শ্রীমতী বেসান্ত এই সময়ে মাদ্রাসে তাঁহার কর্মক্ষেত্র স্থাপন করিয়া সেখানে 'হোমরুল লীগ' নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি পূর্ণবেগে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইতে সুরু করিলেন। বোম্বাইতে তিলক পৃথক্‌ভাবে 'ন্যাশনাল লীগ' স্থাপন করিলেন।

১৯১৪ নির্বাসন হইতে তিলকের প্রত্যাবর্তন

শ্রীমতী বেসান্ত ও হোমরুল

এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক গগনে একনক্ষত্রের আবির্ভাব ও আর একটি নক্ষত্রের তিরোভাব হইল। ১৯১৫ সালের প্রথমদিকে শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী পনের বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিবার পর মাতৃভূমির সেবার জন্য দেশে ফিরিলেন ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে লইয়া রবীন্দ্র-নাথের শান্তিনিকেতনে আসিয়া উঠিলেন। ১৯১৫ সালের ১লা আগষ্ট মহারাষ্ট্রজাতির 'মুকুট-মণি' কর্মবীর গোখ্‌লে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। গান্ধীজি গোখ্‌লেকে তাঁহার রাজনীতিক গুরু বলিতেন।

গান্ধীজির আবির্ভাব

গোখ্‌লের তিরোভাব

সমগ্র ভারতবর্ষ যুদ্ধের পর নূতন কিছু পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল; লোকমান্য তিলক ও শ্রীমতী বেসান্ত সমগ্র দেশে লোকের কাছে তাহাদের ন্যায্য দাবীর কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের জন্য

ভারতবাসী ১৫০ কোটি টাকা দান করিয়াছে; যাত্রীদের অসুবিধা করিয়া, ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া, মালপত্রের চলাচলের উপযুক্ত পরিমাণে গাড়ীর অভাব করিয়া, ভারতবর্ষ বহু শত মাইল রেলপথ, রেলগাড়ী ও সরঞ্জাম মেসোপটেমিয়ায় পাঠাইয়া দিয়াছিল; ভারতের অধিকাংশ দেশী ও বিদেশী সৈন্য মহাসমরের সকল কেন্দ্রে প্রেরিত হইয়াছিল; ভারতীয় যুবকগণ দলে দলে সৈন্য-বিভাগে ভর্তি হইতে গিয়াছে। এত করিয়া ভারতবাসী ভাবিল তাহার দাবী ন্যায্য, বৃটীশ-সাম্রাজ্যের তাহার অধিকার ও স্থান আছে। তিলক ও শ্রীমতী বেসান্ত ও তদীয় 'লীগ' দেশের কাছে সেই রাজনীতিক শিক্ষাদান করিতে-ছিলেন।

যুরোপীয় যুদ্ধে ভারতের দান

তিলক ও বেসান্তের কর্ম্মশীলতা

এই সময়ে তিলককে পুনরায় রাজনীতিক অপরাধে জড়িত করিবার চেষ্টা হয়; হোমরুল সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা সরকারের কাছে আপত্তিজনক মনে হয় ও পুণার ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ৪০,০০০ টাকার এক মুচলেখা দিতে বলেন। বোম্বাই হাইকোর্টে আপীল করিয়া তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়। শ্রীমতী বেসান্তের বক্তৃতা ও কর্ম্মশীলতায় গভর্ণ-মেণ্ট ক্রমশ বিরক্ত ও অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন।

যুরোপীয় সমরের সময়ে সাম্রাজ্যের ঘোর দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে একদিকে তিলক ও বেসান্তপ্রমুখ নেতাদের বক্তৃতায় দেশ চঞ্চল হইল, অপরদিকে বিপ্লবকারীদের উপদ্রবে দেশবাসী ও সরকার ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। বাংলার বিপ্লবী-চেষ্টার সহিত এই সময়ে পঞ্জাবের বিপ্লবীদের যোগ হয়। তা' ছাড়া আমেরিকা হইতে 'গদর' দলের অনেক শিখ ও পঞ্জাবী ভীষণ বিপ্লবী-মত লইয়া দেশে ফিরিতেছিল। এই সকল লোকের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অপরাধের প্রমাণ কিছু না থাকিলেও তাহারা যে বিপ্লবে সংযুক্ত তাহা সরকার জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহা-

সাম্রাজ্যের বিপদ ও ভারতের বিপ্লব

দিগকে সাধারণ আইনে শাস্তিদান বা আবদ্ধ করা সুকঠিন বলিয়া সরকার এই সময়ে 'ভারত-রক্ষা আইন' (Defence of India Act) পাশ করেন। এই আইন যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের পর ছয় মাস পর্য্যন্ত বাহাল থাকিবে স্থির হয়। এই আইনের সাহায্যে পুলিশ বাংলাদেশেই প্রায় ১২০০ যুবককে অন্তরায়িত করেন; পঞ্জাবেও এই আইন ও অন্যান্য আইনের সাহায্যে সহস্রাধিক পঞ্জাবী ও শিখকে অন্তরায়িত, স্বগ্রামে আবদ্ধ ও কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। অন্তরীনের কার্য্য বাংলাদেশে খুবই জবরদস্তভাবে চলিতে লাগিল; ইহার ফলে চারিদিকে অশান্তি ও অরাজকতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত। এই সময়ের সাময়িক-পত্রিকাদিতে বহু অন্তরায়িত যুবকদের উপর অত্যাচার-কাহিনী প্রকাশিত হয়। কয়েকটি আত্মহত্যার কথাও কাগজে প্রচারিত হয়। দেশের মধ্যে অন্তরীনের বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিবাদ হইতে লাগিল; কিন্তু সরকার সাম্রাজ্যের কল্যাণ ও দেশের শান্তি রাখিবার জন্য ও বিপ্লবের বীজ ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন এবং অধিকাংশ বিপ্লবীদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া দেশে শান্তি আনিলেন।

ভারত-রক্ষা আইনের প্রয়োজন

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই ভারতের সর্বশ্রেণীর মধ্যে আশা হইল যে যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষ কিছু সংস্কার পাইবে। ১৯১৬ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভার ১৯ জন বে-সরকারী হিন্দু-মুসলমান সদস্য দেশের ভাবী শাসনসংস্কার সম্বন্ধে এক খশড়া প্রস্তুত করিয়া কৌন্সিলে পেশ করেন ও দেশমধ্যে তাহা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত করেন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ নগরে কংগ্রেসের একত্রিংশৎ অধিবেশন হইল। ভারতের সম্মুখে মহৎ দিন আসিতেছে—তাহারই আশায় সকল দলের, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের নেতাগণ লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলেন; সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মালবীয় প্রভৃতি মডারেটগণ, তিলক, খাপার্দে, বিপিনচন্দ্র,

১৯১৬ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস

মতিলাল ঘোষ, চিত্তরঞ্জন, গান্ধীজি প্রভৃতি জাতীয় দলের নেতারা, মামুদাবাদের রাজা, মহম্মদ আলি, জিন্না, রসুল প্রভৃতি মুসলমাননেতারা এই মহাসমিতিতে যোগদান করিলেন। সভাপতি ছিলেন শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার—ফরিদপুরের উকিল, কংগ্রেসের অন্যতম কর্মী।

এই সভায় ভারতশাসন সম্বন্ধে এক খশড়া Constitution গৃহীত হয়; পূর্বোক্ত ব্যবস্থাপক-সভার উনিশজন বে-সরকারী সভ্য যে খশড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে 'মোসলেম লীগের' অধিবেশন লক্ষ্ণৌতে হইতেছিল। কংগ্রেস ও লীগ উভয়ে মিলিত হইয়া এই শাসন-সংস্কারের খশড়া গ্রহণ করিলেন। 'মোসলেম লীগ' ১৯০৬ সালে মুসলমান ধর্ম সমাজ ও রাজনীতির স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়; পরে ১৯১৩ সালে উহার কনষ্টিট্যুশন কিছু পরিবর্তিত হয়। লীগ বরাবর কংগ্রেস হইতে পৃথক্। ১৯১৬ সালে উভয় সভা একত্র হইয়া ভারতসরকারের নিকট হইতে নূতন Constitution দাবী করিলেন।

কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের মিলন

কংগ্রেস তখনও পূর্বের ন্যায় বৎসরে একবার করিয়া মিলিত হইত; দেশের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয়ভাবকে কর্মের মধ্য দিয়া নিরন্তর ফুটাইবার চেষ্টা কংগ্রেস তখন করিত না। হাতে-কলমে রাজনীতি শিক্ষা ও প্রচার করিবার জন্য শ্রীমতী বেসান্ত 'হোমরুল লীগ' স্থাপন করিয়া দেশময় রাজনীতিক আন্দোলন চালাইতেছিলেন; তাঁহার (constructive) গঠনশীল কর্মপদ্ধতি কিরূপভাবে গ্রহণ ও কার্য্যে পরিণত করা যাইবে, সে সম্বন্ধে কংগ্রেসের এই অধিবেশনে আলোচনা হইল।

বেসান্ত ও হোমরুল লীগ

এই কংগ্রেসের পর গান্ধীজি বিহারে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কার্য্য সুরু করিলেন। তিলক বোম্বাইপ্রদেশে ও পশ্চিম-ভারতে 'হোমরুল লীগের' প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীমতী

বেসান্ত দক্ষিণ-ভারতে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য আরও বেগের সহিত চালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজনীতিক আন্দোলনের ফলে মাদ্রাসের বহুস্থানে ছাত্রেরা স্বদেশী-যুগের ন্যায় সরকারী বিদ্যালয় ত্যাগ করিল। বেসান্ত মাদ্রাসে National University স্থাপন করিয়া বহুস্থানে স্কুল ও কলেজ স্থাপন করিলেন। আদৈরএ পূর্বেই থিওজফিক্যাল সমাজের বিদ্যালয় ছিল, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া [illegible]-বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা হইল। এদিকে শ্রীমতী বেসান্তের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় ও 'নিউইণ্ডিয়ায়' প্রকাশিত তাঁহার তীক্ষ্ণ সমালোচনা পাঠে, কর্তৃপক্ষ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সরকারের বড় বড় কর্মচারীরা তাঁহাকে বারবার সাবধান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে-সব হিতবাক্য শ্রবণ করিলেন না। তখন মাদ্রাস গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ও তাঁহার দুইজন প্রধান সহকারী (অরুণ্ডেল, ওয়াডিয়া) কর্মীকে অন্তরীনে আবদ্ধ করিলেন। ইহারই কিছুকাল পূর্বে ১৯১৫ সালে মে মাসে মুসলমান সমাজের নেতা মহম্মদ আলী ও তদীয় ভ্রাতা সৌকত আলী ভারতরক্ষা আইনানুসারে অন্তরায়িত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের মুক্তির জন্য মুসলমান সমাজ খুবই আন্দোলন করিতেছিলেন। শ্রীমতী বেসান্তের অন্তরীনে হিন্দু-সমাজ এই আন্দোলনে যোগ দিল। মোট কথা ১৯১৭ সালের প্রথম নয় মাস অন্তরীনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, আন্দোলনে ভারতের রাজনৈতিক আকাশ অত্যন্ত গরম ছিল। সরকারের ও পুলিশের অনেক অযথা ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া মাদ্রাস হাইকোর্টের ভূতপূর্ব মাননীয় বিচারপতি সুব্রহ্মণ্য আয়ার মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সভাপতি মিঃ উড্রো উইলসন সাহেবকে এক পত্র প্রেরণ করেন; সেই পত্র লইয়া সরকারী মহলে খুবই হৈ চৈ হয়,

কর্মক্ষেত্রে গান্ধীজি তিলক ও বেসান্ত

বেসান্ত ও National University

বেসান্তের অন্তরীন

সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও উড্রো উইলসন

পার্লামেণ্টেও কথাবার্তা উঠিল। কিন্তু সে-সব আন্দোলন, পত্রে কি লেখা ছিল তাহার প্রতিকারের জন্য নহে, পত্র কেন বৈদেশিক রাজ্যের 'অধীশ্বর'কে লেখা হইল, তাহারই কূট তর্ক লইয়া। রবীন্দ্রনাথও অন্তরীনের বিরুদ্ধে ও মিসেস্ বেসান্তের অপমাননার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করিয়া পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেসান্তকে গভর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া দিলেন; কিন্তু আলি ভ্রাতাদ্বয় কোনোপ্রকার সর্তের মধ্যে আবদ্ধ হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, সরকার বাহাদুর তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করা সাম্রাজ্যের কল্যাণকর হইবে না মনে করিলেন। এই বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন কলিকাতায় হইবার কথা। বাংলার অভ্যর্থনা-সভায় কংগ্রেসের সভাপতি কে হইবেন, তাহা লইয়া অত্যন্ত অশান্তি হইল। অভ্যর্থনা-সভায় জাতীয়দলের প্রাধান্য হইল; তাঁহারা শ্রীমতী বেসান্তকে সভানেত্রী করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু প্রচীন দলের লোকেরা এখনো জাতীয় দলের কাহাকেও সভানেত্রী করিতে নারাজ। জাতীয় দল নূতন অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন করিয়া রবীন্দ্রনাথকে তাহার সভাপতি করিয়া বেসান্তকে কংগ্রেসের সভানেত্রী করিবার জন্য আন্দোলন উত্থাপিত করিলেন। অবশেষে প্রাচীন অভ্যর্থনা-সমিতি জাতীয়দলের জিদ্ বজায় রাখিতে রাজি হইলে রবীন্দ্রনাথ নূতন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিত্ব ত্যাগ করিলেন ও অপর দলের সভাপতি শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ই সেই কার্য্য সম্পাদন করিলেন। ১৯১৭ সাল হইতে কংগ্রেসে জাতীয়দলের প্রাধান্য দেখা গেল। শ্রীমতী বেসান্তকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হাওড়ায় ও রাজপথে যেরূপ জনতা হইয়াছিল তাহা ইতিপূর্বে কেহ কখনো দেখে নাই। দেশের মধ্যে নবীনদল জয়ী হইল, দেশের লোক শাসনের নিকট অপমানিত ভারতভক্তকে সাদরে সকলে আহ্বান করিল—এই জনতা, এই আন্দোলন তাহারই

১৯১৭
বেসান্তের মুক্তি
কংগ্রেসে জাতীয় দল

Symbol, বেসান্ত তাহার উপলক্ষমাত্র। কংগ্রেস জাতীয়দলের হস্তগত হইল।

১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস ও মোস্‌লেম-লীগের যে সব বোঝাপড়া হয়, তাহা রাজনৈতিক মিলনের জন্য সম্পাদিত। গভীরভাবে যথার্থ আধ্যাত্মিক মিলনের পক্ষে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর বাধা ছিল এবং আজও রহিয়াছে। উদার ধর্মনীতির বিরুদ্ধে হিন্দুদের মধ্যে যেমন একদল প্রতিক্রিয়াশীল লোক আছেন—যাঁহারা 'ছুঁৎমার্গ'কে মুক্তির শ্রেষ্ঠমার্গ বলিয়া মনে করেন; তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও কাফের-বিদ্বেষী লোকের অভাব নাই। কোনো কোনো মুসলমানী কাগজ 'হোমরুল লীগ'কে তীব্রভাবে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। কংগ্রেসের সহিত লীগ্‌কে জড়িত করায় মুসলমানদের স্বার্থ হিন্দুদের হাতে সমর্পিত হইল বলিয়া এক শ্রেণীর মুসলমান অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং 'লীগ' মুসলমান জনমত প্রকাশ করে না বলিয়া লেখালেখি চলিতে লাগিল। আবার লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস 'লীগে'র সহিত মিলিত হইয়া মুসলমানদের যে-সব দাবী মিটাইতে রাজী হইয়াছেন, তাহা 'হিন্দু'-স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া এক শ্রেণীর হিন্দু অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মোট কথা, লক্ষ্ণৌর Pact বা চুক্তি হিন্দুমুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিল, জনসাধারণের মধ্যে তাহার মিলন-বার্তা পৌঁছাইল না—বিরোধ, বিদ্বেষ, বিবাদ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। বকর-ইদ্ লইয়া হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গা হাঙ্গামা কয়েক বৎসর হইতে বার্ষিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল।

হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক মিলন-চেষ্টা

য়ুরোপীয় মহাসমরের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র দরিদ্র লোকের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষ ঋণী দেশ; তাহার কাঁচামাল বিদেশে বিক্রয় হয়—জাহাজ ও রেলের অভাবে তাহার বিক্রয়

কমিয়াছিল; শিল্পজাত সামগ্রী য়ুরোপ হইতে যুদ্ধের জন্য আসিতে পারিতেছিল না। ভারতবাসীর রপ্তানীতে তাহার পয়সা আসিল না, আমদানীতে অসম্ভব দাম দিতে হইল। জিনিষপত্রের দাম অসম্ভব বাড়িয়াছিল; যুদ্ধের জন্য কোটি কোটি মণ ধান গম রপ্তানী হইয়া যাইতেছিল; দেশে দুর্মূল্যতার জন্য দরিদ্রেরা প্রচুর আহার্য্য কিনিতে অপারক হইল। বস্ত্রাভাবে লোকে লজ্জা নিবারণ করিতে অসমর্থ। বাংলাদেশের কয়েকস্থান হইতে বস্ত্রাভাবে অন্নাভাবে আত্মহত্যার কথা পর্য্যন্ত শোনা গিয়াছিল। সরকার কয়েকবার বাজার-দর বাঁধিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার ফল বিশেষ কিছু হয় নাই। দরিদ্রকে শোষণ করিয়া কি এদেশের, কি বিদেশের মূলধনী কারবারীরা, কলওয়ালারা ক্রোড়পতি হইল। সাধারণ লোকের কাছে এদেশের সাধারণ সাহেব, বিলাতের সাহেব, য়ুরোপীয় সাহেব, ইংরাজ সরকার, সমস্তই এক অর্থবোধক। দুর্মূল্যতার মূলে যে একটা (International Relations) আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সম্বন্ধ আছে সেকথা লোকে বুঝে না; তাহারা ইহার জন্য সরকারকে দায়ী করিয়া মনে মনে অসন্তোষ পোষণ করিতে লাগিল।

দুর্মূল্যতা ও দারিদ্র্য

এই সময়ে য়ুরোপীয় মহাসমরের একটী বড় মিত্ররাজ্যের উপর একটা বিপ্লবের যবনিকা পড়িয়া গেল। রুশ-সাম্রাজ্য অন্তর্বিপ্লবে ভাঙ্গিয়া পড়িল। জার্মানী তখন পূর্ব-সীমান্তে প্রবল; অনেকের ভয় হইল যে রুশের ভিতর দিয়া মধ্য-এশিয়া অতিক্রম করিয়া জার্মানীর পক্ষে এদেশে আসা অসম্ভব নয়। রুশ ভাঙ্গিয়া পড়াতে বৃটীশ সরকার বুঝিলেন যে যুদ্ধ অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলিতে পারে; সেইজন্য সাম্রাজ্যের সর্বত্র হইতে সহায়, সম্বল, অর্থ, বল সংগ্রহের জন্য বিপুল চেষ্টা আরম্ভ হইল। ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে বড়লাট দিল্লীতে সরকারী বে-সরকারী বড় বড় লোকদের

১৯১৮ সমর কনফারেন্স

ও দেশের নেতাদের এই ঘোর দুর্দিনে সাম্রাজ্য-রক্ষা বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। দেশের যুদ্ধোপযোগী সামগ্রী সরকারের হস্তে অর্পণ, সৈন্য-সংগ্রহে ও সমরঋণে অর্থদান করিবার জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করা হইল। দেশের প্রত্যেক নেতা এই বিষয়ে সরকারের সহযোগিতা করিয়াছিলেন। গান্ধীজি নিজে অহিংসা-ধর্মে বিশ্বাসবান্ হইয়াও, ইংরাজ-সরকারকে সকল প্রকার সহযোগিতার সুযোগ দান করিয়া, হিংসাকর্মে রত হইবার জন্য সৈন্য-সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

অর্থ ও সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টায় বে-সরকারী লোক

এই সময় হইতে ভারতের সকল রাজনৈতিক বা লৌকিক কর্মে শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর নাম উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজির জীবন-চরিত পাঠকমাত্রেই জানেন যে দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি কি প্রকারে আত্ম-ত্যাগ করিয়া ভারতের গৌরব, মনুষ্যত্বের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯১৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌর কংগ্রেসে গান্ধীজি উপস্থিত ছিলেন; দেশের কার্য্যে আহ্বান আসিলেই তাহাতে তিনি যোগদান করিবেন বুঝা গেল। ১৯১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে চম্পারণের চাষাদের পক্ষ লইয়া তিনি নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া সরকারকে নীলের তদন্ত-বৈঠক বসাইতে হইল; এবং তাহারই ফলে চাষাদের অনেক দুঃখ কষ্ট অন্যায় অত্যাচার দূর হইল। ১৯১৮ সালের প্রথম ভাগে গুজরাটের অন্তর্গত কায়রা জেলায় অজন্মাবশত দারুণ অন্নকষ্ট দেখা দেয়। ফলে অনেক প্রজা এমনি নিসম্বল হইয়া পড়ে যে, তাহারা সরকারী খাজনা দিতে অসমর্থ হয়। 'গুজরাট সভা' কমিশনরের নিকট

গান্ধীজি ও নীলচাষ

কয়রায় দুর্ভিক্ষ ও সত্যগ্রহ

'ডেপুটেশন' প্রেরণ করিলেন, সরকার তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। ২২শে মার্চ গান্ধীজি কায়রার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যখন বুঝিলেন, যে তাহারা সত্যই দিতে অপারক, তখন তিনি তাহাদিগকে 'সত্যগ্রহ' বা Passive Resistence ব্রত লইতে বলিলেন। ইহার অর্থ এই—সরকারী কর্মচারীরা যতই উৎপীড়ন করুক তাহারা খাজনা দিবে না; জুনমাস পর্য্যন্ত আন্দোলন চলিল। দলে দলে প্রজারা সর্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সরকার খাজনা মুলতুবী দিয়া সন্ধি করিলেন।

ভারতের শাসন-প্রণালীর পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন, একথা এদেশে ও বিলাতে রাজনীতিজ্ঞেরা কিছুকাল হইতে আলোচনা করিতেছিলেন। ১৯১৬ সালে ব্যবস্থাপক সভার উনিশজন বে-সরকারী সভ্য শাসন-পদ্ধতির এক খসড়া প্রস্তুত করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন; তাহার পর সেই খশড়াকে একটু বদল করিয়া কংগ্রেস ও লীগ গ্রহণ করেন ও তাহার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করেন। ভারত সরকার নূতন শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া এক খশড়া-লিপি বিলাতে প্রেরণ করেন। দেশীয় কাগজে নূতন একটা কিছু হইবে বলিয়া খুবই আশা পোষণ করিতেছিলেন। ১৯১৭ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ঘোষণা করিলেন যে ভারতে ক্রমশ-লভ্য স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা অচিরে করা হইবে। তাঁহার সেই বক্তৃতাকে আশ্রয় করিয়া ভারতের সকল রাজনৈতিক দলই অনেক আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। ঐ বৎসরের শেষে ভারত-সচিব স্বয়ং এদেশে আসিলেন ও লর্ড চেমসফোর্ডের সহিত ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর বক্তব্য নীরবে শ্রবণ করিলেন। তাঁহাদের মিলিত প্রতিবেদন ১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই তারিখ প্রকাশিত হইল। তাঁহাদের প্রস্তাবিত সংস্কার সম্বন্ধে আমরা

১৯১৭ সালের সংস্কার ঘোষণা

"ভারত-পরিচয়ে" বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। প্রাচীন মডারেটগণ প্রতিবেদন পাঠ করিয়া খুব বড় দান পাইয়াছেন বলিয়া উৎফুল্ল হইলেন; জাতীয় দলের নেতারা ইহার মধ্যে কিছুই নাই বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি ১৯১৭ সাল হইতে কংগ্রেস জাতীয় দলের হাতে গিয়া পড়ে। জাতীয় দল দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিলেন; প্রাচীন দল জাতীয় দলের মনোভাব বুঝিয়া বোম্বাইতে 'মডারেট কন্‌ফারেন্স' নাম দিয়া এক সভা আহ্বান করিলেন;

১৯১৮ জুলাই মণ্টেগু ও চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার

কংগ্রেস ও মডারেট কন্‌ফারেন্স

এই সভায় মডারেটগণ মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড প্রতিবেদনকে ভারতের শাসন-সংস্কারের বড় রকম দান বলিয়া গ্রহণ করিলেন। অপর দিকে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইল। লোকমান্য তিলক তখন বিলাতে ছিলেন বলিয়া মালবীয়জী সভাপতি হইলেন। এই সভায় নূতন শাসন-সংস্কারের অসারতা প্রদর্শিত হইল; এবং ভারতবাসী যে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন চাহে, তাহাই ঘোষণা করিলেন। এ ছাড়া রৌলাট রিপোর্টের শেষভাগে ভারত-রক্ষা আইন জারী করিবার জন্য যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে এই সভায় ঘোর প্রতিবাদ হইল। ভারত-রক্ষা আইন যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধের পর ছয়মাস পর্য্যন্ত বাহাল থাকিবার কথা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে দেশে শান্তিরক্ষা করিবার জন্য রাজদ্রোহ প্রভৃতি কিরূপভাবে দমন করা যায়, তাহারই আবিষ্কারের জন্য এক তদন্ত-বৈঠক বসানো হয়। বিচারপতি রৌলাট বিলাত হইতে এই সভায় সভাপতি হন; বোম্বাই-এর প্রধান বিচারপতি বেসিল স্কট, মাদ্রাস হাইকোর্টের জজ্‌ কুমারস্বামী শাস্ত্রী, কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল প্রভাসচন্দ্র মিত্র ও স্যর লভেট্ ফ্রেজার এই সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারা ভারতের বিপ্লব-

বিদ্রোহ তদন্ত-বৈঠক প্রতিবেদন

বাদের ইতিহাস তদন্ত করেন ও কি উপায়ে ভবিষ্যতে ঐ সকল বিপদ দমন করা যাইতে পারে, সেসম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য প্রদান করেন। ১৯১৮ সালে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড প্রতিবেদন প্রকাশিত হইবার কয়েকদিন পরেই Sedition Committee বা রৌলট কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই রৌলট কমিটি ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনকে নূতন পথে চালনা করিবার জন্য বিশেষভাবে দায়ী বলিয়া আমরা তৎকাল ও তৎসংক্রান্ত ঘটনাবলী পর পরিচ্ছেদে বিবৃত করিব।

চতুর্থ পর্ব

অসহযোগ-যুগ

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে য়ুরোপীয় মহাসমর অকস্মাৎ শেষ হইয়া গেল; জার্মেনী অন্তর্বিপ্লবে ভাঙ্গিয়া পড়িল ও সঙ্গে সঙ্গে মিত্রশক্তির নিকট পরাভূত হইল। যুদ্ধের পর সন্ধি-সভায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সকল দেশ হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হইল; ভারতবর্ষ হইতে যুক্তপ্রদেশের ছোটলাট স্যর জন মেষ্টন, স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ ও বিকানীরের মহারাজাকে ভারত-সরকার ভারতের প্রতিনিধিরূপে পাঠাইলেন। কিন্তু ইঁহারা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলিলে ভুল হইবে; ইঁহারা ভারত-সরকারের মনোনীত লোক মাত্র।

অকস্মাৎ যুদ্ধশেষ ও সন্ধিসভা

বৃটীশ-সরকার স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসাদকে অনেক সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন; সাম্রাজ্যের সমর-বৈঠকে তিনি প্রথম ভারতীয় সভ্য। সন্ধি-বৈঠকেও তিনি প্রথম ভারতবাসী; তিনি House of Lordsএর প্রথম ভারতীয় সদস্য এবং পরে বিহার-উড়িষ্যার প্রথম গভর্ণর হন। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষকে এই সব সম্মানে ভূষিত দেখিয়া কয়েকজন সম্মানাকাঙ্ক্ষী লোকের মন সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল বটে, কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত সমাজ ও জাতীয় দলের মধ্যে এই সব সম্মান প্রাপ্তির কোনো মূল্য ছিল না। সুতরাং ওসব ঘটনা জাতীয় দলকে লুব্ধ বা জাতীয় আন্দোলনকে প্রতিহত করিতে পারিল না।

দেশীয়দের সম্মান দান

পূর্বোল্লিখিত সিডিশন কমিটি ভারতের বিপ্লববাদের ইতিহাস অনু-

সন্ধান করিয়া প্রকাশ করেন, সে কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। দেশময় রাজদ্রোহ প্রচার, রাজনৈতিক কর্মের জন্য লুণ্ঠন ও অর্থসংগ্রহ, রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা, এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের বিপ্লবকারীদের যোগস্থাপন ও গুপ্ত ষড়যন্ত্র, অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের জন্য জার্মানদের সহিত গোপন বন্দোবস্ত, দেশীয় সৈনিকদিগের মধ্যে বিদ্রোহ জাগাইবার চেষ্টা প্রভৃতি প্রকাশ হইয়া পড়িল। বৃটীশ-ভারতে অনির্দিষ্ট অপরাধে বা সন্দেহে কাহাকে শাস্তি দিবার বা সংহত করিবার শক্তি সাধারণ আইন-পুস্তকে নাই। সেইজন্য ১৯১৫ সালে ভারত-সরকারকে "ভারত-রক্ষা আইন" প্রস্তুত করিয়া তাহার সাহায্যে ও ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনের সাহায্যে বিপ্লব-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দিগকে অন্তরায়িত বা নির্বাসিত করা সম্ভব হইয়াছিল। ভারত-রক্ষা আইন যুদ্ধের পর ছয়মাস মাত্র কার্য্যকারী থাকিবে, অথচ সাধারণ দণ্ডবিধির দ্বারা বিপ্লবকারীদের অতি সতর্ক ব্যবস্থা ও কার্য্যাবলীকে শাসনের মধ্যে ফেলা দুষ্কর। এইজন্য ভারতের দণ্ডবিধির পরিবর্তনের প্রয়োজন হইল। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে, সরকারী মহলে রৌলট-কমিটির প্রতিবেদন ও দণ্ডবিধি-পরিবর্তন সম্বন্ধে উক্ত কমিটির মন্তব্য লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইল। ১৯১৮ সালের কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ও ডিসেম্বরের বার্ষিক সভায় নেতারা রৌলট-কমিটির দণ্ডবিধি পরিবর্তন সম্বন্ধীয় মন্তব্যের প্রতিবাদ করিলেন। তখনও কমিটির নির্দেশানুসারে আইন পাশ হইবে বলিয়া কোনো কথা হয় নাই।

রৌলট-কমিটির বিপ্লবের ইতিহাস

ভারত-রক্ষা আইন অস্থায়ী

ভারত-সরকার রৌলট-কমিটির মন্তব্য অনুসারে দুইটি বিলের খশড়া প্রস্তুত করিলেন। প্রথম আইনের দ্বারা রাজদ্রোহ জনিত মামলা বিচার করিবার জন্য একটি নূতন বিচারালয় গঠন করিবার প্রস্তাব করা হয়। এই

রৌলট বিলের প্রস্তাব

বিচারালয়ে তিন জন হাইকোর্টের জজ বিচারক হইবেন; এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আর কোনো আপীল চলিবে না। রাজদ্রোহসূচক প্রত্যেক মোকদ্দমার বিচারের জন্যই যে এই শ্রেণীর আদালত গঠিত হইবে তাহার কোন মানে নাই; কেবল যখন বড়লাট বাহাদুরের বিশ্বাস হইবে যে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন সেই প্রদেশে উক্ত প্রকারের মোকদ্দমার বিচারের জন্য বিশেষ বিচারালয় গঠিত হইবে; এমন কি কোনো প্রদেশে রাজদ্রোহী বা বিপ্লবকারীদের অত্যাচারের সম্ভাবনা হইলেও বড়লাট বাহাদুর উক্ত প্রদেশের শাসনকর্তার হস্তে এমন ক্ষমতা অর্পণ করিবেন, যাহার দ্বারা বিপ্লব-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিকট শান্তিরক্ষার জন্য মুচলেখা লইতে পারিবেন, তাহাদিগকে স্থানবিশেষে বাস করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন, অথবা তাহাদিগকে কোন কার্য্যবিশেষ হইতে নিরত হইতে হুকুম দিতে পারিবেন। তবে কোন ব্যক্তির উপর পূর্বোক্ত হুকুম জারি করিবার পূর্বে তাহার বিরুদ্ধে যে সমস্ত কাগজপত্র আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট প্রমাণ আছে দেখিয়া তবে হুকুম জারী করা হইবে। এই সব কাগজপত্র পরীক্ষার ভার একজন জজ ও একজন বে-সরকারী দেশীয় ব্যক্তির উপর অর্পিত হইবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে কোনো প্রদেশে বিপ্লব-অত্যাচার অত্যধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা হইলে উক্ত প্রদেশের গবর্ণর বাহাদুর সন্দেহের উপর যেকোন লোককে গ্রেপ্তার করিতে ও ইচ্ছামত যেকোন সর্তে কারারুদ্ধ করিতে পারিবেন। আবশ্যক বোধ হইলে এই আইনের সাহায্যে কারারুদ্ধ বা নজরবন্দী ব্যক্তির কারাবরোধের সময় বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা থাকিবে। মোট কথা 'ভারত-রক্ষা আইন' উঠিয়া গেলেও রাজদ্রোহ দমন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের হস্তে উক্ত ক্ষমতা সকল দান করাই নূতন বিলের প্রধান উদ্দেশ্য। ভারত-রক্ষা আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে গভর্ণমেণ্ট রাজ-

প্রথম আইন

দ্রোহ দমন করিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ; যুদ্ধের ছয় মাস পরে বিপ্লব-বাদীরা পুনরায় নিষ্কৃতি পাইয়া পাছে রাজদ্রোহ প্রচার বা বিপ্লবকর্ম অনুষ্ঠান করে, সেইজন্যই এই বিশেষ বিধির ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় রেীলট আইনের উদ্দেশ্য ফৌজদারী বা ভারতীয় দণ্ডবিধির পরিবর্তন। অতঃপর যদি কাহারও নিকট রাজদ্রোহাত্মক কোন কাগজ পাওয়া যায় ও যদি প্রমাণ হয় যে উক্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্য উক্ত কাগজ প্রচার করা, তাহা হইলে তাহার কারা-দণ্ড হইবে। যদি কোন অপরাধী নিজ দোষ স্বীকার করে ও অন্যান্য অপরাধীর বিপক্ষে গভর্ণমেণ্টকে সংবাদ দিয়া সাক্ষী দেয়, তাহা হইলে সরকার বাহাদুর তাহাকে তাহার সঙ্গীদের প্রতিহিংসামূলক অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিতে পারিবেন। এ পর্য্যন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিনানুমতিতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কতকগুলি অপরাধে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিতেন না ; নূতন আইন অনুসারে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অনুমতি দরকার হইবে না এবং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্বাহ্নে পুলিশের দ্বারা তদন্ত করিয়া কাহাকে দোষী বলিয়া সন্দেহ করিলেই তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তি রাজদ্রোহ অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে, তাহার কারাবাস পূর্ণ হইলেও উক্ত আদালত তাহার নিকট দুই বৎসরের মুচলেখা লিখিয়া লইতে পারিবেন।

দ্বিতীয় আইন

১৯১৯ সালে মার্চমাসে উল্লিখিত বিল দুইটি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উঠিলে বে-সরকারী দেশীয় সদস্যগণ একযোগে প্রতিবাদ করিলেন এবং একযোগে বলিলেন যে বিল দুইটিই ন্যায় ও স্বাধীনতার মূলতন্ত্র বিরোধী এবং মানুষের সহজাত অধিকারের পরিপন্থী। সরকারী তরফের লোকেরা কিছুতেই মূল বিল প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করা রাজনীতিক সুবুদ্ধির পরিচায়ক

১৯১৯ ব্যবস্থাপক সভায় রেীলট বিল

হইবে বলিয়া মনে করিলেন না। শেষে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী ও সাহেব সভ্যের সংখ্যাধিক্যহেতু বিল দুইটি বে-সরকারী সদস্যগণের সম্মিলিত প্রতিবাদ ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাশ হইয়া গেল। তবে গভর্ণমেণ্ট এইটুকু প্রতিশ্রুতি দিলেন যে প্রথম আইনটি কখনও রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে না এবং তিন বৎসর পরে উহা প্রত্যাহার করা হইবে।

ভারতের জনসাধারণের মধ্যে এই ব্যাপার লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হইল। গান্ধীজি এই বিল দুইটির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি দেশবাসীকে এই আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিয়া নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র প্রচার করিলেন :—"রৌলট-আইন ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও মানুষের জন্মলব্ধ স্বাভাবিক স্বাধীনতার পরিপন্থী; অতএব যতদিন পর্য্যন্ত এই অসঙ্গত ও অপমানজনক আইন ভারত সরকার প্রত্যাহার না করেন, ততদিন আমরা সম্মিলিতভাবে এই আইন মানিতে অস্বীকার করিব। তবে শাসক ও শাসিতের এই বিরোধে আমরা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-পন্থা (Passive Resistance) গ্রহণ করিব।"

বিলের বিরুদ্ধে গান্ধীজির প্রতিবাদ

ইহাই 'সত্যগ্রহ' আন্দোলনের মূল। বোম্বাই অঞ্চলে বহুলোকে এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিল। গান্ধীজি আইনলঙ্ঘনকল্পে স্বয়ং বোম্বাই-রাজপথে নিষিদ্ধ পুস্তিকা বিক্রয় করিতে লাগিলেন।

অপরদিকে একদল দায়িত্ববোধহীন আন্দোলনকারী রৌলট-আইন সম্বন্ধে নানারূপ অতিরঞ্জিত কথা প্রচার করিতেছিলেন। শিক্ষিত সমাজও সিদ্ধান্ত করিলেন, সরকারের এদেশে উদার রাজনীতি অবলম্বনের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইবে না। দেশের নিদারুণ দারিদ্র্য, খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদির দুর্মূল্যতাহেতু লোকের মন পূর্ব হইতে সরকারের উপর অপ্রসন্ন ছিল; এখন রৌলট-বিল সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ও বিকৃত ব্যাখ্যার কথা

প্রচারিত হইতে থাকিলে লোকে ভাবিল, এই আইন পাশ হইলে নিরপরাধ সাধারণ লোকের দুর্দশা চরমে উঠিবে।

১৯১৯ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে রৌলট আইন পাশ হইল। গান্ধীজি দেশময় ঘোষণা করিলেন যে ৩০শে মার্চ, রবিবার, রৌলট-আইনের প্রতিবাদকল্পে দেশব্যাপী হরতাল হইবে—অর্থাৎ সেদিন লোকে উপবাসী থাকিয়া ধর্মাচরণ করিবে; বাজারের দোকানপাট বন্ধ থাকিবে। ৩০শে মার্চ ভারতের সর্বত্র গান্ধীজির এই আদেশ লোকে মানিয়া লইল। দিল্লীতে এই উপলক্ষে হাঙ্গামা হইল; পুলিশ ও সৈন্য জনতার উপর গুলি চালাইয়া সাত আটজনকে নিহত ও বহুলোককে আহত করেন।

৩০শে মার্চ হরতাল

দিল্লীর দাঙ্গা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এই সময়ে দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাবলে আকৃষ্ট হইয়া লোকে সহজেই তাঁহাকে এই আন্দোলনের নেতারূপে বরণ করিয়া লইল। ৬ই এপ্রিল তারিখে পুনরায় হরতাল হইল। দিল্লীর হাঙ্গামা ও ৬ই তারিখের হরতালের কথা শুনিয়া গান্ধীজি ৯ই এপ্রিল বোম্বাই হইতে দিল্লী যাত্রা করিলেন; পথিমধ্যে তাঁহাকে দিল্লী প্রবেশে বাধা দেওয়া হইল এবং বোম্বাইতে ফিরিয়া যাইতে তিনি বাধ্য হইলেন। এই সংবাদ অত্যন্ত বিকৃতভাবে চারিদিকে রাষ্ট্র হইতে থাকিলে দেশময় ও বিশেষভাবে পঞ্জাবে অত্যন্ত চঞ্চলতা দেখা দিল। দিল্লীতে পুনরায় হরতাল ও পুলিশের গুলিতে পুনরায় জন আঠার লোক হতাহত হইল; সুতরাং লোকেদের মধ্যে পুলিশ ও সরকার বাহাদুরের উপর অশ্রদ্ধা যে বাড়িবে তাহাতে আশ্চর্যোর কিছুই থাকিল না। এই সময়ে হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতির যে অভিনয় দিল্লীনগরীতে হইয়াছিল, তাহা ইতিপূর্বে কখনো হয় নাই। হিন্দুমুসলমান পরস্পরের হাত হইতে জলপান করিয়াছিল; মুসলমানেরা তাহাদের বিখ্যাত 'জুমা-

দিল্লীপথে গান্ধীজির বাধা

মস্‌জিদে' স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে লইয়া গিয়া বেদী হইতে হিন্দুমুসলমান ও বর্তমান রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে দিল।

'গান্ধীজি গ্রেপ্তার হইয়াছেন' এই এক মিথ্যা সংবাদ সমগ্র উত্তর ভারতে রাষ্ট্র হইয়াছিল; ইহার ফলে ১১ই, ১২ই, ১৩ই এপ্রিল সমগ্র উত্তর-ভারতে অস্বাভাবিক উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছিল। বোম্বাই প্রদেশে আমাদাবাদে, বীরঙ্গমে, নদিয়াদে জনতার সহিত পুলিশের হাঙ্গামা হয়।

১১—১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত অশান্তি

আমাদাবাদের কলের কুলিদের মধ্যে এমনি উত্তেজনা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয় যে, অবশেষে সামরিক আইন জারি করিয়া পুলিশ ও সৈন্য সেই অশান্তি নিবারণ করে। উক্ত দিবস কলিকাতায় অশান্তি হয় ও তাহার ফলে পাঁচ ছয়জন লোক হত ও দশ বারজন আহত হয়। হতাহতের মধ্যে সকলেই যে দাঙ্গায় লিপ্ত ছিল, তাহা নহে। গান্ধীজি চারিদিকে এই অশান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া আমাদাবাদে বলিলেন,—"ইহা ত সত্যগ্রহ নহে, ইহা দুর্গ্রহেরও অধিক। যাহারা সত্যগ্রহ ব্রত ধারণ করিয়াছে, তাহারা সর্বপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াও অন্যের প্রতি বলপ্রয়োগে নিবৃত্ত থাকিতে বাধ্য। তাহারা অন্যের ক্ষতি সাধনের জন্য লোষ্ট্র নিক্ষেপ প্রভৃতি কুকার্য্য হইতে সর্বদা বিরত থাকিতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ।"

এই একই সময়ে পঞ্জাবের নানাস্থানে হরতাল ও তদুপলক্ষে হাঙ্গামা বাধে। ৩০শে মার্চ হরতালের সময় কোথায় কোনও উপদ্রব হয় নাই। কিন্তু এই সময়ে পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট পঞ্জাবের সর্বজনপ্রিয় নেতা ডাঃ কিচ্‌লু

পঞ্জাবে অশান্তি

ও সত্যপালকে অকস্মাৎ অন্তরিত করায় দেশের মধ্যে ভীষণ চঞ্চলতার সৃষ্টি হইল। ৯ই এপ্রিল যেদিন দিল্লী যাইবার পথে গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করা হয়, ঠিক সেই দিনই কিচ্‌লু ও সত্যপালকে ডেপুটি-কমিশনর সাহেব তাঁহার বাংলোএ ডাকিয়া লইয়া গিয়া, তথা হইতে তাঁহাদিগকে নির্বাসনে পাঠাইয়া দেন।

এই সংবাদ প্রচারিত হইলে অমৃতসহরে খুবই উত্তেজনা হয়; লোকে একত্র হইয়া তাহাদের নেতাদ্বয়ের মুক্তির জন্য ডেপুটি-কমিশনরের নিকট প্রার্থনা জানাইতে যাইতেছিল; তাহারা নিরস্ত্র ভাবেই অগ্রসর হইতেছিল। সরকার বলেন তাহারা ইংরাজপল্লী আক্রমণ করিতে যাইতেছিল; কিন্তু নিরস্ত্র লোক চীৎকার করিতে পারে, আক্রমণ কি লইয়া করিবে? পুলিশ তাহাদিগকে ফিরিতে বলে; কিন্তু তাহারা জোর করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে; তখন পুলিশও গুলি চালায়। উন্মত্ত জনতা সেখান হইতে ফিরিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাঙ্গামা সুরু করিয়া দিল। পথে টেলিগ্রাফ আপিষ ও রেলওয়ে মালগুদাম ভাঙ্গিয়া ফেলে, একটি ব্যাঙ্কে অগ্নিসংযোগ করিয়া পুড়াইয়া দেয়, কয়েকটি সরকারি আপিষগৃহ দগ্ধ করিয়া ফেলে। মিস্ শেরউড নাম্নী এক ইংরাজ মহিলা দুর্বৃত্তদের হাতে আহত ও নির্যাতিত হইলেন, যদিও দেশীয় ভদ্রলোকেরাই তাঁহাকে রক্ষা করেন। লাহোরেও অনেক অধিবাসী একত্র হইয়া সহরের বাহিরে ইংরাজপল্লী অভিমুখে ধাবিত হওয়ায় পুলিশ তাহাদিগের উপর গুলি করে। পঞ্জাবের বহুস্থলে হাঙ্গামাকারীরা টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেয়। কাসুর ও অমৃতসহরের মধ্যে রেলওয়ে ষ্টেশনগুলি হাঙ্গামাকারিগণ লুণ্ঠন করিয়াছিল। কাসুরে একজন ইংরাজ সৈন্য নিহত ও দুইজন সৈন্যাধ্যক্ষ আহত হয়। তখন পঞ্জাবের ছোটলাট স্যর মাইকেল ও'ডায়ের বড়লাট বাহাদুর লর্ড চেমসফোর্ডের অনুমতি লইয়া পঞ্জাবে সামরিক-আইন জারি করিলেন। ডেপুটি-কমিশনর সাহেব ১০ই এপ্রিল তারিখে অমৃতসহরের ভার জেনারেল ডায়ারের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু ১১ই, ১২ই তারিখে কোনো উপদ্রব ঘটিল না।

অমৃতসহরে ও অন্যান্য স্থলে দাঙ্গা

১০ই এপ্রিল পঞ্জাবে সামরিক-আইন পাশ

ইতিমধ্যে সরকার স্থির করিলেন যে দেশে দ্বিতীয় 'সিপাহী বিদ্রোহ' উপস্থিত, সুতরাং ইহাকে কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে। ১৩ই এপ্রিল

রবিবার, অমৃতসহরে বৈশাখী পূর্ণিমায় এক মেলা ছিল। কেহ কেহ বলেন, পুলিশের চর হংসরাজ চারিদিকে ঘোষণা করে যে এবার নববর্ষের উৎসবে জালিনবালা-বাগে সভা হইবে। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ২৩।২৪ হাজার লোক তথায় সমবেত হইয়াছিল। এই বাগের চারিদিক প্রাচীরবেষ্টিত, প্রবেশের একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ পথ এবং চারপাঁচটি ক্ষুদ্র ফাঁক। অতিকষ্টে সেই সব ফাঁক দিয়া একজন লোক যাইতে পারে। সরকার পক্ষীয়েরা বলেন যে সভা নিষেধ করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল এবং লোকে জোর ও জিদ্ করিয়া সভায় আসিয়াছিল।

জালিনবালাবাগে সভা।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্বে একখানি এরোপ্লান বাগের উপরে ঘুরিতে থাকে ; তাহা দেখিয়া লোকে অত্যন্ত চঞ্চল ও ভীত হইয়া উঠে ; কিন্তু হংসরাজ তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া রাখে। ইতিমধ্যে জেনারেল ডায়ার ২৫ জন রাইফেলধারী শিখ, ২৫ জন গুর্খা এবং ৪০ জন খুকরীধারী সৈন্য, একটী ছোট কামান গাড়ী লইয়া বাগের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাগের ভিতর একটী টিলার উপর সৈন্যগণ উঠিল ; এবং যেথানে ভিড় সবচেয়ে বেশী, ডায়ার-সাহেব সেইস্থান লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িতে আদেশ করেন। ১৬৫০টি গুলি ছোঁড়া হইয়াছিল এবং কামানটি যদি ভিতরে লওয়া যাইত, তবে তাহাও ডায়ারসাহেব ব্যবহার করিতেন। ঐ দিনে ৩৭৯ জন লোক মারা পড়ে। এই হত্যাকাণ্ডের বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

বাগে হত্যাকাণ্ড

পঞ্জাবে ছয় সপ্তাহ সামরিক আইন বাহাল থাকিল। এই সময়ের মধ্যে দেশে যে প্রকার অত্যাচার অপমাননা হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়, সমগ্র দেশ—সমগ্র সভ্য-জগৎ জালিন-বাগের অনাচার ও সামরিক-আইনের যুগে শাসনের কথা পড়িয়া বিস্মিত হইয়া গেল,—এখনো বিংশ শতাব্দীতে এরূপ ব্যবহার হইতে পারে ইহাতেই সকলে অবাক হইল। স্পষ্ট

বুঝা গেল ভারত-সরকার ও মিলিটারী বিভাগ উন্মত্ত জনতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইবার জন্য বদ্ধপরিকর, এবং ইংরাজ সৈনিক ও কর্মচারী হত্যাপরাধের প্রতিহিংসা লইতেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অমৃতসহরে যেস্থানে মিস শেরউডকে গুণ্ডারা লাঞ্ছনা করিয়াছিল—সেইস্থানে মিলিটারী লোক রাখিয়া দেওয়া হইল এবং নিয়ম হইল, যে সেখান দিয়া যাইবে তাহাকেই বুকে হাঁটিয়া স্থানটি পার হইতে হইবে। এমন কি যাহাদের বাড়ী সেই পথের উপরে, তাহাদিগকে প্রত্যেকবার বাড়ীর বাহির হইবার সময়ে বুকে হাঁটিয়া চলিতে হইত। প্রত্যেক ভারতীয়কে সাহেবদের ইচ্ছানুসারে কায়দায় সেলাম করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। এই লইয়া এত অপমান, এত যন্ত্রণা মানুষকে সহ্য করিতে হইয়াছিল যে তাহা বলা যায় না। বেত মারিয়া শাস্তি দেওয়া পঞ্জাবে একটা দৈনন্দিন ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। বেত মারিবার জায়গা হইয়াছিল সদর রাস্তার কাছে। কোথায়ও গণিকা-দিগকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া উলঙ্গ পুরুষকে বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল। উকিলদিগকে স্পেশাল-কনেষ্টবল করিয়া রাস্তায় রাস্তায় সামান্য পেয়াদা আর্দালীর মত করিয়া খাটানো হইত। বিচারের জন্য 'স্পেশাল' আদালত খোলা হয়; কিন্তু তাহাতে আইনের দোহাই দিয়া বিচারের চেয়ে অবিচারই বেশী হইত। অমৃতসহরে তিনজন বিচারক বিচারে বসিতেন। ইঁহাদের মৃত্যুদণ্ড দিবার অধিকার ছিল ও তাঁহাদের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল চলিত না। দ্বিতীয় শ্রেণীর "সামারী কোর্ট"এ বিচারক থাকিতেন একজন, ইঁহার দুই বৎসর কারাবাস ও এক সহস্র টাকা জরিমানা করিবার ক্ষমতা ছিল। ইহার বিরুদ্ধেও আপীল ছিল না। প্রথম বিচারালয়ে ১৮৮ জনের বিচার হয়, তন্মধ্যে তিনজন মাত্র মুক্তি পায়।

সামরিক আইনের অত্যাচার

লাহোরে কোনো প্রকার দাঙ্গা না হওয়া সত্ত্বেও জন্‌সন্ সাহেব গুলি চালান। তিনি বলিয়াছিলেন যে লাহোরের লোক শান্তিপ্রিয় এবং

রাজভক্ত হইলেও পঞ্জাবের অন্যান্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য লাহোরে সামরিক-আইন জারি করিয়া অত্যাচার করা হয়। লাহোরে সন্ধ্যার পর কেহ বাহির হইতে পারিত না; সহরের ৮০০ টোঙ্গার স্থানে ২০০ খানি গাড়ী চালাইবার হুকুম হয়; ভারতবাসীদের মোটর-গাড়ী সরকার আটকাইয়া রাখেন। বেত্রাঘাত ছিল জনসনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় শাস্তি। স্কুল কলেজের ছাত্রদের প্রতি অকথিত জুলুম হইয়াছিল। গুজরনবালাতে জনতা অনেক সরকারী বাড়ীঘর নষ্ট করে ও রেলপথ উপড়াইয়া দেয়; রেলপথে সেখানে যাওয়া অসম্ভব বলিয়া, সৈন্যগণ এরোপ্লেন করিয়া যায় ও উপর হইতে উচ্ছৃঙ্খল জনতার উপর গোলা ছুড়িয়া মারে। কোনো কোনো সহরে সদর রাস্তার উপর ফাঁসিকাঠ ঝুলানো হইয়াছিল; ভারতময় ইহার তীব্র প্রতিবাদ হওয়ায় উহা স্থানান্তরিত হয়। কোনো কোনো স্থলে নারীদের উপর অকথিত অত্যাচার ও অবমাননা হইয়াছিল; এইরূপ অসংখ্য লোমহর্ষক, বর্বর ঘটনার উল্লেখ করা যায়; কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন। সে অপমানের কথা ও কলঙ্কের ইতিহাস যত সহজে ভুলা যায় ততই ভাল; কারণ এই সময়ে সমগ্র পঞ্জাবে বীরত্বের বা মহত্বের একটি কাহিনীও শাসক বা শাসিতের মধ্যে দেখা যায় নাই।

লাহোর ও অন্যান্য সহরে সামরিক আইন

দেশময় এই লইয়া ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল। ইংরাজ রাজত্বে এইরূপ অত্যাচার হইতে পারে তাহা কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। এদেশে কোনো কাগজে এসব সংবাদ পাওয়া যায় নাই; কারণ 'সামরিক-আইন'-শাসিত দেশ হইতে কোনো সংবাদ প্রচার হয় নাই। কিন্তু ধীরে ধীরে সবই প্রকাশিত হইয়া পড়িল ও দেশের মধ্যে ভীষণ ক্ষোভ ঘৃণা ও ইংরাজজাতির উপর বিদ্বেষ শতগুণ বাড়িল। এদেশে ও বিলাতে এই অনাচার লইয়া যখন খুবই আন্দোলন চলিতে লাগিল, তখন গভর্ণমেণ্ট পঞ্জাবের অশান্তির বিষয়ে

পঞ্জাব-অত্যাচারের প্রতিবাদ

তদন্ত করিবার জন্য এক কমিটি নিয়োগ করিলেন; এই কমিটির নাম Disorders Committee। গভর্ণমেণ্ট যখন সমস্ত জিনিষটিকে শান্তভাবে দেখিলেন, তখন উহার নাম দিলেন Disorders বা 'অশান্তি,' Revolt বা বিদ্রোহ বলিলেন না। শ্রীযুক্ত হাণ্টার সাহেব এই তদন্তের সভাপতি ছিলেন বলিয়া এই কমিটি হাণ্টার কমিটি নামে খ্যাত। এই কমিটিতে তিনজন দেশীয় লোক ছিলেন—তাঁহারা সাহেবদের সহিত মতে মিলিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহারা পৃথক্ প্রতিবেদন লিখিয়াছেন। হাণ্টার কমিটির অধিকাংশের প্রতিবেদনে ছোটলাট মাইকেল ও'ডায়ার, সেনাপতি ডায়ার, জনশন প্রভৃতির কর্ম সমর্থিত হইল না বটে, কিন্তু তাঁহারা এমন কিছু বলিলেন না যাহাতে ভারতীয়-দের অপমান ও আঘাত দূর হয়। সরকার মিস্ শেরউডকে ক্ষতিপূরণের জন্য ৫০ হাজার টাকা দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। যে কয়জন ইংরাজ নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগের ক্ষতিপূরণের জন্ত ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা তুলিয়া দিতে হইয়াছিল। জালিনবালাবাগে যে ৩৭৯ জন লোক সৈন্তদের গুলিতে প্রাণত্যাগ করিল, তাহাদের মধ্যে ৪০ জন মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দিগকে সরকার হইতে টাকা দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ৫০০ টাকার অধিক কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। আহত ইংরাজ-দিগকে উপযুক্ত অর্থ দেওয়া হইয়াছিল।

হাণ্টার তদন্ত কমিটি

ও'ডায়ার, ডায়ার প্রভৃতি এই ঘটনার অনতিকাল পরে অবসর লইয়া বিলাতে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া তাঁহারা ভারতে ইংরাজের সম্মান ও রাজত্বের রক্ষা-কর্তারূপে সমাদৃত হইতে লাগিলেন। উপঢৌকন, চাঁদা দিয়া লোকে বেশ বুঝাইয়া দিল যে ইঁহারা ইংরাজের রাজ্য রাখিয়াছেন। এই ঘটনাই শাসক ও শাসিত, ইংরাজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিরোধের শেষ ইন্ধন প্রদান করিল। সমগ্র দেশ ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়া

বিলাতে ও'ডায়ার, ডায়ারের সম্মান

উঠিল। ইংরাজ সরকার শান্তিস্থাপনের জন্য এত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার মূলে কুঠারাঘাত পড়িল—পঞ্জাবের অপমান ভারতের আন্দোলনের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। এই ঘটনাটি ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে নূতন পথে পরিচালিত করিল। পঞ্জাবের ব্যাপারে আপামর সাধারণ হইতে মনীষিগণ পর্য্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারের প্রতিবাদস্বরূপ তাঁহার 'স্যর' উপাধি ত্যাগ করিয়া বড়লাট বাহাদুরকে যে তেজপূর্ণ পত্র লেখেন, তাহা প্রত্যেক বাঙালীর পাঠ করা কর্ত্তব্য।

অশান্তি কমিল না

পঞ্জাবের ব্যাপারে দুইটি বিষয় সুস্পষ্ট হইল। গান্ধীজি যে আধ্যাত্মিক বলের উপর রাষ্ট্রনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছিলেন, তাহা জড়বাদী মূঢ় লোকের মধ্যে গিয়া কিরূপ বিকৃত বিপ্লবের আকার গ্রহণ করিতে পারে, তাহাই প্রথম শিক্ষা। দ্বিতীয় হইতেছে—ইংরাজজাতি এ দেশে রাজ্যশাসন করিতে আসিয়াছেন; সুতরাং যেখানে তাহার শাসন বা স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে, সেখানে সে অত্যন্ত কদাকার ও কঠোর হইতে লজ্জাবোধ করে না। পঞ্জাবের ব্যাপারে শাসিত ও শাসকের মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষ বাড়িল; ইংরাজদের মহিমান্বিত চরিত্রের উপর এদেশের সকলেরই শ্রদ্ধা ছিল; এই ঘটনায় তাহা চূর্ণ হইয়া গেল।

সরকারী তরফ হইতে পঞ্জাবের ব্যাপার তদন্ত করিবার জন্য যেমন হাণ্টার-কমিটি বসানো হইল, কংগ্রেসও তেমনি একটি কমিটি নিযুক্ত করিলেন। এই সভায় গান্ধীজি, শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস, আব্বাস তায়াবজী ও জয়াকার সদস্য হইলেন। এই দুই রিপোর্ট ও বিশেষভাবে কংগ্রেস-কমিটির রিপোর্ট হইতে দেশের লোকে অনেক লোমহর্ষক ঘটনাবলী জানিতে পারিল।

কংগ্রেস নিযুক্ত তদন্ত চেষ্টা

১৯১৯ সালে ডিসেম্বর মাসে অমৃতসহরে কংগ্রেস হইল; সেখানে অধিবেশন যাহাতে না হয় তাহার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু

অবশেষে জনমত প্রবল হইল। কংগ্রেসে পঞ্জাবের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইল। লর্ড চেমসফোর্ড এইরূপ ব্যাপার শিমলায় বসিয়া জানিলেন ও কোনো প্রতিবাদ করিলেন না, ইহাতে সকলে বিস্মিত হইল এবং তিনি যে ভারতবর্ষের ন্যায় সুবৃহৎ দেশের শাসনভার গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ও তাঁহাকে সেই কার্য্য হইতে অপসারিত করা বৃটীশরাজের উচিত এই মর্মে প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হইল।

১৯২০ সালে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নূতন সমস্যা আসিয়া জড় হইল। আমরা দেখিয়াছি যে ১৯১৮ সালের শেষাশেষি য়ুরোপীয় মহাসমর শেষ হয়; তৎপূর্বেই তুর্কী মিত্রশক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করে। তুর্কীর পরাজয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নূতন জটিলতা দেখা দিল; তুর্কীর সুলতান তুর্কীর রাজনৈতিক 'রাজা' মাত্র নহেন,—তিনি সমগ্র মুসলমান সমাজের ধর্মগুরু 'খলিফ'। তাহাদের ধর্মানুসারে কোনো দুর্বল হৃতরাজ্য রাজা খলিফ হইতে পারিবেন না—তাহাদের কাছে ধর্ম ও রাজনীতি এক। ভারতীয় মুসলমান সমাজ বৃটীশ-সাম্রাজ্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে ও তুর্কীকে পরাজিত করিতে সাহায্য করিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের খলিফার রাজ্য অপহৃত ও রাজসম্মান ক্ষুণ্ণ হইতে দিতে পারে না, তুর্কীর সাম্রাজ্য অখণ্ড ও সুলতানের সম্মান অটুট থাকিবে ইহাই তাহাদের বাসনা। কিন্তু এই সময়ে তুর্কীর সহিত য়ুরোপের যে সন্ধি প্রকাশিত হইল তাহাতে খলিফার বা সুলতানের কোনো প্রকার রাজকীয় সম্মান থাকিল না। সে সম্বন্ধে আমরা অপর পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি। মোটকথা, সমগ্র ভারতে এই সময়ে মুসলমান সমাজে খিলাফৎ-আন্দোলন নূতন প্রাণ সঞ্চারিত করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল। গান্ধীজি তুর্কী সম্বন্ধে মুসলমান-জাতির দাবীকে ন্যায্য ও ধর্মসঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইলেন এবং ধর্মের

নূতন সমস্যা খিলাফৎ

সহিত উহার যোগ আছে বলিয়া হিন্দুদেরও এই আন্দোলনকে নিজেদেরই আঘাত ও অপমান-সদৃশ মনে করিয়া পূর্ণ-হৃদয়ে উহাতে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইল। এই সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—

খিলাফৎ আন্দোলনে হিন্দুদিগের সহানুভূতি

(১) পঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবাদ।

(২) খিলাফৎ সম্বন্ধে ভারতীয় হিন্দুমুসলমানের সমবেত আন্দোলন।

(৩) শাসন-সংস্কারের অসারত্ব।

(৪) অসহযোগ-আন্দোলন।

এই বিশেষ অধিবেশনের কিছুকাল পূর্বে গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত 'হাণ্টার কমিটির' প্রতিবেদন ও কংগ্রেস নিযুক্ত কমিটির সুবিস্তৃত অনুসন্ধানফল সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। উভয় কমিটির তদন্তফল ও উক্ত বিষয়ে ভারতীয় সরকারের, পার্লামেণ্টের ও বৃটীশ জনসাধারণের ঔদাসীন্য-প্রকাশ দেশের মধ্যে সবিশেষ চঞ্চলতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিল। এই সময়ে দেশের মধ্যে নূতন শাসন-সংস্কার লইয়া যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছিল। জাতীয় দল ইহার উপর প্রারম্ভ হইতেই বিরূপ ছিলেন, সে কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এই বিরূপভাব এক্ষণে বর্জন-নীতির আকার গ্রহণ করিল। গান্ধীজি কলিকাতার বিশেষ কংগ্রেসে দেশের সমক্ষে ভবিষ্যৎ রাজনীতিক পথ নির্দেশ করিয়া 'অসহযোগ-নীতি' (Non-Co-operation) প্রচার করিলেন। গান্ধীজির যে প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিলে, তৎকালীন জাতীয় মনোভাবের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যাইবে।

১৯২০ সেপ্টেম্বর বিশেষ কংগ্রেস ও বর্জন নীতি

"খিলাফৎ ব্যাপারে ভারত ও বিলাতের সরকার মুসলমান প্রজার প্রতি কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন; প্রধান মন্ত্রীমহাশয়ও তাঁহার

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন ; মুসলমান ভ্রাতাদের এই ধর্ম-সম্পর্কিত দুর্দিনে ন্যায়সঙ্গত সাহায্য করা প্রত্যেক হিন্দুর কর্তব্য। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসের অনাচারের সময় পঞ্জাবের নির্দোষ প্রজাগণকে উক্ত সরকারদ্বয় রক্ষা করিতে পারেন নাই বা রক্ষা করেন নাই; পরন্তু বর্বরোচিত অনাচার-অনুষ্ঠানকারীদিগের দণ্ডবিধানের কোন ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহারা মূলদোষী স্যর মাইকেল ও'ডায়ারকে সকল অপরাধ হইতে মুক্তি দিয়া তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। পার্লামেণ্টের কমন্স ও লর্ড সভায় পঞ্জাব-সম্পর্কে যে বাদানুবাদ হয়, তাহাতেও দেখা গিয়াছে যে বিলাতের অধিকাংশ লোক এদেশের লোকের ব্যথায় বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা ব্যথিত নহেন, বরং তাঁহারা পঞ্জাবে অনুষ্ঠিত ঘোর অত্যাচার অনাচারের সমর্থন করেন। বড়লাট সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, তিনি পঞ্জাব বা খিলাফৎ ব্যাপারে অনুমাত্র অনুতপ্ত নহেন।

কলিকাতার অসহযোগ প্রস্তাব

"এই সকল কারণে কংগ্রেস বিবেচনা করেন যে, উপরি উক্ত দুইটি অসন্তোষের কারণ দূর না হইলে কিছুতেই ভারতবাসী শান্তি পাইবে না। অসন্তোষ দূর করিবার জন্ম খিলাফৎ-কমিটি যে ক্রমবর্দ্ধনশীল সহযোগিতা-বর্জন-নীতি প্রবর্তন করিয়াছেন, উহাই কংগ্রেসকে গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথা পঞ্জাব ও খিলাফৎ সমস্যার সমাধান হইবে না।"

কেমন করিয়া সহযোগ বর্জন করিয়া দেশকে সবল করা যাইবে সে-বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনা কংগ্রেসে হয়। স্থির হইল বর্জন-নীতির সোপানগুলি যথাক্রমে এইরূপ হইবে :—(১) সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকুরী ত্যাগ করা। (২) সরকারী লেভি, দরবার প্রভৃতি ব্যাপারে যোগদান না করা। (৩) সরকারী স্কুল কলেজ বা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহ ত্যাগ করা ও নূতন জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন। (৪) উকিল প্রভৃতিদের কর্মত্যাগ ও

অসহযোগ নীতি

সালিসী কাছারী প্রতিষ্ঠা। (৫) সামরিক জাতিগণের, কেরাণীগণের ও মজুরগণের মেসোপটেমিয়ায় চাকুরী গ্রহণে অস্বীকার। (৬) নূতন ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন ত্যাগ করা। কংগ্রেসের অনুরোধ সত্ত্বেও যাঁহারা নির্বাচন-প্রার্থী (Candidate) হইবেন, ভোটারগণ তাঁহাদিগকে ভোট দিবেন না। ইতিপূর্বে গান্ধীজি এক ইস্তাহারে প্রকাশ করেন যে ১লা আগষ্ট তারিখের মধ্যে সরকার যদি খিলাফৎ সম্বন্ধে সুবিচার না করেন ত' তিনি দেশকে অসহযোগের জন্য আহ্বান করিবেন। ভারতীয় সরকার ও বৃটীশ সরকার খিলাফৎ সম্বন্ধে কোনো সুবিচার করিয়া ভারতীয় মুসলমানদের তুষ্টিসাধন করিলেন না; তখনই গান্ধীজি সেপ্টেম্বর মাসের বিশেষ কংগ্রেসে পূর্বোক্ত বর্জন বা অসহযোগী-নীতি প্রচার করিলেন।

গান্ধীজির অসহযোগ হুমকি

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দেশময় জন সাধারণ অসহযোগ ও আগত নাগপুর-কংগ্রেসে কোন্ কোন্ বিষয় আলোচিত হইবে তাহা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিল। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে নূতন প্রাণের সাড়া পড়িল। নাগপুরের কংগ্রেসে কলিকাতার বিশেষ কংগ্রেসের সকল প্রস্তাবগুলিই উপস্থিত করা হইয়াছিল। স্থির হইল বালকেরা অভিভাবকদের মত লইয়া সরকারী স্কুল কলেজ ত্যাগ করিয়া জাতীয় শিক্ষালয়ে যোগদান করিবে; সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত বা অনুমোদিত (Recognised) বিদ্যালয়গুলিকে 'জাতীয়' করিয়া লওয়া হউক; উকিল ও অন্যান্য ব্যবহারজীবিরা সরকারী আদালত ত্যাগ করুন; স্বেচ্ছাসেবক-সঙ্ঘ (Congress Volunteer Corps) স্থাপন করা হইবে; বণিক ও ব্যবসায়ীগণকে বৈদেশিক পণ্য আমদানী বন্ধ করিতে অনুরোধ করা ও দেশমধ্যে চরকা ও তাঁতের পুনর্প্রচলন; অসহযোগ প্রচারের জন্য দেশের সর্বত্র সভা স্থাপন; তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডারের জন্য অর্থ-সংগ্রহ।

১৯২০ নাগপুর কংগ্রেস ও বর্জন নীতি

সমস্ত প্রস্তাবের মূলে 'অহিংসা' (Non-violence) পালন করিতে হইবে।

'কংগ্রেস' জাতীয় জীবনের ইতিহাসে ক্রমেই প্রবেশ করিতেছিল। ১৯১৭ সাল হইতে উহা জাতীয় দলের হস্তে আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা আমারা দেখিয়াছি। জাতীয় দলের নেতারা কংগ্রেসকে জাতীয় কর্মের কেন্দ্র করিবার জন্য ইহার Constitution ও Creed এর কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করিবার কথা ভাবিতেছিলেন। এই কংগ্রেসে নিম্নলিখিত রূপ পরিবর্তন হইল :—

"সর্বপ্রকার বৈধ ও নিরূপদ্রব পন্থা অবলম্বন করিয়া স্বরাজ্য লাভ করা এবং সে পক্ষে ভারতবাসী মাত্রকেই সাধনায় দীক্ষিত করাই ভারত রাষ্ট্রসভার ঈপ্সিত।" রাষ্ট্রসভার কার্য্য সৌকার্য্যার্থে ভারতবর্ষকে ভাষানুযায়ী ২১টি প্রদেশে ভাগ করা হইল এবং স্থির হইল পঞ্চাশ হাজার অধিবাসীর ভিতর হইতে একজন প্রতিনিধি মহাসভায় আসিবেন। কংগ্রেসকে নবীন-দল কাজের সভা করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন ; ইতিপূর্বে প্রতিনিধি সম্বন্ধে কোনো নিয়ম ছিল না। অনর্থক দশ বার হাজার লোক আসিয়া সভামণ্ডপে ভিড় করিত ; কার্য্য অপেক্ষা গোলই হইত বেশী। নাগপুর কংগ্রেসে এই constitutional পরিবর্তন ব্যতীত আরও কতকগুলি বিশেষ ঘটনা ঘটিল।

কংগ্রেসের মত-বিশ্বাস পরিবর্তন

সেপ্টম্বরের কংগ্রেসে অসহযোগ-প্রস্তাবে সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণ একমত হইতে পারেন নাই। বাংলাদেশের নেতাদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি জাতীয়দলের নেতারা তখনও অসহযোগ-নীতির সহিত যোগদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু নাগপুরের কংগ্রেসে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসই প্রতিনিধিবর্গের সম্মুখে অসহযোগ-প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তিনি ইতিপূর্বে প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই ; এখন তাঁহাকে ইহাতে নামিতে

দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইল। তিনি বলিলেন যে "আমি আজ যাহা বলিব কাল আমার জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিবেন। * * * যাহা কিছু পবিত্র যাহা কিছু জাতীয় মহিমাময়, তাহার নামে আমি আপনাদিগকে অহিংসা অসহযোগ-তত্ব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। * * * আপনারা গভর্ণমেণ্টের নিকট ঘোষণা করিবেন যে ভারতবাসী ঈশ্বরদত্ত মানুষের সমগ্র অধিকার বুঝিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।" চিত্তরঞ্জনের এই পরিবর্তনে সভার মন নূতন পথে গেল। এত বড় ত্যাগ, এত অর্থ উপার্জন করিতে করিতে সর্বস্বত্যাগের দৃষ্টান্তে সকলে মুগ্ধ হইল। বাঙালীর বিশিষ্টতা প্রকাশিত হইল। নাগপুরে নিখিল-ছাত্রদের প্রতি-নিধি সভার অধিবেশন হইয়াছিল; এই সভাতে ছাত্রগণ ঠিক করিলেন যে তাঁহারা সরকারী বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া এক বৎসরের জন্য কংগ্রেসের কাজ করিবেন।

চিত্তরঞ্জন ও অসহযোগ

১৯২১ সালের প্রারম্ভ হইতে ভারতীয় রাজনীতিক আন্দোলন নূতন আকার গ্রহণ করিল। গান্ধীজি কংগ্রেসের পরিচালক; মহম্মদ আলি ও সয়কৎ আলির নেতৃত্বাধীনে 'খিলাফৎ' দল কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন; বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন নবীনদলের নেতা হইয়া কার্য্য সুরু করিলেন; শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসু বিলাত হইতে I. C. S. পাশ করিয়া উক্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া স্বরাজ সাধনে মন দিলেন; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সরকারী 'মুদ্রা' (mint)-বিভাগের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য ত্যাগ করিয়া অসহযোগ কর্মে যোগ দিলেন; শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী প্রোফেসারীর কাজ ছাড়িয়া দিলেন; শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, শ্রীকিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি অনেক প্রতিভাশালী যুবক বহু সম্মানের কাজ ত্যাগ করিয়া দেশের কর্মে আত্মনিয়োগ করিলেন। অন্যান্য প্রদেশে শ্রীমতিলাল নেহেরু, শ্রীজহরলাল

দেশ সেবায় বিশিষ্ট কর্মীগণ

নেহেরু, শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিলেন। প্রত্যেক প্রদেশের কংগ্রেস-সমিতি, জেলা-সমিতিগুলি নবীন জীবন লাভ করিয়া অসহযোগ-তত্ত্ব প্রচারে মন দিল। জাতীয় দল তিলক-স্বরাজ্য-ভাণ্ডারের মালিক হইলেন; এ ছাড়া নানাপ্রকারে তাঁহাদের হস্তে অর্থ আসিতে লাগিল। নাগপুরের প্রস্তাবানুসারে ভারতের সর্বত্র কংগ্রেস ভলান্টিয়ার বা সেবকসঙ্ঘ গঠিত হইতে লাগিল। ইতিপূর্বে খিলাফৎ-কমিটি খিলাফৎ সংক্রান্ত রাজনৈতিক কার্য্য ও আন্দোলনাদি চালাইবার জন্য 'খিলাফৎ ভলান্টিয়ার' বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন; তাঁহারা ভলান্টিয়ার-গণকে তুর্কীধরণে পোষাক পরিচ্ছদ পরাইয়া, তুর্কীফেজ দিয়া, ব্যাজ লাগাইয়া, কুচ-কাওয়াজ করাইয়া কাজের উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কংগ্রেস ভলান্টিয়ারগণ ও খিলাফৎ ভলান্টিয়ারগণ "জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক" বা National Volunteer নামে অভিহিত হইল। কংগ্রেসের নেতাগণের চেষ্টায় জিলায় জিলায় কংগ্রেস-কমিটির তত্ত্বাবধানে "স্বেচ্ছাসেবক"গণ কংগ্রেস-নির্দিষ্ট কর্মে লিপ্ত হইলেন। এই সব কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই স্কুল ও কলেজের ছাত্র। এ ছাড়া অনেক দায়ীত্বজ্ঞানহীন কাণ্ডাকাণ্ডবোধ-বিহীন গোঁড়া অসহিষ্ণু ব্যক্তি গান্ধীজির নামে আকৃষ্ট হইয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল; তাহাদের অসহিষ্ণুতার ফলে অসহযোগ আন্দোলন কিরূপে নষ্ট হইল সেকথা আমরা যথাস্থানে বলিব।

সরকারের শাসন সংস্কারের চেষ্টা

দেশের জাতীয় উদ্বোধন ও জাতীয় আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করিয়া ইংরাজগণ ভারতবাসীকে নূতন শাসন-সংস্কার দিয়াছিলেন। ভারতীয় অধ্যক্ষসভায় (Executive Council) ও প্রাদেশিক অধ্যক্ষসভায় দেশীয় মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিল; এমন কি বিহার-উড়িষ্যার প্রথম গভর্ণরের পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহকে (Lord S. P. Sinha) দান করিয়া তাঁহারা ভারতবাসীকে সম্মানিত করিবার চেষ্টা করিলেন। সরকার নানাদিকে

নানাভাবে নূতন শাসন-বিভাগের উন্নতি দেখাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। দিল্লীর নূতন ব্যবস্থাপক-সভা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিলাত হইতে রাজখুল্লতাত ডিউক অব্ কনট প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৯২১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী ভারতের নূতন "পার্লামেণ্ট" খোলা হইল। কিন্তু নূতন ব্যবস্থা জাতীয় দলকে শান্ত করিতে পারিল না। ভারতের সর্বত্র ভোটারগণ যাহাতে ভোট না দেয় ও পদপ্রার্থীগণ যাহাতে নির্বাচিত হইবার জন্য উপস্থিত না হন, তাহার জন্য কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ারগণ বিধেয় অবিধেয় বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভায় অধিকাংশ নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে অযোগ্য ব্যক্তিরাই নির্বাচিত হইয়াছিল; এমন কি খেলাচ্ছলে সহরের মধ্যে অতি নগণ্য মুর্খ ব্যক্তিকে বাছিয়া বাছিয়া সদস্য করিয়া পাঠাইয়াছিল। কোথায়ও বা গর্দ্দভ বা ষণ্ডের গলদেশে "আমাকে ভোট দাও" ইত্যাদি লিখিয়া লোকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। মোটকথা প্রথমবারের নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হইল। দেশের সুশাসনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে না পাওয়া দেশের পক্ষে ও প্রতিষ্ঠিত শাসন-বিভাগের পক্ষে অকল্যাণকর হইল। সেকথা তখনো ভারতের রাজনীতিকেরা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহারা শাসন-সরকারকে ধ্বংস করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় নিজেদের ক্ষুদ্র শক্তিকে নষ্ট করিতে লাগিলেন।

নূতন ব্যবস্থাপক সভার বিরুদ্ধে অসহযোগ

দেশময় অসহযোগ আন্দোলন চলিতে লাগিল। কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একদল কর্মীর প্রয়োজন। গান্ধীজি ও চিত্তরঞ্জন যুবকদিগকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কার্য্য করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্ররোচনায় কলিকাতার বহু স্কুল কলেজ হইতে যুবকেরা ধর্মঘট করিয়া বাহির হইয়া আসিল। নেতারা তাহাদিগকে এক বৎসরের জন্য কংগ্রেসের তরফ হইতে 'গ্রাম-সেবা' (Village work) করিবার জন্য বলিলেন; গান্ধীজি বলিলেন

যে তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যে 'স্বরাজ' পাওয়া যাইবে। এইরূপ আশ্বাস পাইয়া বহুসহস্র বালক ও যুবা দেশের কাজে যোগদান করিল। ১৯০৫ সালের স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের উত্তেজনায় যেমন 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' স্থাপিত হইয়াছিল, এই অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনায় তেমনি (National School) জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। যথার্থ জাতীয় সংগঠনের দিক দিয়া ইহার প্রয়োজন নেতারা তেমন বুঝেন নাই। রাজনৈতিক আন্দোলনের সুবিধা হইবার আশায় তাঁহারা এইরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিল। কলিকাতায় কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয়, গৌড়ীয় বিদ্যাপীট নামে কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইল; মফঃস্বলেও বহুস্থানে কংগ্রেস-সেবকদের চেষ্টায় পাঠশালা খোলা হইল। গুজরাটে আমাদাবাদে বিদ্যাপীট স্থাপিত হইল। নানাস্থানে ছাত্রেরা স্কুল ও কলেজগুলিকে 'ন্যাশনাল' করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। গান্ধীজি সর্বত্র এ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু দেশের রক্ষণশীল ও চিন্তাশীল রাজনীতিকগণ গান্ধীজির এই কর্মপদ্ধতি সমর্থন করিলেন না, সুতরাং দেশের মধ্যে উহা ক্ষণিক উত্তেজনামাত্র সৃষ্টি করিল—স্থায়ী কিছু রাখিয়া গেল না। কংগ্রেসের কর্মীগণ গান্ধীজির অভিপ্রায়ানুসারে চরকা-কাটা, তাঁত-বোনা ও খদ্দর-ব্যবহারের উপর বিশেষভাবে ঝোঁক দিলেন। গান্ধীজি এই সময় হইতে চরকা-কাটার উপর বিশেষ জোর দিতে থাকেন। তাঁহার মতে চরকা কাটিলে স্বরাজ মিলিবে। তাহার অর্থ এই যে ভারতের সবচেয়ে বড় আমদানী কাপড়চোপড়। ম্যানচেষ্টার হইতে প্রায় ষাট কোটি টাকার বস্ত্রাদি আসে। কাপড় না আসিলে সুতা আসে; সেই সব সুতা এখানকার কাপড়-কলে কাজে লাগে। সুতাও যেখানে না আসে সেখানে মিলের

জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও গ্রাম-সেবা

চরকা ও তাঁত

কলকব্জা আসে। মোটকথা বিলাতকে আমরা হয় কাপড় কিনিয়া, নয় সুতা কিনিয়া, নয় কলকব্জা কিনিয়া টাকা দিতেছি। সুতরাং স্বরাজ পাইবার পূর্বে এই টাকা বিদেশে পাঠানো বন্ধ করিতে হইবে। তিনি বয়কট ঘোষণা না করিয়া দেশবাসীকে চরকা কাটিয়া খদ্দর বুনিবার জন্য উপদেশ দিলেন। টাকা দিয়াই যদি এ সমস্ত চুকিত তাহা নহে। মিল-সমূহ মানুষকে যেরূপ ক্রমেক্রমে নারকীপথে লইয়া যাইতেছে, তাহার প্রতিষেধও কুটীর-শিল্প। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে, শ্রমিক ও মূলধনীর মধ্যে ব্যবধান ও বিচ্ছেদ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। ইহার একমাত্র উপায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী হইয়া নিজ নিজ বস্ত্র বয়ন করিয়া বিদেশী মূলধনওয়ালা বা দেশী মিলওয়ালার প্রভুত্ব নষ্ট করিয়া সাধারণ লোককে মানুষ করিয়া তোলা।

কংগ্রেস ভলাণ্টিয়ারদের ন্যায় খিলাফৎ-ভলাণ্টিয়ারগণও কাজ করিতে-ছিলেন; কিন্তু খিলাফৎ কর্মীরা মুসলমানসমাজ ও খিলাফৎ-সংক্রান্ত কার্য্যেই এত অধিক ব্যস্ত থাকিতেন যে কংগ্রেসনির্দিষ্ট কার্য্যাবলীতে মনোসংযোগ করিতে পারিতেন না। মুসলমানদের কর্মপ্রচেষ্টা ও সহানুভূতি স্পষ্টই বহির্মুখীন ও সাম্প্রদায়িক আকার ধারণ করিতেছিল। য়ুরোপের আন্তর্জাতিক সন্ধিতে তুর্কী সম্বন্ধে সদ্‌ব্যবস্থা হইতেছে না দেখিয়া ভারতীয় মুসলমানেরা ক্রমশই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। ভারতীয় মুসলমানেরা ভারতীয় রাজনীতির প্রতি তত মনোযোগ না দিয়া মুসলমানজাতির আন্তর্জাতিক ব্যাপারে অধিক মনোনিবেশ করিলেন। মহম্মদ আলি বলিলেন যে তিনি প্রথমতঃ মুসলমান তৎপরে ভারতবাসী। মাদ্রাসের খিলাফৎ সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলিলেন যে ভারতবর্ষ স্বাধীন করিবার জন্য আফগানিস্থানের আমীর যদি এদেশে আসেন, তবে প্রত্যেক মুসলমান তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবে। এই উক্তিতে সাধারণ হিন্দু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইল ও সরকার-

খিলাফৎ কর্মীগণ

বিরক্ত হইলেন। মুসলমান-সমাজের আন্দোলনের কথা আমরা বিশেষভাবে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

১৯২১
ধর্ষণ-নীতি

১৯২১ সালের মাঝামাঝি সময় হইতে সরকার অসহযোগ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে ধর্ষণনীতি প্রয়োগ করিতে সুরু করিলেন। সাধারণ ফৌজদারী আইনানুসারে যেসব বক্তৃতা বা লেখার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা যায়, সেইগুলির বিরুদ্ধে সরকার প্রথমে ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। দেশের মধ্যে 'অসহযোগী'রা কোন প্রকার অবিধেয় কার্য্য করিলে, সরকার তৎক্ষণাৎ তাহার দণ্ডব্যবস্থা করিলেন। সালিসী-কাছারী স্থাপিত হওয়াতে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের অনেকস্থলে গ্রামের মোকদ্দমা গ্রামেই মীমাংসিত হইতেছিল। প্রাদেশিক শাসন-সরকারসমূহ এইসব সালিসী-কাছারীতে কোথায় কোনো অবিচার বা জুলুম হইতেছে কি না সেবিষয়ে কড়া রকম তদন্ত করিতে লাগিলেন ও এইসব মধ্যস্থতা উঠাইয়া দিবার জন্য ও অসহযোগীদের কর্ম ব্যর্থ করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে 'আমন সভা' স্থাপন করাইলেন। অসহযোগীরা রাজনৈতিক কর্ম ব্যতীত দেশের লোকের আর্থিক উন্নতির জন্য চরকা ও খদ্দর-প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন ও নৈতিক জীবন উন্নত করিবার জন্য মাদকসেবন নিবারণের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাদের এই কর্মও ব্যর্থ হইল—সরকার সকল চেষ্টাকেই দমন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। অসহযোগীদের চেষ্টায় অনেক প্রদেশে আবগারী বিভাগের আয় পর্য্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল। এই আন্দোলন নষ্ট করিবার জন্য সরকারই কেবল দায়ী তাহা নহে। সহর হইতে আগত অসহযোগী যুবককর্মীরা গ্রামে বসিয়া ধীরে ধীরে গ্রামসেবা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা এক বৎসরের মধ্যে অসম্ভবকে সম্ভব করিবার দুরাশা লইয়া আসিয়াছিলেন। অপরদিকে অসহযোগ আন্দোলন

আন্দোলনকারীদের
দুর্বলতা

নিরুপদ্রব বা অহিংসক হওয়া সত্ত্বেও—গান্ধীজির নামে ও দেশের নামে চারিদিকে 'নৈতিক জুলুমে' পরিণত হইতে লাগিল। গান্ধীজি দেশকে শান্ত থাকিয়া নিরুপদ্রব-অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিতে উপদেশ দিতেছিলেন। ভারতের অশিক্ষিত, রাজনীতি-অনভিজ্ঞ, অল্পে বিশ্বাসবান্ ও অল্পবিশ্বাসী সাধারণ লোকের নিকট পঞ্জাবের অত্যাচার-কাহিনী বারংবার বলিয়া তাহাদিগের প্রতিহিংসাবৃত্তি সহজে জাগ্রত করা হইতেছিল; আবার মুসলমান-সমাজকে 'ধর্ম নষ্ট হইতেছে' বলিয়া উন্মত্ত করিয়া, তাহাদের ধর্মান্ধতাকে বিশেষভাবে প্রধুমিত করিয়া তাহাদিগকে অহিংসক ও নিরুপদ্রবকারী থাকিতে বলা হইতেছিল। এইরূপ উপদেশ দান করা যত সহজ, সাধনহীন প্রাকৃতজনের পক্ষে তাহা জীবনে প্রতিফলিত করা তত সহজ নহে। অসহযোগ আন্দোলন আর নিরুপদ্রব থাকিল না। গিরিধি, বোম্বাই, মালেগাঁও, মাদ্রাস, মালাবার, করাচী, মীরবার, আলিগড়, ও সর্বশেষে চৌরাচরে অসহযোগীরা গান্ধীজির নামকে কলঙ্কিত করিয়া, তাঁহার সকল উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া দাঙ্গা করিল। সে সম্বন্ধে যথাস্থানে আমরা আলোচনা করিব।

অসহযোগ নিরুপদ্রব থাকিল না

ভারতের সর্বত্র এইসময়ে খাদ্যদ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদির দুর্মূল্যতার জন্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সবিশেষ কষ্ট চলিতেছিল। আসামে চা-বাগিচায় এই সময়ে কুলীরা প্রচুর কার্য্য পাইতেছিল না; সেইজন্য তাহাদের খুবই অর্থকষ্ট হইতেছিল। কেমন করিয়া বলা যায় না তাহাদের মাথার মধ্যে প্রবেশ করিল যে 'দেশে' 'গান্ধী রাজ' হইয়াছে—তাহাদের আর দুঃখ ভাবনা নাই, ইত্যাদি। দলে দলে কুলী হঠাৎ চা বাগিচা ত্যাগ করিয়া চাঁদপুরে উপস্থিত হইতে লাগিল। চাঁদপুরে পুলিশ কমিশনর ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশে কুলীদিগকে ষ্টীমারে উঠিতে বাধা দান করা

আসামে কুলীদের কর্ম-ত্যাগ

হয়; তাহাদের উপর উৎপীড়নও হইয়াছিল। এই ঘটনার সুযোগ লইয়া পূর্ববঙ্গের অসহযোগী-নেতারা আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ের কর্মচারীদের মধ্যে ধর্মঘট বাঁধাইয়া তুলিলেন। কর্মচারীদের নিজেদের কোনো অভাব অভিযোগ ছিল না; কেবলমাত্র রাজনৈতিক নেতাদের প্ররোচনায় পড়িয়া তাহারা ধর্মঘট করিল। রেলওয়ে কর্মচারীদিগের মধ্যে অধিকাংশই অল্প-শিক্ষিত, অল্প-বেতনভোগী; তাঁহারা রাজনৈতিক কূটতত্ত্ব বুঝে না। তাহাদিগকে নেতারা বুঝাইলেন যে চট্টগ্রামে 'স্বরাজ' হইয়াছে—তাহারা যোগদান করিলেই রেল-কোম্পানী সন্ধি করিতে বাধ্য হইবে। শ্রমসমস্যা অনভিজ্ঞ, অসহযোগী-নেতাদের কল্পনামত কোম্পানীও সন্ধি করিতে অগ্রসর হইল না, গভর্ণমেণ্টেরও ডাক আসা যাওয়া বন্ধ হইল না। অপরিণামদর্শী নেতাদের প্ররোচনায় কর্মচারীদের দুর্দশার সীমা থাকিল না। অধি-কাংশের কাজ গেল; তাহাদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, বোনাস্ প্রভৃতি সমস্তই বাজেয়াপ্ত হইল। যাহারা ফিরিয়া গেল, তাহারা অসহযোগের নেতাদের উপর সকল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারাইয়া, কোম্পানীর সাহেবদের সকলপ্রকার অপমান সহ্য করিয়া চাকুরীতে নূতন করিয়া প্রবেশ করিল। সেই সময়ে কর্মচারীরা যেসব পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে নেতারা রাজনীতিক অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য এই-সব গৃহী, দরিদ্র ব্যক্তি-দিগকে নিগৃহীত করিয়াছিলেন। নেতাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত যামিনী-মোহন সেন, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরদয়াল নাগ, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি অনেকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের ত্যাগ তাঁহাদিগকে সংসারক্ষেত্রে কোনোদিন অনাহারের শেষ-সীমনায় পৌছাইয়া দেয় নাই। মোটকথা চাঁদপুরের ধর্মঘটের মত এত বড় ব্যর্থ চেষ্টা অসহযোগীরা ইতিপূর্বে কখনো করেন নাই।

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট

১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে যখন পূর্ববঙ্গে রেলওয়ে ধর্মঘট চলিতেছে,

সেই সময়ে ভারতের দক্ষিণে মালাবারে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের এক বিকৃত ও বীভৎস রূপ প্রকাশ পাইল। সেখানকার মোপ্‌লা নামক এক শ্রেণীর মুসলমানেরা বিদ্রোহী হইল; তাহারা 'খিলাফৎ-রাজ' স্থাপন করিবার জন্য হিন্দুদের উপর যেসব অত্যাচার করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তাহাদের বিশ্বাস যে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট "সয়তানী"তে পূর্ণ এবং 'খিলাফৎ-রাজ' স্থাপন ব্যতীত মুসলমানের অন্য কোনো গতি নাই। মোপ্‌লাদের বিদ্রোহ দমন করিতে ভারত-সরকাকে কিরূপ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল তাহা অন্যত্র বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

মালাবারে মোপ্‌লা বিদ্রোহ

ইতিপূর্বে জুলাই মাসে আলী-ভ্রাতাদ্বয় করাচীর খিলাফৎ কনফারেন্সে যে বক্তৃতা দেন, তাহা সরকার রাজদ্রোহাত্মক বলিয়া বিবেচনা করেন। অক্টোবরমাসে করাচীর বিচারে মহম্মদ ও সয়কৎ আলির দুই বৎসর কারাবাসের আদেশ হয়। আলী-ভ্রাতাদের কারাবাসে গান্ধীজির দক্ষিণ হস্ত ভাঙিয়া গেল—নিরুপদ্রব-অসহযোগ আন্দোলন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। 'খিলাফৎ' এতদিন ইঁহাদের নেতৃত্বাধীন থাকিয়া গান্ধীজির প্রভাবের মধ্যে ছিল; তাঁহার শান্ত সংযত ভাব 'খিলাফতে'র অত্যুগ্রতা ও অধীরতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল। ইহার পর হইতে 'খিলাফৎ' আরও পৃথক্ হইয়া গেল। জাতীয় আন্দোলনে বেসুর বাজিতে লাগিল।

আলিভ্রাতাদের কারাগার

এই সময়ে শোনা গেল যুবরাজ (Prince Wales) ভারতভ্রমণে আসিতেছেন। ভারতের চারিদিকে সরকারী পক্ষ হইতে যুবরাজের রাজোচিত অভ্যর্থনা করিবার জন্য আয়োজন চলিতে লাগিল। গান্ধীজি প্রচার করিলেন যে তিনি যুবরাজের প্রতি কোনো প্রকার বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না; কিন্তু কোনো অসহযোগীর রাজ-অভ্যর্থনায় যোগদান করা

উচিত হইবে না। দেশময় অসহযোগীকর্মীরা যুবরাজ-অভ্যর্থনার বিরুদ্ধে সাধারণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন এবং তিনি যেখানে যেদিন যাইবেন সেখানে যাহাতে 'হরতাল' হয় সে বিষয়ে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ১৭ই নভেম্বর বোম্বাইতে যুবরাজ নামিলেন। সেইদিন সহরে ভীষণ দাঙ্গা হইল। গুণ্ডাশ্রেণীর লোক অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিয়া রাজভক্ত প্রজাদের মধ্যে যাহারা অভ্যর্থনায় বা রাজপুত্র দর্শন ইচ্ছায় বাহির হইয়াছিল, তাহাদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করে; এই দাঙ্গার ফলে ৫৩ জন লোক হত ও ৪০০ জন আহত হইল। গান্ধীজি সে-দিন বোম্বাইতে উপস্থিত; তাঁহার উপস্থিতি, তাঁহার ব্যক্তিত্ব কোনো কাজে আসিল না,—তিনি বুঝিলেন তাঁহার উপদেশ, তাঁহার সাধনা ব্যর্থ হইয়াছে!

যুবরাজের আগমণ ও অসহযোগ

ইতিপূর্বে নিখিল-ভারত-রাষ্ট্র-সভা স্থির করিয়াছিলেন যে প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটি ইচ্ছা করিলে সার্বজনিক শাসন অমান্য (Civil Disobedience) আরম্ভ করিতে পারেন। গুজরাটের বরদোলী নামক তালুকে গান্ধীজি স্বয়ং সত্যগ্রহ চালনা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি সরকারী কর্মচারীদের কর্মত্যাগ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন এবং যে অপরাধের জন্য আলীভ্রাতাদের কারাবাস হইয়াছিল সেই প্রস্তাব সর্বত্র গৃহীত হইবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন যে ২৩শে নভেম্বর বরদোলীতে তিনি স্বয়ং সত্যগ্রহ অর্থাৎ সরকারী-কর দান বন্ধ করিবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ইতি মধ্যে ১৭ই বোম্বাইএর পূর্বোক্ত নিদারুণ ঘটনা ঘটিলে, তিনি সত্যগ্রহ মুলতুবী করিলেন।

শাসন অমান্য আন্দোলনের চেষ্টা

যুবরাজের প্রতি অসম্মান উদ্রেকের চেষ্টা, চারিদিকে অশান্তি, অসহযোগীদের নিরুপদ্রব 'নৈতিক জুলুম', সামাজিক উৎপীড়ন আইন অমান্য

করিবার শাসানী, প্রতিষ্ঠিত শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার প্রভৃতি বন্ধ করিবার জন্য ভারত-সরকারকে অবশেষে ধর্ষণনীতি অবলম্বন করিতে হইল। ভারত-সরকারের নির্দেশমত প্রাদেশিক শাসন-বিভাগসমূহ ধর্ষণ-নীতি আরম্ভ করিলেন। নানা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া খিলাফৎ কংগ্রেস ও অসহযোগ-কর্মীদের বে-আইনী কার্য্য বন্ধ করিতে লাগিলেন। প্রথমে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক-সঙ্ঘ (Volunteer) বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল। ভারতের সর্বত্র ধরা-পাকড় সুরু হইল ; যাহারা কংগ্রেসের ব্যাজ বা চিহ্ন ধারণ করিয়া সরকারী হুকুম অমান্য করিয়া রাজপথে বাহির হইল —তাহাদিগকেই পুলিশ ধরিল। কলিকাতায় দলে দলে ছাত্র ও যুবক স্বেচ্ছায় জেলে যাইতে লাগিল। ভারতের সর্বত্র জেলা-কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও কর্মীগণকে প্রথমে, ও পরে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদকগণকে একের পর এককে সরকার জেলে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

কংগ্রেস-সেবক-সঙ্ঘ বে-আইনী প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ও তাঁহার সহ-কর্মীরা ১৯২১ সালের শেষ হইবার পূর্বে কারাগারে প্রেরিত হইলেন। বাংলা, বিহার-উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাস—প্রত্যেক প্রদেশের কংগ্রেস-কর্মীরা জেলে গমন করিলেন। সমগ্রদেশ কর্মীশূন্য হইল। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও কয়েকজন রাজনীতিজ্ঞ দেশের এই অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ; তাঁহারা গান্ধীজির সহিত বড়লাট বাহাদুরের সাক্ষাৎ ঘটাইয়া একটা আপোষের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গান্ধীজি বলিলেন যে রাজ-নৈতিক বন্দীদের ছাড়িয়া না দিলে, তিনি কোনো প্রকার মীমাংসার মধ্যে যাইবেন না। তিনিও তাঁহার চাহিদা কমতি করিলেন না, সরকারও তাঁহাদের প্রেসিটজ (Prestije) এর কণামাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে রাজি-

চিত্তরঞ্জন ও কংগ্রেস-কর্মীগণের কারাগার

হইলেন না। সুতরাং দুই দিকেরই ধনুর্ভঙ্গ পণের জন্য কোনো মীমাংসা হইল না।

১৯২১ সালের ডিসেম্বরে আমাদাবাদে কংগ্রেসে সভাপতি ছিলেন শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস। কিন্তু অধিবেশনের সময়ে তিনি কারাগারে। অধিকাংশ নেতা ও কর্মীরাই তখন জেলে। গান্ধীজির উৎসাহ ও বিশ্বাস অদম্য; তাঁহার সাধনা কঠিন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; সেইজন্য দেশের এমন অবস্থা দেখিয়াও তিনি বিচলিত হইলেন না। কংগ্রেসের পর তিনি বরদৌলিতে গমন করিয়া সত্যগ্রহ চালনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু নিরুপদ্রব বা অহিংসক অসহযোগ গ্রহণ করিতে হইলে যে সাধনা ও সংযম প্রয়োজন, তাহা অশিক্ষিত ও ধর্মহীন জনসাধারণের জীবনে নাই।

আহমাদাবাদের কংগ্রেস

গান্ধীজি 'সত্যগ্রহ' চালনা করিবার পূর্বাহ্নে পুনর্বার আর একটি আঘাত পাইলেন। ১৯২২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে যুক্ত প্রদেশে 'চৌরীচর' নামক স্থানের লোকদিগকে স্থানীয় পুলিশ অনর্থক অপমানিত করে; লোকে এই ব্যাপারে উত্তেজিত হইয়া থানা আক্রমণ করে ও ২১ জন দেশীয় পুলিশ ও চৌকীদারকে নৃশংসভাবে হত্যা করিল। এই ব্যাপারের মধ্যে কয়েকজন কংগ্রেস-কর্মী লিপ্ত ছিলেন; ফলে সমস্ত ঝুঁকি ও দায়ীত্বের বোঝা অসহযোগীদের উপর পড়িল। পূর্বেই বলিয়াছি অনেক দায়ীত্বজ্ঞানশূন্য গুণ্ডা শ্রেণীর লোক এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া অহিংসায় অরুচির ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। চৌরীচরের ব্যাপারে লোকে বুঝিল ধর্মের নামে রাজনীতিকে আধ্যাত্মিক করা সহজ সাধ্য নহে; গান্ধীজিও বুঝিলেন সত্যগ্রহের সময় উপস্থিত হয় নাই। তিনি বরদৌলীতে কংগ্রেস-কমিটি আহ্বান করিলেন ও সেখানে দেশের মধ্যে সংগঠন কার্যের (Constructive work) এক খশড়া প্রস্তুত করিয়া পেশ করিলেন। তিনি

চৌরীচর হত্যাকাণ্ড

কংগ্রেস-ভলান্টিয়ারগণকে সরকারী আইন অমান্য করিতে ও স্বেচ্ছায় কারাগারে যাইতে নিষেধ করিলেন। কংগ্রেস-কর্মীদের উপর নিম্নলিখিত কাজ করিবার জন্য বরদোলী-কমিটি উপদেশ দিলেন। প্রথমত কংগ্রেসের জন্য প্রতি সহর ও গ্রাম হইতে এককোটি সভ্য সংগ্রহ; দ্বিতীয়ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে চরকা কাটিতে ও খদ্দর পরিধান করিতে অনুরোধ; তৃতীয়ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান; চতুর্থত অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ; পঞ্চমত মাদক সেবন নিবারণ, গ্রামে গ্রামে সালিশী-কাছারী স্থাপন প্রভৃতি কর্মে বিশেষভাবে মনোযোগ দিবার জন্য সকলকে আহ্বান করা হইল। ২৪শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীর বিশেষ-কংগ্রেসে বরদোলীর প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হইল; কিন্তু তখন হইতে অসহযোগ আন্দোলনকারীদের মধ্যে অসন্তোষভাবের আভাস দেখা দিল। মহারাষ্ট্র ও খিলাফৎদলের মধ্যে পূর্ব হইতেই চাঞ্চল্য অনুভূত হইতেছিল। প্রতিষ্ঠিত শাসন-বিভাগের নিরন্তর নিন্দা ও শাসন-বিভাগকে জব্দ করিবার বা জাতীয় অপমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য হরতাল প্রভৃতি করিয়া দেশের লোককে ক্রমশই চঞ্চল করিয়া তোলা হইতেছিল; ও তাহারই ফলে আইন অমান্য ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় পাইয়া নিয়মভঙ্গ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইতেছিল; সরকার বলেন দাঙ্গা হাঙ্গামা যে ঘটিতেছিল, তাহার কারণ ইহাই।

বরদোলি-প্রস্তাব ও সংগঠন

গান্ধীজি সত্যগ্রহ চালাইবেন বলিয়া সরকারকে এক ইস্তাহার পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন যে অসহযোগী-দলকে সরকার বাধ্য করিয়া সত্যগ্রহ অবলম্বন করাইতেছেন; মানুষের কথা বলিবার, সভা করিবার স্বাধীনতা সরকার বিবিধ আইন করিয়া হরণ করিয়াছেন। সরকার বলিলেন যে রাজপ্রতিনিধি যুবরাজকে অপমাননা করিবার জন্য প্রজাবর্গকে উত্তেজিত করা,—Civil disobedience ঘোষণা বা প্রজাসমূহকে কর দিতে নিষেধ করা প্রভৃতি কর্মচেষ্টাকে কখনো

আইনসঙ্গত কার্য্য বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া সরকার নীরবে সকলপ্রকার আইনভঙ্গ দেখিতে পারেন না। প্রতিষ্ঠিত-শাসনের বিধি-নিয়ম রক্ষাকরা প্রত্যেক শাসন-বিভাগের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে তিন চারিমাসের মধ্যে অনেকগুলি দাঙ্গা হইয়াছে এবং তাহার জন্য সরকার মনে করেন আন্দোলনকারীরাই দায়ী। সরকারের বিবেচনায় সত্যগ্রহ আন্দোলন পুনরায় উত্থাপিত হইলে—দেশে অশান্তি ও দাঙ্গা বাড়িবে। সুতরাং তাঁহাদের মতে গান্ধীজিকে আর জনসাধারণের মধ্যে অসহযোগ ও সত্যগ্রহ আন্দোলন করিবার সুযোগ দিলে রাজ্যের সমূহ অমঙ্গল। অবশেষে ১৯২২ সালের ১০ই মার্চ তারিখে গান্ধীজি ইংরাজ সরকারের দ্বারা বন্দী হইলেন। তিনি শান্ত, সংযত ভাবে তাঁহার সাবরমতীর আশ্রম হইতে পুলিশের সঙ্গে চলিয়া গেলেন। বিচারালয়ে গান্ধীজি মুক্তকণ্ঠে নিজেকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিলেন; অসহযোগের জন্য যত কিছু অন্যায়, অনাচার, হত্যা, দাঙ্গা হইয়াছে, তাহার জন্য তিনিই দায়ী। তবে তিনি এ কথাও বলিলেন যে মুক্তি পাইলে তিনি অসহযোগ আন্দোলন পুনর্প্রবর্তিত করিবেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোনো প্রকার করুণা চান না—তাঁহার অপরাধের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি তিনি বহন করিতে প্রস্তুত। বিচারে গান্ধীজির ছয় বৎসর কারাবাসের আদেশ হইল। তাঁহার কারাবাসের আদেশে দেশের কোথায়ও কোনো প্রকার অশান্তি দেখা গেল না, কোনো চাঞ্চল্য কোথায়ও অনুভূত হইল না। ইতিপূর্বে অসহযোগী-দলের ছোট বড় সকল কর্মীদিগকে সরকার ধীরে ধীরে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এখন আন্দোলনের স্রষ্টাকে সরকার বন্দী করিলেন।

সরকারের কর্ত্তব্য

১৯২২-১০ই মার্চ গান্ধীজির কারাগার

দেশের মধ্যে অবসাদ দেখা দিয়াছিল; গান্ধীজি লোকের কাছে 'স্বরাজ' লাভের জন্য নানা উপায় বলিতেছিলেন—অমুক দিনের মধ্যে

'স্বরাজ' হইবে, চরকা কাটিলে স্বরাজ হইবে, আইন অমান্য করিলে স্বরাজ হইবে ইত্যাদি আশ্বাসবাণী লোকে ভুলভাবে গ্রহণ করিতেছিল। এতবড় দেশে এত বিচিত্র জাতি, বিবিধ ভাষা, পৃথক ইতিহাস পৃথক সভ্যতা। সকলের মিলনের পক্ষে কোন্ পথটি উপযোগী তাহা কেহ জানেনা, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, বদলাইয়া নানাভাবে চিন্তা করিয়া গান্ধীজি পথ-নির্দেশের চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ক্রমেই লোকে তাঁহার প্রণালী সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেছিল। কারণ তাহারা সাধনা না করিয়াই সাধনার ফল পাইতে চায়। ক্রমে অসহযোগের উন্মাদনা শান্ত হইয়া আসিতে লাগিল।

অসহযোগ নীতি সম্বন্ধে সন্দেহ

অসহযোগীরা প্রথম ব্যবস্থাপক-সভায় প্রবেশ করেন নাই এবং জাতীয়দলের কেহ সভ্যপদপ্রার্থী না হন, তজ্জন্য আন্দোলনকারীরা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাদের আন্দোলন কার্য্যকারী হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু এখন এই নীতি সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ হইতে লাগিল।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ও অন্যান্য অসহযোগী নেতৃবৃন্দ কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, দেশের গতি অন্যদিকে নিয়ন্ত্রিত না করিলে জাতীয় আন্দোলন অগ্রসর হইবে না। জুন মাসে দিল্লীতে কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশন হয়; সেখানে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহেরু প্রভৃতিকে লইয়া একটি সত্যগ্রহ-কমিটি গঠিত হইল। এই 'সত্যগ্রহ-কমিটি' সমগ্র দেশ ভ্রমণ করিয়া দেশ Civil Disobedience বা আইন-অমান্য করিতে প্রস্তুত কি না তাহা তদন্ত করিলেন; অক্টোবর মাসে কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল। সভ্যগণ একবাক্যে বলিলেন যে 'সত্য-গ্রহের' জন্য দেশবাসী মোটেই প্রস্তুত নহে; কিন্তু কৌন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে সভ্যদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা গেল; পূর্বের ন্যায় অসহযোগীরা

Civil Disobedience Committee

ব্যবস্থাপক-সভায় প্রবেশ বিষয়ে গোঁড়ামী ত্যাগ করিলেন। চট্টগ্রামের প্রাদেশিক সমিতিতে চিত্তরঞ্জন কৌন্সিল-প্রবেশের প্রস্তাব প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন অসহযোগী হইয়াও কৌন্সিলের সভ্য হইতে পারা যায়; কারণ তাঁহারা সরকারকে সাহায্য করিবার জন্য সদস্যশ্রেণী-ভুক্ত হইবেন না—কৌন্সিল ভাঙ্গিবার জন্য তাঁহারা সভ্য হইবেন। অসহ-যোগী-সভ্যসংখ্যা কৌন্সিলে অধিক হইলে তাঁহারা যাহা চাহিবেন ভোটের দ্বারা যদি তাহার চরম-সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার রীতি অনুসৃত হয়—তবে তাঁহাদেরই জয় হইবে। তাঁহাদের জিদ্ বজায় না থাকিলে, তাঁহারা পদে পদে সরকারের সকল চাহিদা (demand) বন্ধ করিবেন। মোটকথা কৌন্সিল ধ্বংসের অভিপ্রায়ে তাঁহারা কৌন্সিলে প্রবেশের জন্য চারিদিকে আন্দোলন সুরু করিলেন।

অসহযোগীদের কৌন্সিল-প্রবেশের প্রস্তাব

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইল; চিত্তরঞ্জন সভাপতি। তিনি এই সভায় বৃটিশ-শাসন ও নূতন শাসন-সংস্কারের অনেক ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে তিনি যে-স্বরাজ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতে-ছেন তাহা ধনী বা মধ্যবিত্তদের জন্য নহে, তাহা ভারতের আপামর সাধা-রণের স্বরাজ! কিন্তু সে-স্বরাজ কেমনভাবে লাভ হইবে তাহার কোনো কার্য্যপ্রণালী গয়ায় কংগ্রেসে আলোচিত বা উপস্থাপিত হয় নাই। এই অধিবেশনে কৌন্সিল-প্রবেশ সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং দেশের মধ্যে পুনরায় দলাদলির সূত্রপাত হইল। একদল গান্ধীজির বরদৌলী প্রস্তাব ও অসহযোগ মন্ত্র হইতে একপদও নড়িবেন না। তাঁহারা মহা আড়ম্বরে তাঁহাদের কার্য্যে মন-সংযোগ করিলেন; তাঁহারা প্রচার করিলেন অতঃপর ভারতীয় সরকার যে সব ঋণ করিবেন, তাহা স্বরাজপ্রাপ্ত হইলে ভারতের জাতীয় শাসন-বিভাগ

১৯২২ গয়ার কংগ্রেস

কংগ্রেসে মতভেদ

শোধ করিবেন না! তাঁহারা 'সত্যগ্রহ' পরিচালনার জন্য পঞ্চাশহাজার স্বেচ্ছাসেবক ও পঁচিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; নূতন উদ্যমে চরকা ও খদ্দর প্রচলনের প্রয়াস হইল। ইতিমধ্যে দেশে চরকার উৎসাহ বিশেষভাবে মন্দা পড়িয়া আসিয়াছিল।

চিত্তরঞ্জন ও স্বরাজ্যদল

১৯২৩ সালের ১লা জানুয়ারী শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন 'স্বরাজ্য' দল গঠন করিলেন। ইঁহারা কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া নিজেদের প্ল্যান অনুসারে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক। সমগ্র ভারতবর্ষময় 'স্বরাজ্য' দল ও 'অসহযোগী' বা No.-changer দলের মধ্যে বিরোধ চলিতে লাগিল। তিলক-স্বরাজ্য-ভাণ্ডারের মালিকানা স্বরাজ্য দল করিবে কি না এই লইয়া অত্যন্ত অশান্তি হইতে লাগিল; তখন স্বরাজ্য দল নিজেদের ভাণ্ডার নিজেরা সংগ্রহ করিবেন বলিলেন। অসহযোগীদলের তরফ হইতে কাজ করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ-সংগ্রহের জন্য যে আবেদন আন্দোলন চলিতেছিল—তাহার ফলে আশানুরূপ কর্ম্মী ও অর্থ জুটিল না। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে উভয় দলের মধ্যে মীমাংসা হইল যে কংগ্রেসের গঠনশীল কর্ম্মপদ্ধতি যতদিন কার্য্যে পরিণত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত—কৌন্সিল-প্রবেশ সম্বন্ধে আন্দোলন বন্ধ থাকিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত দাস মহাশয়ের প্রতাপ চারিদিকে প্রকাশিত হইতে লাগিল। মে মাসের বরিশাল-কন্‌ফারেন্সে উভয় দলের মধ্যে বিরোধ, বিচ্ছেদে পরিণত হইল। সেখানে কৌন্সিল-প্রবেশের প্রস্তাব গৃহীত হইল না। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও 'স্বরাজ্য' দল গঠিত হইয়াছিল এবং কৌন্সিল-প্রবেশের জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। অবশেষে বোম্বাইতে

স্বরাজ্যদল ও অসহযোগী দল

নিখিল ভারত-রাষ্ট্র সভার এক অধিবেশনে স্থির হইল যে কংগ্রেস হইতে কৌন্সিল-প্রবেশ বিষয়ে কোনো প্রতিবাদ করা হইবে না। এই প্রস্তাবেও একদল

গোঁড়া-অসহযোগী অসহিষ্ণু হইয়া কংগ্রেসের সহিত কর্মবন্ধন ত্যাগ করিলেন ; বাংলাদেশে শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতি একদল গান্ধীজির বরদৌলী প্রস্তাবের একতিল বাহিরে যাইতেও অনিচ্ছুক ; তাঁহারা কংগ্রেসের প্রস্তাবকে গান্ধীজির প্রস্তাবের উপরে স্থান দিতে পারিলেন না বলিয়া কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন। এই সময় হইতে ভারতের সর্বত্র 'স্বরাজ্য'দল কৌন্সিল-প্রবেশের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ করিলেন ; তাঁহাদের অদ্ভুত কর্ম-চেষ্টার ফলে অধিকাংশ প্রদেশেই ব্যবস্থাপক-সভায় স্বরাজ্যদলের সভ্য নির্বাচিত হইয়াছে।

স্বরাজ্যদল যে কেবল কৌন্সিলে প্রবেশ করিয়াছেন তাহা নহে ; তাঁহারা জেলাবোর্ডে, ম্যুন্সিপালটিতেও প্রবেশ করিয়াছেন। কলিকাতার কর্পোরেশন 'স্বরাজ্য'দল অধিকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দাস মহাশয় ইহার লর্ড মেয়র ও শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসু ইঁহার প্রধান একজিক্যুটিভ অফিসার। স্বরাজ্যদলের অন্যান্য লোকে করপোরেশনের নানা কাজে নিযুক্ত হইয়াছে।

'স্বরাজ্য'দল চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে কর্ম আরম্ভ করিলেন, তাহা গান্ধীজির সরল আধ্যাত্মিকতা নহে। তিনি রাজনীতিকে রাজনীতি দ্বারা পরাভূত করিবার জন্য স্বীয় দলকে পুষ্ট করিবার সকল উপায় গ্রহণ করিলেন। প্রথমেই Forward নামে একখানি ইংরাজী দৈনিক কাগজ প্রকাশ করিয়া স্বরাজ্যদলের মুখপত্র করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি 'স্বরাজ্যদল' গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে, লোকাল বোর্ড, ম্যুন্সিপালটি প্রভৃতির সভ্যপদগুলি অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। বাংলায় কংগ্রেস-কমিটিতে চিত্তরঞ্জন মুসলমানদের সহিত একটা সর্ত করিলেন; স্বরাজ্যদল প্রবল হইলে মুসলমানদের কিরূপ নির্বাচন ও চাকুরী প্রদত্ত হইবে তাহাই এই সর্তের মূল। এই সর্ত দেশে হিন্দুদের মধ্যে মোটেই আদৃত না হইলেও কংগ্রেসে স্বরাজ্যদল প্রবল বলিয়া

স্বরাজ্যদল ও Pact

উহা পাশ হইয়া গেল। মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত চাকুরী ও নির্বাচনের ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া মিত্রতাকে পাকা করিবার চেষ্টা হইল। যতদিন খিলাফৎ-প্রশ্ন ছিল ততদিন হিন্দুরা তাহাদিগকে দলে টানিবার জন্য খিলাফৎ-আন্দোলনকারীদের সকলপ্রকার চাহিদা মানিয়া লইয়া রাজনৈতিক-প্রেম বজায় রাখিয়াছিল; এক্ষণে স্বরাজ্য দলের স্বার্থের জন্য মুসলমানদের সহিত Pact করা হইল।—সুতরাং বাংলায় ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু-মুসলমান সভ্যদের অধিকাংশই 'স্বরাজ্যদলের' লোক হইলেন; সরকারের কর্মকে পণ্ড করিবার জন্য দলের লোকেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

ব্যবস্থাপক-সভায় কয়েকটি বিষয়ের ভোটে সরকারীপক্ষ স্বরাজ্যদলের নিকট পরাভূত হইলেন। অবশেষে স্বরাজ্যদল দেশীমন্ত্রীদের উপর অনাস্থা দেখাইয়া তাহাদের বেতন বাজেট হইতে বাতিল করিবার প্রস্তাব আনিলেন। এই লইয়া দেশে খুবই আন্দোলন চলিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট প্রথমবার পরাজিত হইয়া গেলেন ও পুনরায় অতিরিক্ত বাজেট-সভায় মন্ত্রীদের বেতনের জন্য প্রস্তাব আনিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইতি-

ঢাকায় লিটনের বক্তৃতার ফল

মধ্যে দুর্ভাগ্যবশতঃ লর্ড লীটন ঢাকায় পুলিশ-শিক্ষালয়ে এক বক্তৃতাকালে ভারতীয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এমন কয়েকটি কথা বলিলেন, যাহা ভারতীয় স্ত্রীজাতির অসম্মানকর বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে। গভর্ণরের এই উক্তির সুযোগ লইয়া দেশে স্বরাজ্যদল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল এমনি আন্দোলন করিলেন যে দেশের আপামর সাধারণে লাটসাহেবের উপর বিরূপ হইয়া গেল। ইহার পরেই ব্যবস্থাপক সভার বাজেট-অধিবেশনে মন্ত্রীদের বেতন সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত হইল; তখন দেখা গেল যে সরকারের পক্ষের জয়ী হইবার কোনো আশা নাই। স্বরাজ্যদলের চেষ্টার ফলে

মন্ত্রীদের বেতন বন্ধ

সরকার পরাভূত হইল। গজনভী সাহেব ও ফজলল হক মন্ত্রীদ্বয়ের বেতন বন্ধ হইল। কর্তৃপক্ষ বলিলেন

যে এইখানেই উদার রাজনীতির অবসান হইল; ব্যবস্থাপক-সভা লাট-সাহেবের আদেশে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করা হইল। দেশীয় মন্ত্রিদের পদ উঠিয়া গেল। স্বরাজ্যদল ইহাই চাহিতেছিলেন; ভারতের দ্বৈত গভর্ণমেণ্ট যে স্বরাজ্য-লাভের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, ইহাই প্রমাণিত করিবার জন্য তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল। ইতিপূর্বে মধ্যপ্রদেশেও মন্ত্রীরা কর্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বর্তমানে অধ্যক্ষ-সভার সদস্যগণের উপর হস্তান্তরিত বিষয়গুলির ভার পড়িয়াছে। বঙ্গীয় সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে হস্তান্তরিত বিষয়ের কোনো মন্ত্রী না থাকায় আগামী অধিবেশনে ঐ সকল বিষয়ের কোনো প্রশ্ন (Interpellation) থাকিলে তাহার উত্তর দেওয়া হইবেনা।

বাংলার বিপ্লব ও Ordinance

১৯২৩ সাল হইতে কলিকাতার মধ্যে বিপ্লবীদের অস্তিত্ব পুনরায় জানা গেল। কয়েকজন হত্যাকারী ও বিপ্লবকারী ধরা পড়িয়াছিল; ১৯২০ সালে রাজাজ্ঞায় যে সব বিপ্লবকারীদের ক্ষমা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে সরকার বাহাদুর সন্দেহে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। ১৯২৪ সালে ২৫শে অক্টোবর বড়লাট বাহাদুর বাংলাদেশের জন্য বিশেষ Ordinance প্রকাশ করিলেন এবং তাহারই সাহায্যে উক্ত দিবসে কলিকাতায় প্রায় ৭২ জন 'স্বরাজ্য'দলের কর্মীকে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল; মফঃস্বলেও কয়েকটি গ্রেপ্তার হইয়াছে। যেসব লোক বন্দী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কর্পোরেশনের প্রধান শ্রীসুভাসচন্দ্র বসু, শ্রীঅনিলবরণ রায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতির ন্যায় লোক আছেন। ইঁহারা যে বিপ্লবকারী-দের গোপন কর্মের সহিত সংযুক্ত, একথা কোনো বাঙালী বিশ্বাস করিতে পারে না। Ordinance এর বিরুদ্ধে ভারতবর্ষময় প্রতিবাদ চলিতেছে; এবং বাংলাদেশে সকল মতের, সকল দলের লোক একত্র হইয়া

সরকারের এই কঠিন আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন।

স্বরাজ্যদলের বাহিরে থাকিয়া অসহযোগী একদল কর্মী দেশে চরকা ও খদ্দর প্রচলনের জন্য জীবনপাত করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় (P. C. Ray) খদ্দর-প্রতিষ্ঠান করিয়া দেশের আর্থিক সমস্যাপূরণের চেষ্টা করিতেছেন। বাংলাদেশের বাহিরে যুক্তপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট, মাদ্রাসের বহুস্থানে এখন খদ্দর প্রতিষ্ঠান হইয়াছে; কিন্তু এসব ক্ষেত্রে গান্ধীজির অন্যান্য সংগঠন-কর্ম বিশেষভাবে অগ্রসর হইতেছে না; অস্পৃশ্যতা-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে—কিন্তু ইহার প্রসার খুবই ধীরে ধীরে হইতেছে। মাদক সম্বন্ধেও সেই কথা।

খদ্দর প্রতিষ্ঠান

সত্যগ্রহ-আন্দোলন মানুষের মনকে সত্য গ্রহণ করিবার জন্য যে উদ্বোধিত করিয়াছে—তাহার প্রমাণ ভারতের কয়েকটি বিশেষ আন্দোলনের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষের মন জাগিয়াছে বলিয়া সে আজ কেবল রাজনৈতিক অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে তাহা নহে,—সে সামাজিক, আধ্যাত্মিক অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সর্বস্ব সমর্পন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। পঞ্জাবে শিখদের মধ্যে, ত্রিবঙ্কুরের ভাইকমে অস্পৃশ্যজাতির মধ্যে, বাংলাদেশে তারকেশ্বরের সত্যগ্রহে এই নূতন জীবনের সাড়া পাওয়া গিয়াছে।

সমাজ ও ধর্মে সত্যগ্রহ

দ্বিতীয় খণ্ড

ভারতে বিপ্লববাদের ইতিহাস

প্রথম পর্ব

বিপ্লববাদের অভিব্যক্তি

ভারতে রাজনৈতিক উন্নতির জন্য বিচিত্র পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে; বিধিসঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া, ভারতের অভাব অভিযোগ সুযুক্তিপূর্ণ নিবন্ধে প্রকাশ করিয়া, ইংরাজের নিকট হইতে সুবিধা সুযোগ দাবী করা হইয়াছে; 'সরকার বাহাদুর কিছু দিল না', 'ইংরাজ প্রজার কথায় কর্ণপাত করিল না' বলিয়া আমরা অভিমানভরে ইংরাজকে জব্দ করিবার আশায় একবার বয়কট গ্রহণ করিয়াছিলাম ও পুনরায় 'অসহযোগ' ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। বয়কটেরই অপর নাম অসহযোগ। বিধিসঙ্গত আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হইল মনে করিয়া—বিধি-অমান্য করিবার জন্য 'সত্যগ্রহ' আন্দোলন উপস্থাপিত করিয়া দেশের মধ্যে অহিংসক অধ্যাত্ম-রাজনীতি প্রচার করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। সকলের উদ্দেশ্যই এক—আবেদন নিবেদন, যুক্তিতর্ক করিয়া দেশের জন্য কিছু সুবিধা আদায়—না হয় বয়কট বা অসহযোগ করিয়া সরকারকে জব্দ করিয়া শাসন-সংস্কার আদায়। মডারেট বা লিবারেল দলের রাজনৈতিক সাধন Constitutional agitation ও নন্-কো-অপারেটার বা অসহযোগীদলের মুক্তিসাধন সত্যগ্রহ ও Civil disobedience। দুইটি মত পাশাপাশি কাজ করিয়া আসিতেছে। এ দুইটিকে নেতারা ভারতের

মুক্তির বিচিত্র পথ

(১) বিধিসঙ্গত পথ
(২) বিধি-অমান্য বা সত্যগ্রহ
(৩) বিপ্লব কর্ম

মুক্তিসাধনের উপায় বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই দুইটি মত ব্যতীত ভারতের মুক্তির জন্য তৃতীয় একটি মত ছিল,—সেটি হইতেছে বিপ্লববাদ।

বিপ্লবদল গঠিত হইবার পূর্বে দেশে বিপ্লববাদ প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতে যথার্থ বিপ্লবকর্ম বিংশ শতাব্দীতে আরম্ভ হইয়াছে,—কিন্তু ইহার বহুপূর্ব হইতে বাংলাদেশে সাহিত্যের ভিতর দিয়া বিপ্লববাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকেই বিপ্লববাদ বলিলে কেবল গুপ্ত-হত্যা, ডাকাতি ইত্যাদি বুঝিয়া থাকেন; কিন্তু সেটা বঙ্গীয় বিপ্লবকর্মীদের ভ্রান্ত আদর্শের উপায়মাত্র ছিল, উদ্দেশ্য নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাহেতু ভারতীয় যুবকগণ য়ুরোপের বিপ্লবের ইতিহাস, স্বাধীনতার ইতিহাস, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া প্রতিবাদ করিবার উদাহরণ প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাশী-বিপ্লব, সপ্তদশ শতাব্দীর ক্রমওয়েলের কীর্ত্তি ও ইংরাজদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, আমেরিকায় জর্জ ওয়াসিংটনের কাহিনী, রুশিয়ায় জারের অত্যাচার ও তাহার বিরুদ্ধে নিহিলিষ্টদের গুপ্তহত্যা-কাহিনী যুগপৎ শিক্ষিত যুবকদের তরুণমনকে বিক্ষিপ্ত ও ভাবোন্মত্ত বা Romantic করিয়া তুলিয়াছিল। বিপ্লবের নেশা বাঙালীর মনকে অনেক পূর্ব হইতেই আলোড়িত করিয়াছিল বলিয়া সমাজে, ধর্মে, জাতীয় জীবনের সকল কোঠায় সে বিপ্লব-সাধন করিয়াছে; সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সে বিপ্লবের পরীক্ষা করিতে দুঃসাহসী হইয়াছিল।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিপ্লববাদ

সাহিত্যের মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে বাঙালীর সম্মুখে তাহার অতীত গৌরব কাহিনীর রঙীন চিত্র প্রকাশ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ম্যাট্‌সিনি, কাভুর, গ্যারিবল্ডী প্রভৃতির চেষ্টায় ইতালির স্বাধীনতালাভের কাহিনী বাঙালীকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। অষ্ট্রীয়া-সম্রাটের বিরুদ্ধে উৎপীড়িত ইতালি যেমন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার

স্বাধীনতা কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল,—ইত্যাদি আখ্যায়িকা বাঙালীর চিত্তের সম্মুখে যিনি প্রথম আনয়ন করেন, তাঁহাকে আমরা বিপ্লববাদের শীর্ষস্থানে বসাইব। স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাংলা ভাষায় ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী, ওয়ালেস প্রভৃতির জীবনচরিত লিখিলেন; রাজপুত বীরদের অদ্ভুত কীর্ত্তির কথা লিখিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় শিক্ষিত যুবকদের সম্মুখে ম্যাটসিনির আদর্শ-চরিত্র তুলিয়া ধরিলেন এবং তাহাদিগকে গুপ্তসমিতি স্থাপনপূর্বক স্বদেশের কল্যাণ সাধনা করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোনো বিপ্লবসংঘের সহিত যুক্ত ছিলেন না। কারণ তখনও বাঙালী যুবক সেদিকে যায় নাই; তবে তাঁহার চিন্তার প্রভাব ও তাঁহার গ্রন্থাবলী বিপ্লববাদের খুবই সহায় এ কথা নিশ্চিত। এ ছাড়া স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু ও ঠাকুর বাড়ীর কয়েকজন যুবকে মিলিয়া অতি উদ্ভট রকম বৈপ্লবিক জল্পনা করিতেন বলিয়া শোনা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' ও অন্যান্য গ্রন্থ বিপ্লববাদ প্রচারে সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্রের নাম স্মরণীয়।

যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের রচনাবলী

শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা জাতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে একথা বাঙালী ও মারাঠীর মধ্যে প্রথম জাগিয়াছিল। বাংলাদেশে শ্রীযুক্তা সরলাদেবী ও স্বর্গীয় ব্যরিষ্টার পি, মিত্র প্রভৃতি কতিপয় উৎসাহী হৃদয় কলিকাতায় ১৮৯৭ সালে যুবকদের লইয়া একটি সমিতি গঠন করেন। সমিতির উদ্দেশ্য ছেলেদের নৈতিক, মানসিক, দৈহিক উন্নতি-সাধন, ইহাই পরযুগে অনুশীলন সমিতির সূচনা; 'অনুশীলন' কথাটি বঙ্কিমবাবুর নিকট হইতে গৃহীত। প্রথমে ইহাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। সেখানে আত্মরক্ষার নানাবিধ কৌশল ও লাঠিখেলার চেষ্টা চলিত। তখনকার শরীর-চর্চা কিন্তু সাধারণতঃ রাস্তাঘাটে,

৺ পি মিত্র ও সরলাদেবী প্রতিষ্ঠিত ব্যায়ামাগার

রেলষ্টীমারে, গোরার অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্তই চলিয়াছিল। লাঠিখেলা ও আখ্ড়ার সঙ্গে ঐ সময়ে গুপ্তসমিতির কল্পনা ও তাহা গড়া চলিতেছিল। তবে তাহাদের কোন বিশেষ কার্য্যকলাপ তখনও দেশে প্রত্যক্ষ হয় নাই। পৃথক ও বিক্ষিপ্তভাবে গুপ্ত-সমিতি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা, দেশকে স্বাধীন করিবার বাসনা, অনেকের মনেই দেখা দিয়াছিল এবং তাহা লাভের উপায় সম্বন্ধেও বিচিত্র ও উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ও স্বদেশীযুগের পূর্বপর্য্যন্ত বাংলাদেশে এই শ্রেণীর বিপ্লববাদ প্রচারিত হইতেছিল—যথার্থ বিপ্লবকর্মের বিষ দেশমধ্যে তখনো প্রবেশ লাভ করে নাই।

বোম্বাই প্রদেশে মারাঠাজাতির মধ্যে শ্রীযুক্ত তিলক যে নূতন প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিয়াছি। তিলক প্রবর্তিত "শিবাজী-উৎসবের" তরঙ্গ বাংলাদেশেও আসিয়া লাগিয়াছিল। ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় সম্ভবত ১৯০২ সালে মারাঠার এই বীরপূজা বাংলাদেশে প্রবর্তিত করেন। তদবধি মহাসমারোহে কয়েকবার কলিকাতায় ও মফঃস্বলে 'শিবাজী' উৎসবের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী-উৎসব' সম্বন্ধে কবিতাটি বাংলাসাহিত্যে অমর হইয়াছে।

শিবাজী উৎসব

বিপ্লববাদ ও স্বাধীনতার বাণী দেশের মধ্যে প্রচারের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বা Miss Margaret Noble কিয়দপরিমাণে দায়ী। তিনি কলিকাতার তরুণ মহলে উদ্দীপনাময় ভাব-জীবনের গঠন করিয়া তুলিয়াছিলেন। পূর্ব-পরিচ্ছেদোল্লিখিত Dawn Society বলিয়া যে জাতীয়তা-অনুশীলনের চিন্তাকেন্দ্র ছিল, তাহার উদ্যোগীগণ নিবেদিতার জাতীয়তাভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। নিবেদিতা কেবল

ভগিনী নিবেদিতা ও বিপ্লববাদ

যুবকদলের মধ্যে স্বাধীনতার আদর্শ দান করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি ঘরে ঘরে গিয়া স্বাধীনতার বাণী শুনাইতেন। তাঁরই সুপরিচিত বন্ধু Empire-এর সম্পাদক মিঃ জে, এফ ব্রেয়ার সাহেব তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"Ten years ago she was full of the revolutionary ideas which have since obtained so lurid an advertisement all over Asia. And she was far too honest to keep them to herself and as her influence over young Bengal was greater than most people suspected, she probably did more to create an atmosphere of unrest than all the newspapers in the world." (প্রবর্ত্তক ১৩৩১, আশ্বিন)।

বিপিনচন্দ্রের New India

স্বদেশী-যুগের পূর্ব্বেই (১৯০২ সালে) ভাবুক ও মনিসী বিপিনচন্দ্র তাঁর "New India" পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার ছত্রে ছত্রে মামুলী রাজনীতি আলোচনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাপূর্বক তিনি নূতন রাষ্ট্র-চিন্তার ধারা প্রবর্তনে প্রয়াসী হন। শ্রীযুক্ত ভ্যালেন্টাইন চিরোল তাঁহার "ভারতের অশান্তি" (Indian Unrest) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মহামতি তিলককে Father of Indian unrest বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারই মতানুসারে বাঙালীদের মধ্যে তিলকের দুইটি প্রধান শিষ্য জুটিয়াছিলেন—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। ইঁহারা উভয়ে নাকি তিলকের মহিমাময় প্রভাবে দীক্ষিত হইয়া 'ভারতবাসীর জন্য' ভারতবর্ষ এই ভয়ঙ্কর মতের প্রচার করিতে লাগিয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র 'New India'র ভিতর দিয়া নবভাবের বীজটিকে আপন মৌলিক প্রতিভার আলোকে বেশ যোগ্যতার সহিত পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। এই বীজ অদূর ভবিষ্যতের যুগ-প্রবর্তনে যথেষ্ট কাজ করিয়াছিল। (প্রবর্ত্তক

১৩৩১ আশ্বিন) New India র মূলমন্ত্র ছিল নূতন স্বাজাত্যবোধ ও আত্মনিষ্ঠা। বিপিনচন্দ্র স্বদেশীযুগের পূর্বেই ভারতে ও বিশেষভাবে বাংলাদেশের মনের মধ্যে বিপ্লবীভাব আনয়ন করিয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ, বঙ্কিম চন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির পূর্ব-বর্ণিত বিপ্লববাদ হইতেছে বিপ্লবযুগের প্রথম স্তর। তিলক, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ প্রভৃতি হইতেছেন বিপ্লবী-ভাবের প্রবর্তক—ইহাই হইতেছে বিপ্লবযুগের দ্বিতীয় স্তর। বিপ্লব-যুগের তৃতীয় স্তর হইতেছে যথার্থ বিপ্লবী-কর্ম। বিপ্লব-কর্ম আরম্ভ হয় বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে। কিন্তু সিডিশন কমিটি বলেন যে বোম্বাই-এর 'সার্বজনিক গণপতি-পূজা' 'শিবাজী উৎসব' ও র‍্যাণ্ড-হত্যা বিপ্লবকর্মের প্রথম সূচনা। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব-পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি; এ ঘটনাটিকে ঠিক বিপ্লবের সহিত যুক্ত করিতে পারা যায় কিনা সন্দেহ, তবে এই সময় হইতে বোম্বাই প্রদেশে মারাঠাদের মধ্যে বিপ্লব-ভাব জাগ্রত হয়। কিন্তু বাংলাদেশ ছাড়া বিপ্লবের বিষ আর কোথায়ও, এক পঞ্জাব ছাড়া—তেমন করিয়া বিস্তারলাভ করে নাই। বাংলাদেশের বিপ্লব-ইতিহাস বর্ণিবার পূর্বে আমরা পশ্চিম-ভারতে ও য়ুরোপে বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাস লিখিব।

বোম্বাইতে প্রথম বিপ্লব কর্ম

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা নামে জনৈক কাথিবাড়-বাসী গুজরাটী ইংলণ্ডে গমন করেন ও সেখানে বিপ্লব আন্দোলন সৃষ্টি করিবার আয়োজন করেন। ১৯০৫ সালে জানুয়ারী মাসে কৃষ্ণবর্মা লণ্ডনে Indian Home Rule Society স্থাপন করেন এবং Indian Sociologist নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন; এই পত্রিকার উদ্দেশ্য তিনি বলেন ভারতবর্ষের জন্য হোমরুল বা স্বায়ত্তশাসন পাওয়া। ইনি য়ুরোপের ধনী ভারতবাসীদের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ

বিলাতে কৃষ্ণবর্মা ও Indian Sociologist

করিয়া কয়েকটি যুবককে ভারতবর্ষ হইতে য়ুরোপে লইবার ব্যবস্থা করেন। এই অর্থসাহায্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন প্যারী নগরীর শ্রীযুক্ত শ্রীধর রণজিৎ রাণা। এই ধনী ব্যবসায়ী দুই হাজার টাকা করিয়া শিবাজী, প্রতাপসিংহ প্রভৃতির নামে বৃত্তি স্থাপন করেন। যে সকল যুবক শ্যামজীর প্ররোচনায় ইংলণ্ডে উপস্থিত হন, তাহার মধ্যে বিনায়ক সবরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মারাঠাদেশে নাসিক নগরীতে বিনায়ক ও তাঁহার ভ্রাতা গণেশ সবরকার বহুদিন হইতে মারাঠা যুবকদের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চারিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন।

সবরকার ও মিত্রমেলা

১৮৯৯ সালে তাঁহারা 'মিত্রমেলা' নামে এক সমিতি স্থাপন করেন—ইহা অনেকটা বাংলাদেশের অনুশীলন সমিতির ন্যায় একটি সঙ্ঘ। গণেশ সবরকার মারাঠা বালক ও যুবকদের শারীরিক ব্যায়াম ও ড্রিল প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিতেন।

বিলাতে ইণ্ডিয়া হাউস কৃষ্ণবর্মা ও তাঁহার সঙ্গীদের বিপ্লববাদের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। ১৯০৭ সালে বিলাতে হাউস্ অব কমান্সে কৃষ্ণবর্মার কর্ম-প্রসার ও বিপ্লববাদ বিষয়ে প্রশ্ন উঠে। কৃষ্ণবর্মা ইংলণ্ডে অবস্থান করা নিরাপদ নয় বুঝিয়া ঐ দেশ ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার পত্রিকা Indian Sociologist তখনও লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ১৯০৮ সালের বিপ্লব-কাহিনী প্রকাশিত হইয়া পড়িলে, ইংলণ্ডে Indian Sociologist এর উপর বৃটীশ-পুলিশের বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। রাজদ্রোহ অপরাধে ইহার মুদ্রাকরকে দুইবার কারাবাস করিতে হইল। তখন

কৃষ্ণবর্মার ফ্রান্সে আশ্রয়

অগত্যা কৃষ্ণবর্মা তাঁহার পত্রিকাখানিকে ফ্রান্সে প্যারী নগরীতে উঠাইয়া লইয়া গেলেন। ১৯০৭ সাল হইতে কৃষ্ণবর্মা ও তাঁহার সঙ্গীদের চেষ্টা হইল ভারতের মধ্যে গুপ্তসমিতি স্থাপন। রুশীয় নিহিলিষ্টগণ যেমন করিয়া রুশীয় গভর্ণমেণ্টকে সায়েস্তা করিতেছে—

তেমনি করিয়া ইংরাজ সরকারকেও করিতে হইবে! কৃষ্ণবর্মা যে কথা বিলাতে বলিতেছিলেন, তাহারই প্রতিধ্বনি যেন ভারতের বিপ্লবীদের মধ্যে বাজিতেছিল। মারাঠী ভাষায় 'কাল' নামক পত্রিকা রুশীয় শাসন-সরকারকে জব্দ করিবার কথা, বোমা-নিক্ষেপ প্রভৃতির ইতিহাস প্রকাশ করিতেছিলেন; বাংলাদেশেও ১৯০৫ সাল হইতে 'যুগান্তর' বিপ্লবের কথা বলিতেছিল। বিলাতে ইণ্ডিয়া-হাউসের সভ্যগণ নানাপ্রকার বিদ্রোহাত্মক পুস্তিকা ছাপাইয়া প্রচার করিতেছিলেন; তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও তাঁহাদের মনের উৎসাহ এতই অপর্য্যাপ্ত ও কল্পনাশক্তি এতই উর্বরা ছিল যে ইংলণ্ডে বসিয়া বিদ্রোহকল্পনা ও প্রচার করিবার দুঃসাহস তাঁহাদের হইয়াছিল। শ্যামজী ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর হইতে বিনায়ক সবরকার ইণ্ডিয়া-হাউসে ভারতীয় ছাত্রদের নেতা হইয়া উঠেন।

বিলাতে বিনায়ক সবরকার

প্রত্যেক রবিবারে সবরকার-লিখিত 'সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস' নামক এক গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া উদ্দীপক অংশগুলি পাঠ করা হইত। ভারতবর্ষের বর্তমান দুর্দশা সম্বন্ধে আলোচনা ও ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই ক্ষুদ্র বিপ্লবীদল আত্মহারা হইত। এই শ্রেণীর দায়িত্বজ্ঞানহীন বিপ্লবীভাব প্রচারের ফলও অচিরে প্রকাশ পাইল। মদনলাল ধিংড়া নামক একটি পঞ্জাবী ছাত্র Sir Curzon-Wyllie নামক একজন সাহেবকে (ইনি India-officeএর জনৈক A. D. C.) হঠাৎ অকারণ হত্যা করিল! এই হত্যার একমাত্র কারণ বিদ্বেষ; একজন নিরপরাধ সাহেবকে হত্যা করিয়া সে দেশের শত্রুক্ষয় করিতে চাহিয়াছিল!

কার্জন-ওয়ালীর হত্যা

ধিংড়ার ভাষায় তাহার তৎকালীন মনোভাব কিরূপ ছিল তাহা জানা যায়। "I attempted to shed English blood intentionally and of purpose as an humble protest against the inhuman trans-

portations and hangings of Indian youths." এমনি বিকৃত দেশসেবার আদর্শ!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গণেশ সবরকার নাসিক নগরে বালক ও যুবকদের মধ্যে বিপ্লব-চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। তিনি নাসিকে 'অভিনব ভারত' (Young India) নামে এক সঙ্ঘ স্থাপন করেন। এইখানে বিপ্লবাত্মক সাহিত্যপাঠ ও আলোচনা হইত। ম্যাটসিনির প্রবন্ধ ও জীবনী পাঠ ও মারাঠীভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহার প্রচার-চেষ্টা চলিত। ইতালির বিপ্লবকারীদের 'Young Italy' সমাজের নাম অনুকরণ করিয়া ইহারা Young India নাম দিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে গোপনে গোপনে হত্যাদির আয়োজন চলিতেছিল। বিনায়ক বিলাত হইতে বোমা তৈয়ারীর জন্য উপদেশ কপি করিয়া নানাস্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গণেশের বাড়ী খানাতাল্লাসীর সময় একখানি সাইক্লোষ্টাইলে কপিকরা বোমা-তৈয়ারীর উপদেশ পাওয়া গিয়াছিল; কলিকাতার মাণিকতলায় বোমা-তৈয়ারীর যে কপি পাওয়া যায় তাহা ইহারই অনুরূপ; তবে গণেশের কপিতে বিস্তর ছবি ও প্ল্যান দেওয়া ছিল। নাসিকের গুপ্ত-সমিতির কথা পুলিশের অজ্ঞাত থাকিল না। ১৯০৯ সালে গণেশ সবরকার 'লঘু অভিনব ভারত-মেলা' নামে কতকগুলি বিদ্রোহাত্মক কবিতা প্রকাশ করেন ও রাজদ্রোহী অপরাধে ধরা পড়িয়া শাস্তি পাইলেন। বিনায়ক ইংলণ্ডে অবস্থানকালে জ্যেষ্ঠের কারাদণ্ডের সংবাদ প্রাপ্ত হন। India Houseএ এই লইয়া খুবই গরম আলোচনা হইয়াছিল। তাহারই ফলে বোধ হয় ধিংড়া কয়েকদিন পরেই নিরপরাধ কার্জন-ওয়ালীকে হত্যা করিয়া 'শহীদ' (Martyr) হইলেন!

নাসিকে অভিনব ভারত

গণেশ সবরকারকে নাসিকের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাকসন্ শাস্তি দিয়াছিলেন। তখনকার বিপ্লবীদের কর্ম অধিকাংশ সময়ে প্রতিশোধ ও আতঙ্ক-সৃষ্টির জন্যই সাধিত হইত। তাহাদের ক্রোধ জ্যাকসন সাহেবের উপর পড়িল

এবং ১৯০৯ সালে ডিসেম্বর মাসে বিপ্লবীরা তাঁহাকে হত্যা করিল। ইতি-পূর্বে বিনয় সবরকার বিলাত হইতে কতকগুলি Browning পিস্তল একজন লোক মারফৎ গণেশকে পাঠাইয়া দেন; গণেশের গ্রেপ্তারের পূর্বে তিনি অন্যান্য বিপ্লবীদিগকে এই পিস্তলের সংবাদ জানান। যথাসময়ে সেগুলি হস্তগত হয় এবং তাহারই সাহায্যে জ্যাকসন্ সাহেব নিহত হন। এই ঘটনার পর চারিদিকে খুব ধরা পাকড় সুরু হয়। পুলিশ নাসিক-ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করিয়া ৩৮ জনকে চালান দিল; বিচারে ২৭ জনের নানাপ্রকার সাজা হয়। জ্যাকসনের হত্যার জন্য সাতজন ধরা পড়ে; তিনজন অপরাধীর ফাঁসি হয়।

নাসিকে ষড়যন্ত্র

নাসিক ষড়যন্ত্র মামলার সময়ে দেখা গেল মারাঠী বিপ্লবী-দল বিলাতের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিল; বাংলাদেশের বোমার কারখানায় প্রাপ্ত বোমা-তৈয়ারীর উপদেশ, নিজামের হায়দ্রাবাদে টিখের নিকট প্রাপ্ত কপি, গণেশের বাড়ীতে প্রাপ্ত কপি—সবগুলিই বিলাতে সবরকারের দ্বারাই প্রেরিত। গণেশের বাড়ীতে Frost লিখিত "Secret Societies of European Revolution 1776 to 1876" নামক একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। সে বইখানি বিপ্লবীরা খুব ভাল করিয়াই ব্যবহার করিয়াছিল দেখা গেল। বিলাত হইতে বিনায়ক ম্যাট্‌সিনির আত্মজীবনী অনুবাদ করিয়া, তদুপযোগী একটি ভূমিকা লিখিয়া জ্যেষ্ঠের নিকট পাঠাইয়া দেন। ১৯০৭ সালে তাহা মুদ্রিত হইয়া দেশ মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। বিনায়ক বিলাত হইতে অন্যান্য রাজদ্রোহাত্মক পুস্তিকাতে রাজনৈতিক হত্যা সমর্থন করিয়া,—ধিংড়া, ক্ষুদীরাম, কানাইলাল দত্ত প্রভৃতির আদর্শ উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করিয়া প্রচার করিতেছিলেন। চাঞ্জেরী রাও নামক এক ব্যক্তি এই সব পুস্তিকা ও বোমা-তৈয়ারীর কপি-সমেত বোম্বাইতে ধরা পড়ে। ইহার পর বিনায়ককে বৃটীশ পুলিশ

বিনায়ক সবরকার

ধরিয়া এদেশে আনিতেছিল; ফরাশীর এক বন্দরে তাহাদের জাহাজ থামে। বিনায়ক স্নানের ঘর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ফরাশীদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। জাহাজ হইতে পুলিশ দেখিল বিনায়ক পলাইতেছে, তাহারা ফ্রান্সে কোনো রাজনৈতিক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে অপারক; একজন ফরাশী-পুলিশ উৎকোচ লইয়া বিনায়ককে ধরিয়া বৃটীশ পুলিশের হস্তে সমর্পণ করে। বিনায়ককে ভারতে আনা হইল ও বিচারে তাঁহার অপরাধের জন্ত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হইল।

নাসিকের 'অভিনব ভারত' সমিতি বোম্বাই প্রদেশে মারাঠাজাতির মধ্যে বিপ্লবের আয়োজন করিয়াছিল বটে, কিন্তু দেশের মধ্যে তাহা প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। সবরকারদের বিপ্লবচেষ্টার পর মারাঠীরা বুঝিল যে, এরূপ ব্যর্থ কর্মে শক্তির অপব্যয় করিয়া কোনো লাভ নাই। সেই হইতে বিপ্লবকর্মে তাহারা যোগদান করে নাই।

দ্বিতীয় পর্ব

বাংলাদেশে বিপ্লব-চেষ্টা

বাংলাদেশে বিপ্লবভাব কিরূপে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা ইতিপূর্বেই বর্ণিয়াছি। এক্ষণে আমরা বাংলার বিপ্লব-কর্মের ইতিহাস অনুসন্ধান করিব। এদেশের বিপ্লবের 'ব্রহ্মা' বা স্রষ্টা হইতেছেন শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ। বারীন্দ্র স্বর্গীয় ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ (Dr. K. D. Ghosh) মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র; শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহারই জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন বিখ্যাত ইংরাজী কবি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত মনোমোহন ঘোষ। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ছিলেন ইঁহার মাতামহ। মাতামহের স্বাদেশিকতা দৌহিত্রদের মধ্যে বর্তাইয়াছে। অরবিন্দ যখন বড়োদা কলেজের অধ্যাপনা করিতেন, তখন বারীন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠের নিকট থাকিতেন। বারীন্দ্র কিরূপে বিপ্লবী-ভাবে মাতোয়ারা হইলেন, তাঁহার মনের নানা পরিবর্তনের ইতিহাস, তিনি তাঁহার আত্মকাহিনীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; এখানে সে সমস্ত ঘটনার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ১৯০২ সালে বারীন্দ্র বাংলাদেশে আসিয়া বিপ্লবকর্ম জাগ্রত করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা করেন ও কলিকাতায় শ্রীযুক্ত পি, মিত্রের সহিত যুক্ত হইয়া East club স্থাপন করেন; কিন্তু বারীন্দ্রের সহিত মতভেদ হওয়ায় মিত্র মহাশয় উহা ত্যাগ করেন। দেশের অবস্থা তখনো বিপ্লবের পক্ষে অনুকূল নয় বুঝিয়া তিনি ফিরিয়া যান। বিপ্লবযুগের পূর্বে সার্বজনীন বিপ্লবপন্থা অনুসরণ করিয়া গুপ্ত-সমিতি গঠন করিবার চেষ্টার মধ্যে নেতাদের একটি

বাংলার বিপ্লব-স্রষ্টা বারীন্দ্র

পদ্ধতি ছিল ; তাঁহারা কল্পনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে অন্ততঃ দশসহস্র স্বেচ্ছাসেবক ও একলক্ষ টাকার অস্ত্রাদি সংগৃহীত করিবার পর পাহাড় অঞ্চলে যুদ্ধের (base) মর্মপীট রচনা করিয়া তবে বৈপ্লবিক সমিতির অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিবেন ; এরূপ একটা সংযম তাহার মধ্যে বর্তমান ছিল। (প্রবর্ত্তক ১৩৩১ আশ্বিন)

১৯০৪ সালে বঙ্গচ্ছেদ লইয়া দেশে আন্দোলন উপস্থিত হইলে বারীন্দ্র পুনরায় বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিয়া বিপ্লব-কর্ম-সাধনে মন দিলেন। বাংলার প্রায় প্রত্যেক প্রধান সহরে ঘুরিয়া তিনি 'অনুশীলন-সমিতি' স্থাপন করেন।

অনুশীলন সমিতি

বিপ্লব-প্রচারকগণ কলিকাতায় এই কার্য্যে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলেন। লাঠিখেলা ও বিভিন্ন প্রকারের ব্যায়াম প্রবর্তনের জন্য প্রধানত এই সমিতিগুলি স্থাপিত হয় ; ভাব-চর্চার জন্যও তাঁহারা এই সমিতি গঠন করেন ; তাঁহারা সর্বদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস প্রভৃতি পঠন ও পাঠনের ব্যবস্থা করিতেন ; হত্যা পাপ নহে, মৃত্যু কিছু নয় ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য গীতা প্রভৃতি পাঠেরও ব্যবস্থা ছিল ; যুবক মনকে সতেজ ও ভয়হীন করিবার জন্য অশ্বারোহণ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারেরও ব্যবস্থা হইত ; এই সময়ে কলিকাতায় শ্রীযুক্ত পি, মিত্র মহাশয় বঙ্গদেশের বিপ্লববাদের নায়কত্ব করিতেন, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। বারীন্দ্রকুমার ১৯০৪ সালে কলিকাতায় আসিলেন ; নিরলম্ব-স্বামী বা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বসু, সখারাম গণেশ দেউস্কর, এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি এই সময়ে বৈপ্লবিক সমিতি সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন। বারীন্দ্রই ইহার নেতা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সহিত মতানৈক্য হওয়ায় নিরলম্বস্বামী বৈপ্লবিক দল ত্যাগ করেন ; বারীন্দ্রের প্ল্যান অনুসারে সমিতিগুলিতে যুবকদিগের ব্যায়ামচর্চা ও মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা চলিতে লাগিল। দুই বৎসর ধরিয়া এইরূপ কার্য্য করিয়া তিনি আশানুরূপ ফল পাইলেন না।

স্বদেশী আন্দোলনের উচ্ছ্বাস দেশব্যাপী হইতে থাকিলে বারীন্দ্র, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'যুগান্তর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিপ্লববাদের গোপনতা ত্যাগ করিয়া ইহার ভিতর দিয়া তাঁহারা বিপ্লব-ভাব প্রচার করিতে লাগিলেন। এই পত্রিকার ভাব ও ভাষা এতকাল যে-সব মামুলী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল—সেগুলি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শারীরিক শক্তির দ্বারা বৃটীশ শক্তিকে ধ্বংসিতে হইবে, এই মত প্রচারিত হইল। 'যুগান্তরে'র লেখকগণ লোককে বুঝাইতেন যে ধর্ম্মের জন্য হত্যা, পাপ নহে; গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন ইত্যাদি। গীতার ধর্মকে ইঁহারা হত্যাদি কর্মের সমর্থকরূপে ব্যবহার করিতেন এবং আত্মা অবিনশ্বর এই শিক্ষা দিয়া তাঁহারা যুবকদিগকে মৃত্যুভয়হীন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন। রাজনীতিক হত্যাকে আধ্যাত্মিক করিবার চেষ্টা হইল।

'যুগান্তর' পত্রিকা

বারীন্দ্র দেড় বৎসর 'যুগান্তর' পত্রিকা পরিচালন করিবার পর অন্যদলের উপর উহার সম্পাদনের ভার দিয়া স্বয়ং বিপ্লব-ভাব প্রচার করিতে সচেষ্ট হইলেন। ইতিপূর্বে শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, অবিনাশ, বিভূতি প্রভৃতি কয়েকজন যুবক ও বালক তাঁহার দলভুক্ত হইয়া প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে পশ্চিমবঙ্গের অনুশীলন সমিতিগুলি বিশেষভাবে গঠিত ও পুষ্টিত হইতে থাকে। শ্রীউল্লাসকর দত্ত নামে একজন যুবক শিবপুরে তাঁহার পিতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া গোপনে গোপনে বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক প্রস্তুত করিবার প্রণালী আয়ত্ব করেন; তিনি বলেন যে ১৯০৫ সালে বরিশাল প্রাদেশিক-সমিতিতে ইংরাজ রাজকর্মচারী ও পুলিশের

বারীন্দ্রের বিপ্লব কর্ম

অকথ্য অত্যাচার তাঁহার মনকে ক্ষুব্ধ করিয়া দেয়; সেই হইতে তিনি বিপ্লবী হইবার সাধনা আরম্ভ করেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কানুঙ্গু ইহার কিছুকাল পূর্বে তাঁহার বিষয়াদি বিক্রয় করিয়া ফ্রান্সে গিয়া বোমা প্রভৃতি প্রস্তুত, রুশীয় বিপ্লবপন্থীদের নিকট হইতে গুপ্তসমিতি স্থাপনাদি শিক্ষালাভ করিয়া আসেন। উল্লাসকর ও হেমচন্দ্র বারীন্দ্রের সহিত যোগ দিলেন।

মাণিকতলায় বোমার কারখানা

এই বিপ্লব-কর্মীদের 'নূতন দল' 'যুগান্তর'-পূর্বযুগের গোপন-বিপ্লবনীতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই; হেমচন্দ্র য়ুরোপ হইতে আসিয়া যেরূপভাবে গুপ্তসমিতি গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা গড়িতে পারেন নাই। বারীন্দ্রেরা নিজেদের অস্তিত্ব-জ্ঞাপনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বোমার বিশেষত্ব লইয়া বারীন্দ্র মনে করিয়াছিলেন গভর্ণমেণ্ট তাঁহার এই গুপ্ত শক্তিকে শতগুণ ভাবিয়া লইয়া মহাব্যস্ত হইয়া পড়িবেন ও এক মহাভীতির তাড়নায় উৎপীড়নে অগ্রসর হইবেন ও তখন দেশ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। এই ভাব লইয়া তাঁহারা তাড়াতাড়ি এক ষড়যন্ত্র পুষ্ট করিয়া তুলিলেন এবং কলিকাতার মাণিকতলার খালের পূর্বদিকে এক বাগানবাড়ীতে এক বোমার-কারখানা ও গুপ্তসমিতির আখড়া স্থাপন করিলেন।

কলিকাতার বারীন্দ্র-স্থাপিত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ঢাকার অনুশীলন-সমিতি ও চন্দননগরের সমিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকার বিপ্লব-কর্মের গুরু ও নেতা, এককথায় সর্বস্ব ছিলেন শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস; তাঁহার নেতৃত্বাধীনে সমগ্র পূর্ব-বঙ্গের বিপ্লবী-যুবকবৃন্দ একত্র হইয়াছিল। একমাত্র পুলিনবাবু প্রবর্তিত অনুশীলন-সমিতি 'যুগান্তর'-পূর্ব বৈপ্লবিক নীতি অনুসরণ করিয়া বৃহৎ সঙ্ঘ গঠনে তৎপর ছিলেন; 'যুগান্তর' প্রকাশের সহিত বাংলার বিপ্লবপন্থীদিগের রূপান্তরের প্রভাব ইঁহাদিগকে স্পর্শ করিলেও ইঁহারা সর্ববিষয়ে পুরাতন কাঠাম বজায় রাখিয়া 'শক্তি সঞ্চয়

ঢাকা ও চন্দননগরে বিপ্লব-কর্ম

করিতেছিলেন।' চন্দননগর ইংরাজ-রাজ্যের বাহিরে হওয়ায় সেখানে বিপ্লবীদের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল; অস্ত্র-সংগ্রহ, অস্ত্র-আমদানী প্রভৃতি কর্মে ইঁহাদের বিশেষ সুযোগ হইয়াছিল। ইঁহাদের সহিত ঢাকার অনুশীলন-সমিতির সংযোগ হয় ও উভয়ে Terrorism বা আতঙ্কসৃষ্টি-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু হত্যা-কর্ম ঢাকা সমিতি আত্ম-রক্ষা অর্থাৎ দলের স্বার্থ ও নিরাপদের জন্য গ্রহণ করিতেন। ক্রমে তাঁহারা চন্দননগরের সহিত মিলিত হইয়া Aggrersive হত্যা-কর্মে লিপ্ত হন। এই সমিতিসমূহের কীর্তিকাহিনী আমরা ক্রমশঃ জানিতে পারিব। (প্রবর্ত্তক)

স্বদেশী-অন্দোলনের প্রারম্ভে Press Act পাশ হয় নাই; সুতরাং ন্যায্য অন্যায্য সকল কথাই ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিবার কোনো বাধা ছিল না। বিপ্লববাদীরা ইহার সুযোগ লইয়া 'যুগান্তর'ও 'সন্ধ্যা' নামক একখানি দৈনিক পত্রিকার সাহায্যে দেশময় অনেক অপ্রিয় সত্য আলোচনা ও বিদ্বেষভাব প্রচার করিয়া দেশের যুবকদের মনকে উত্তেজিত ও বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। সাময়িক-সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য সাহিত্য-রচনা করিয়া বিপ্লববাদীরা যুগান্তর আনিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সব সাহিত্যের মধ্যে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত "বর্ত্তমান রণনীতি" ও বারীন্দ্রলিখিত "মুক্তি কোন্ পথে" "ভবানী মন্দির" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'মুক্তি কোন্ পথে' বাংলার বাহিরে গুজরাটী ভাষায় পর্য্যন্ত অনুদিত হইয়াছিল। 'ভবানী মন্দিরে' বিপ্লববাদের সকল কথা, গুপ্তসমিতি গঠনপ্রণালী, দেশীয় সৈন্য ভাঙ্গাইবার কথা, বোমার কথা—সমস্তই খুলিয়া বলিয়াছিল। এই সময়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে বাঙালীর নূতন শক্তি প্রকাশ পাইল; শত শত জাতীয় সঙ্গীত এই সময়ে রচিত হয়—সবগুলি সাহিত্যের দিক হইতে উচ্চ অঙ্গের না হইলেও, জাতীয় জীবনে যে নূতন শক্তি আবির্ভূত হইয়াছিল সেগুলি তাহারই পরিচায়ক—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ,

বিপ্লব-সাহিত্য

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি খ্যাত, ও অনেক অখ্যাত কবির সঙ্গীত ও কবিতা জাতীয়ভাব ও বিপ্লবভাব দেশময় প্রচারিত করিতে সহায়তা করিয়াছিল। 'যুগান্তরে'র প্রচার ও অনুশীলন-সমিতির কর্মচেষ্টার ফল অচিরে দেশমধ্যে দেখা দিল।

১৯০৬ সালে বিপ্লবকারীদের অস্তিত্বের প্রথম আভাস পাওয়া গেল। এই সময়ে দুই চারি জায়গায় সামান্য রকমের ডাকাতি হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ—তবে সেগুলি রাজনৈতিক কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

ডাকাতি ও হত্যার চেষ্টা

১৯০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলার ছোটলাট এণ্ড্রু ফ্রেজারের জীবন লইবার প্রথম চেষ্টা হয়। সে চেষ্টা ব্যর্থ হইলে মেদিনীপুর হইতে ছোটলাট যে স্পেশাল ট্রেণে আসিতেছিলেন তাহা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হয়। ট্রেণ লাইনচ্যুত হইয়া পড়ে ও যেখানে বোমা পড়িয়াছিল, সে স্থানটি প্রায় পাঁচ ফুট গর্ত্ত হইয়া যায়। বোমা ফাটিল বটে তবে তাহা ট্রেণ উড়াইবার মত শক্তিশালী ছিল না। ইহার দশ বৎসর পরে বাংলাদেশে এমন সব বোমা তৈয়ারী হইয়াছিল যাহার কয়েকটি, সরকারী মতে অর্দ্ধেক রেজিমেণ্ট ধ্বংস করিয়া দিতে পারিত। মেদিনীপুরের পথে বোমা ফাটিবার কয়েকদিন পরে নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমারে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ এলেনের জীবন লইবার চেষ্টা হয়; তিনি আহত হন।

১৯০৮ সালের প্রথমদিকে সামান্য ডাকাতির চেষ্টা এদিক সেদিকে হইয়াছিল। চন্দননগর ছিল বন্দুক, পিস্তল, টোটাগুলি প্রভৃতি সরবরাহের কেন্দ্র। এই ব্যাপারটি জানাজানি হইয়া

চন্দননগরে বোমা

পড়িলে চন্দননগরের 'মেয়রের' উপর এই আমদানী বন্ধ করিয়া দিবার জন্য চাপ পড়িল। ইহারই ফলে বোধ হয় তাঁহার বাড়ীতে একদিন এক বোমা পড়িল; বোমা ফাটিল, কিন্তু দৈবক্রমে সেখানে কোনো লোক না থাকায় কোনো হত্যাকাণ্ড হইল না।

স্বদেশী ও 'বয়কট' আন্দোলনের অবৈধ অংশ বন্ধ করিয়া দিবার জন্য সরকার ধর্ষণ-নীতি অবলম্বন করিলেন। সর্বপ্রথমে পঞ্জাবের নেতা লালা লাজপত রায় ও সর্দার অজিত সিংহকে রাওয়ালপিণ্ডি ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানের দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী করিয়া সরকার তাঁহাদিগকে নির্বাসিত করিলেন। এই ঘটনায় বাংলাদেশে উত্তেজনা কিছু কম হয় নাই। সেই সময়-কার জাতীয়দলের মুখপত্র ছিল "বন্দেমাতরম্"—ইংরাজী দৈনিক কাগজ। অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি ছিলেন ইহার সম্পাদকীয় সঙ্ঘে। 'বন্দেমাতরমে' পঞ্জাব-নেতাদের নির্বাসনের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ প্রকাশিত হইল। "বন্দেমাতরম্," 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি'র উপর সরকারের তীব্র দৃষ্টি সর্বদাই ছিল। ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে যুগান্তরের তথা-কথিত সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রাজদ্রোহ উত্তেজনার অপরাধে এক বৎসরের সশ্রম কারাবাসে প্রেরিত হইল। ইহার পর 'সন্ধ্যা'র বিরুদ্ধে পুলিশ লাগিলেন; 'সন্ধ্যা'-সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইলেন; কিন্তু মোকদ্দমা শেষ হইবার পূর্বেই হাসপাতালে ব্রহ্মবান্ধব মারা পড়িলেন। 'যুগান্তরে'র বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলা হইল। রাজদ্রোহাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য 'বন্দেমাতরমে'র সম্পাদকবোধে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিল। বিচারে অরবিন্দের বিরুদ্ধে অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণাভাব হওয়ায় তিনি মুক্তি পাইলেন; কিন্তু বিপিনচন্দ্র অরবিন্দের বিরুদ্ধে সরকারী আদালতে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় 'বিচারালয়ের অবমাননা' অপরাধে ছয়মাসের জন্য কারাগারে প্রেরিত হইলেন। বিপিনচন্দ্রের এই সৎসাহস দেশের সমক্ষে আদর্শস্বরূপ হইল। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা সম্পাদিত 'নবশক্তি'র মুদ্রাকরের রাজদ্রোহ অপরাধে জেল হইল।

সরকারের ধর্ষণ-নীতি

জাতীয় দলের ঘোর আন্দোলন ও বিপ্লববাদীদের বিপ্লবীভাব প্রচার এমনি বাড়িয়া চলিতেছিল যে সরকার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

১৯০৭ সালের ১লা নভেম্বর রাজদ্রোহজনক সভা-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইলে পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে প্রভূত ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। সেই সময় হইতেই পুলিশ চারিদিকে নানাপ্রকার ধর্ষণকার্য্য, উৎপীড়ন ও অবমাননা আরম্ভ করেন। কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ কিংসফর্দ রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতির অপরাধে কয়েকটি ছাত্রকে বেত্রাঘাত শাস্তি দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কিংসফর্দ 'বন্দেমাতরম্' 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলার বিচারক ছিলেন। বিপ্লবকারীদের মনে তখন প্রতিশোধ লইবার ভাবটাই প্রবল; সুতরাং তাহাদের কোপ নিরপরাধ বিচারক কিংসফর্দের উপর গিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে কিংসফর্দ মজঃফরপুরে চলিয়া যান। বিপ্লবকারীরাও তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য অনুধাবন করিল।

ধর্ষণ-নীতি ও কিংসফর্দ

কলিকাতার বিপ্লবীরা ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র চাকি নামে দুই জন কিশোর বালককে মজঃফরপুরে প্রেরণ করিলেন; তাহারা কিংসফর্দের গাড়ী ভুল করিয়া ব্যরিষ্টার কেনেডী সাহেবের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করিল। সেই গাড়ীতে মিসেস্ কেনেডী ও মিস কেনেডী ছিলেন; উভয়েই মারা পড়িলেন। দুই নিরপরাধ ইংরাজমহিলা হত্যাকারীদের হস্তে নিহত হইলেন। এই নিদারুণ ঘটনা ঘটিল ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ সালে। ক্ষুদিরাম ধরা পড়িল, তাহার সঙ্গী প্রফুল্ল চাকি পলায়নের চেষ্টা করিয়া ধরা পড়িবার সময়ে রিভলবার দ্বারা আত্মঘাতী হইল। কিংসফর্দের জীবন লইবার জন্য ইতিপূর্বেও চেষ্টা হইয়াছিল। বিপ্লবীরা একখানি পুস্তকের খোলের মধ্যে বোমা পুরিয়া একবার কিংসফর্দকে পাঠাইয়া দেয়; তিনি সেই বইএর প্যাকেটটি খোলেন নাই; ভাবিয়াছিলেন তাঁহার কোনো বন্ধু কিছুদিন পূর্বে যে একখানি বই লইয়াছিলেন এটি সেই বই। খুলিবার চেষ্টা করিলে বোমা ফাটিয়া যাইবার ব্যবস্থা ছিল। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লকে যে দারোগা

মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ড

গ্রেপ্তার করে, তাহাকে পর বৎসর বিপ্লবীরা কলিকাতায় হত্যা করিয়াছিল। কারণ আতঙ্কসৃষ্টিই ছিল তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। মজঃফরপুরের ঘটনা প্রকাশিত হইলে লোকে প্রথম জানিতে পারিল যে দেশের মধ্যে বিপ্লব-চেষ্টা চলিতেছে।

পুলিশ ভিতরে ভিতরে চর দ্বারা সংবাদ পাইয়াছিল যে একদল যুবক বিপ্লবকর্মে লিপ্ত আছে। পূর্বেই বলিয়াছি কলিকাতার মাণিকতলায় একটি বোমার কারখানা বারীন্দ্রেরা স্থাপন করিয়াছিল। দেওঘরেও ইঁহাদের একটি শাখা ছিল; সেখানে বিস্ফোরকের অনেক পরীক্ষা তাঁহারা করিতেন। সেইরূপ পরীক্ষা করিবার সময়ে একটি যুবক সেখানে মারা পড়িয়াছিল। অবশেষে নানা সুবিধা অসুবিধার মধ্য দিয়া গিয়া তাঁহারা মাণিকতলার আখড়াটিকে জাঁকাইয়া তুলিলেন। কিন্তু পুলিশও তাঁহাদের পিছনে ছিল। ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশ আর স্থির থাকিতে পারিল না। ২রা মে তারিখের ভোরের বেলা সশস্ত্র পুলিশ বোমার আখড়া ঘিরিয়া ফেলিল এবং বাছা বাছা সকল নেতাকেই একত্র ধরিয়া ফেলিল। এখানকার কাগজপত্র হইতে অনেক বিপ্লবীদের নাম ধাম সংগ্রহ করিয়া পুলিশ সর্বশুদ্ধ ৩৮ জন আসামীকে রাজদ্রোহ-অপরাধের বিচারের জন্য চালান দিল। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে প্রেরিত হইলেন। বিশিষ্ট বিপ্লবীদের মধ্যে কেহই বাদ পড়িলেন না; মফঃস্বল হইতে অনেক বিপ্লবী ধরা পড়িল; ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত।

মাণিকতলায় বোমা আবিষ্কার

নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ধনীর পুত্র ছিলেন, তিনি বিপ্লবে যোগদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জীবনকে অন্যদের ন্যায় কোনো আধ্যাত্মিক সাত্বিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। তিনি পুলিশের

প্ররোচনায় ও প্রাণভয়ে রাজসাক্ষী হইয়া পড়িলেন। তাহার চালচলন হাবভাব দেখিয়া বুদ্ধিমান বিপ্লবীদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে নরেন্দ্র তাহাদের সকলকে মজাইবে। নরেন্দ্র নির্বোধ-প্রকৃতির লোক ছিল; সুতরাং কথাবার্তার মধ্য দিয়া তথ্য-সংগ্রহ করিতে গিয়া তাহার গুপ্ত অভিপ্রায় সকলের কাছেই ধরা পড়িয়া গেল। তখন পুলিশ নরেনকে দল হইতে পৃথক করিয়া য়ুরোপীয়ান কয়েদী-বিভাগে রাখিল। নরেনের এই বিশ্বাসঘাতকতায় বিপ্লবীরা তাহার উপর সাতিশয় বিরক্ত হইল। চন্দননগর হইতে কানাইলাল নামে যে যুবকটি আসিয়াছিল সে অতিশয় শান্ত শিষ্ট প্রকৃতির ছিল। সে প্রায়ই বলিত যে 'দেশ মুক্ত হোক আর না হোক আমি হবো। বিশ বৎসর জেলখাটা আমার পোষাইবে না।'

কানাইলাল
ও সত্যেন্দ্রনাথ

সেকথার অর্থ তখন কেহ বুঝিতে পারে নাই। মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্র ক্ষয়রোগে ভুগিতেছিল; সে জানিত যে তাহার আয়ু শেষ হইয়া আসিতেছে। সত্যেন্দ্র ও কানাইলাল আরও তিনজন বিপ্লবীদের সহিত পরামর্শ করিয়া নরেন্দ্র গোস্বামীকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিল। জেলে বসিয়া আবদ্ধ বিপ্লবীরা বাহিরের বিপ্লবপন্থীদের সহিত সকল রকম পরামর্শ, ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতির ব্যবস্থার বিষয় আলোচনা করিতেন; কর্মচারীদের চক্ষে ধুলি দিয়া এই সব চলিত। সেই পথ দিয়া তাঁহাদের হস্তে রিভলবার পৌঁছিল। নরেন্দ্রকে হত্যা করিবার পরামর্শের মধ্যে বারীন্দ্র ছিলেন না; তিনি কেমন করিয়া জেল হইতে বাহির হইয়া পলায়ন করা যায়, কেমন করিয়া বিপ্লব সৃষ্টি করা যায় ইত্যাদি অতি উদ্ভট রকমের কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সলা-পরামর্শ করিতেছিলেন। সত্যেন্দ্র অসুস্থ বলিয়া হাসপাতালে থাকিত; কানাইও অসুস্থতার ভাণ করিয়া একদিন আরোগ্য-শালার আশ্রয় গ্রহণ করিল। একদিন সত্যেন্দ্র নরেন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইল যে জেলের কষ্ট তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে, সে রাজসাক্ষী হইতে চায়;

সেইজন্য নরেন্দ্রের সহিত সে পরামর্শ করিতে চায়। নরেন্দ্র সত্যেনের ওয়ার্ডে আসিয়া কথাবার্তা কহিতেছে, এমন সময়ে সহসা সত্যেন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল। গুলি লাগিল বটে তবে সামান্য আঘাত। কানাই গুলির আওয়াজ শুনিয়া পিস্তল লইয়া বাহিরে আসিল; নরেনকে পালাইতে দেখিয়া তাহার পিছন পিছন ছুটিয়া ও গুলির পর গুলি করিয়া নরেন্দ্রকে হত্যা করিল। নরেন্দ্র মরিয়া গিয়াছে দেখিয়া সে সহজে আত্ম-সমর্পণ করিল। এই ঘটনায় সমস্ত দেশ অবাক্ হইয়া গেল—জেলের মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। নরেন্দ্রের হত্যা-মামলা হইল। কানাই ও সত্যেনের ফাঁসির হুকুম হইল। কানাই ফাঁসির হুকুম পাইবার পর নিশ্চিন্ত মনে দিনযাপন করিয়াছিলেন এবং যেদিন তাঁহার ফাঁসি হইল, সেদিন তাঁহাকে নাকি ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গাইয়া উঠাইতে হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। কানাইএর মৃতদেহ শোভাযাত্রা করিয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়; সে নরহত্যা করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিয়া দেশবাসীর কাছে শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য পাইল; বহু সহস্র নরনারী তাহার অমর আত্মার উদ্দেশ্যে তাহার নশ্বর দেহের উপর ফুলচন্দন, গীতা অর্পণ করিল। এই দিনের ব্যাপার দেখিয়া সরকার বুঝিলেন যে দেশের লোকের মনের মধ্যে কতখানি পরিবর্তন আসিয়াছে। তাঁহারা সত্যেনের দেহকে আলিপুর জেলের প্রাঙ্গণেই দাহ করিলেন।

রাজসাক্ষী নরেন্দ্র গোঁসাইএর হত্যা

দীর্ঘ একবৎসর ধরিয়া বোমার মোকদ্দমা আলিপুরের কাছারীতে চলিল; এই দীর্ঘকালই আসামীদের জেলে থাকিতে হইল। এই সময়ে বিপ্লবী বালক ও যুবকদের ব্যবহার ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অরবিন্দ তাঁহার 'কারাকাহিনী'তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলেই সেই সময়ের নিখুঁত ছবি পাওয়া যাইবে। "কোর্টে ইহাদের আচরণ দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি বঙ্গে নূতন যুগ আসিয়াছে, * * * এই বালকগণকে

দেখিয়াই বোধ হইত যেন অন্যকালের অন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত উদারচেতা দুর্দান্ত তেজস্বী পুরুষসকল আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেই নির্ভীক, সরল চাহনি, সেই তেজপূর্ণ কথা, সেই ভাবনাশূন্য আনন্দময় হাস্য, এই ঘোর বিপদের সময়ে সেই অক্ষুণ্ণ তেজস্বিতা, মনের প্রসন্নতা, বিমর্ষতা বা ভাবনা বা সন্তাপের অভাব—সেকালে তমঃক্লিষ্ট ভারতবাসীর নহে। নূতন যুগের নূতন জাতির, নূতন কর্ম-স্রোতের লক্ষণ। * * * তাঁহারা ভবিষ্যতের জন্য বা মোকদ্দমার ফলের জন্য লেশমাত্র চিন্তা না করিয়া কারাবাসের দিন বালকের-আমোদে, হাস্যে, ক্রীড়ায়, পড়াশুনায়, সমালোচনায় কাটাইয়াছিলেন। তাঁহারা জেলের সকলের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছিলেন।" বিচারের সময়ে অনেকে পড়াশুনা করিতেন; জীবন মরণ লইয়া কৌন্সিলী ব্যারিষ্টার টানাটানি করিতেছেন—আর যাহাদের ভাগ্য মরণদোলায় দুলিতেছে তাহারা নিশ্চিন্ত মনে পাঠ করিতেছে। (কারাকাহিনী)

আসামীদের মনোভাব

১৯০৯ সালের মে মাসে—অর্থাৎ মাণিকতলায় ধরা পড়িবার একবৎসর পরে—মোকদ্দমার রায় বাহির হইল। উল্লাসকর ও বারীন্দ্রের ফাঁসির হুকুম হইল। উপেন্দ্র, হেমচন্দ্র, বিভূতি, অবিনাশ, হৃষীকেশ প্রভৃতি অন্যান্যদের দ্বীপান্তর হইল অনেকের জেল হইল। আপীলে উল্লাসকর ও বারীন্দ্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল।

ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিল, প্রফুল্ল চাকি আত্মঘাতী হইল; বারীন্দ্র প্রভৃতি প্রধান পাণ্ডারা দ্বীপান্তরিত হইলেন; অন্যেরা নানা কালের জন্য কারাবাসে প্রেরিত হইল। অরবিন্দ, দেবব্রত মুক্তি পাইলেন বটে, তবে উভয়ে সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন। অরবিন্দ পঁদিচেরীতে অজ্ঞাতবাসে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন—দেবব্রত হিমালয়ের মঠে

বোমার মামলার শাস্তি

আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আলিপুর বোমার মামলার মীমাংসা সরকার করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু দেশ শাস্তির দৃষ্টান্ত দেখিয়া শান্ত হইল না— বিপ্লবকারীরা তখনো দলে পুষ্ট। পূর্বেই বলিয়াছি মাণিকতলার আসামীরা আলিপুরে বন্দী অবস্থায় বাহিরের বিপ্লবীদের সহিত যোগরক্ষা করিয়াছিলেন—নতুবা কানাই সত্যেন পিস্তল কোথা হইতে পাইবে। বোমার মামলা যখন চলিতেছে সেই সময়েই কয়েকটি হত্যাকাণ্ড হইল। কানাই ও সত্যেনের মামলায় সরকারী পক্ষের উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পুলিশ কোর্টের সম্মুখে একজন বিপ্লবী হত্যা করিল।

আশুতোষ বিশ্বাস ও অন্যান্য খুন

১৯০৮ সালে নভেম্বর মাসে নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক যে সবৃইন্সপেক্টর ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লকে ধরিয়াছিল—তাহাকে বিপ্লবীরা কলিকাতায় সারপেণ্টাইন লেনে হত্যা করিল। ঐ মাসেই ঢাকা অনুশীলন সমিতির জনৈক সভ্য সমিতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হওয়ায় বিপ্লবীরা তাহার প্রাণ লইল; বোধ হয় আরও দুইটি হত্যা ঐজন্যই সাধিত হইয়াছিল। মোট কথা দেশের মধ্যে আতঙ্ক-সৃষ্টি ও প্রতিশোধ লইবার জন্য এই সময়ে অনেকগুলি হত্যা কলিকাতার বিপ্লবীরা করিয়াছিলেন; ঢাকার অনুশীলন সমিতি, তাহাদের মতে যাহারা সমিতির অনিষ্টকারী বলিয়া নির্দিষ্ট হইত— তাহাদিগকে হত্যা করিত।

বাংলাদেশের নানাস্থানে রাজনৈতিক ডাকাতি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। বিপ্লবকারীদের আত্মকাহিনীতে অনেকে

রাজনৈতিক ডাকাতি

লিখিয়াছেন যে টাকার প্রয়োজন ছিল নানা কারণে; প্রথমত হত্যা ও বিপ্লব করিবার জন্য রসদাদি ক্রয় বা সংগ্রহ; দ্বিতীয়ত গৃহছাড়া বিপ্লবকারীদের আহারাদি ব্যয়; তৃতীয়ত মামলার সময়ে তদ্বিরের ব্যয়; শেষাশেষি তাহারা মোকদ্দমার জন্য আর অর্থ নষ্ট করিত না। ১৯০৮ সালে যে

কয়টি ডাকাতি অর্থ-সংগ্রহের জন্য হয়, তাহার মধ্যে ঢাকা জিলার 'বড়া' গ্রামের এক ধনীর গৃহে ডাকাতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৫০ জন যুবক পিস্তলাদি লইয়া নৌকা করিয়া গিয়া প্রায় ২৫।২৬ হাজার টাকা লুণ্ঠন করিয়া আনে। এইখানে একজন গ্রাম্য চৌকিদার নিজ কর্তব্য করিতে গিয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল। ইহা ঢাকার অনুশীলন-সমিতির দ্বারা সাধিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ঐ বৎসরেই পূজার কাছাকাছি সময়ে ফরিদপুর জিলায় আর একটি বড় রকমের ডাকাতি হয়। এ ছাড়া আরও কয়েকটি ছোট ছোট লুটতরাজ মৈমনসিংহ, বরিশাল ও হুগলীতে হয়।

রাজনৈতিক হত্যা

ডাকাতি ব্যতীত সাহেব হত্যার চেষ্টাও হইয়াছিল; সেসব চেষ্টা সম্পূর্ণ নিরর্থক ও সৌভাগ্যক্রমে ব্যর্থ হইয়াছিল। কলিকাতার নিকট রেলগাড়ীতে সাহেব হত্যা করিবার জন্য কয়েকবার গাড়ীর মধ্যে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ১৯০৮ সালের ৭ই নভেম্বর কলিকাতার Y. M. C. Aর ওভার্টুন হলে একটি সভায় ছোটলাট এণ্ড্রু ফ্রেজারকে একজন যুবক হত্যা করিবার চেষ্টা করে। সৌভাগ্যক্রমে রিভলবার খারাপ থাকায় গুলি বাহির হয় নাই। অপরাধীর দশবৎসর কারাবাস হয়।

১৯০৮ সালের শেষাশেষি সময়ে ভারতসরকার নূতন ফৌজদারী বিধি প্রণয়ণ করিয়া বিপ্লবকারীদের জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বিশেষ আইন; বে-আইনী সভা

নিয়ম হইল যে হাইকোর্টের তিনজন জজ জুরি বা এসেসর না রাখিয়া বিচার করিতে পারিবেন। এ ছাড়া সরকার কতকগুলি সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন; ঢাকার 'অনুশীলন-সমিতি', বরিশালের 'বান্ধব-সমিতি', ফরিদপুরের 'ব্রতী-সমিতি', মৈমনসিংহের 'সুহৃদ্‌-সমিতি ও 'সাধন-সমিতি' বে-আইনী হইল।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ঢাকার অনুশীলন-সমিতি ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য

বৈপ্লবিক সমিতিগুলির কার্য্যপদ্ধতি কলিকাতার বারীন্দ্র প্রভৃতির কার্য্য প্রণালী হইতে পৃথক ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শ্রীযুক্ত পি, মিত্র যখন দেশের নানাস্থানে শারীরিক ব্যায়ামের জন্য আখড়া করিতেছিলেন,

ঢাকা সমিতি ও পুলিন দাস

তখন শ্রীপুলিনবিহারী দাস ঢাকার যুবকদের নেতা। পুলিনবিহারী ১৯০৩ সালে লাঠিখেলা শিক্ষা করেন। সেই সময়ে মার্তাজা নামক একজন বিখ্যাত লাঠিয়াল ও বাজীকরকে ঢাকায় লর্ড কর্জনের বিনোদনের জন্য নবাব সাহেব নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। পুলিন তাহার নিকট হইতে লাঠি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, ও পরে ঐ বিদ্যা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করিবার জন্য তাহার চেলাগিরি করিতে আরম্ভ করেন। শোনা যায় মার্তাজা ঠগীদের নিকট হইতে নানারূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পুলিন সেই সমস্ত বিদ্যা ধীরে ধীরে অভ্যাস করিয়া আয়ত্ব করিলেন। স্বদেশীযুগের আরম্ভ হইতে পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ দেখা দিয়াছিল। পুলিন হিন্দুদের আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য শারীর-সাধন নিমিত্ত কলিকাতার অনুশীলন-সমিতির ন্যায় অনুরূপ সমিতি স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করেন। পুলিনবিহারী লাঠি ও অন্যান্য ব্যায়াম শিক্ষা দিবার জন্য 'অনুশীলন-সমিতি' স্থাপন করিলেন; দলে দলে যুবক আসিয়া লাঠিখেলা শিখিতে লাগিল। ইঁহারই চেষ্টায় ঢাকার বিভিন্ন আখড়ার মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয় ও তাহা দেখিবার জন্য গণ্যমান্য ভদ্রলোক আসিতেন। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের নানাস্থান হইতে

পূর্ববঙ্গে অনুশীলন-সমিতি

'অনুশীলন-সমিতি' স্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ আসিতে লাগিল এবং ১৯০৬ হইতে ১৯০৮ সালের মধ্যে ঢাকা-সমিতির অধীনে প্রায় (৫০০) পাঁচশত সমিতি ও প্রায় ৩০, ০০০ সভ্য সঙ্ঘবদ্ধ হইল। এই সংগঠনের মূলে ছিল মুসলমানদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা; পরে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিপ্লব ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল।

পুলিনবিহারী বালক ও যুবকদের লইয়া যে সংগঠন কার্যে লিপ্ত থাকেন, তাহা সরকার, ঢাকার মুসলমানেরা এবং কোনো কোনো হিন্দু-অভিভাবক পর্যন্ত পছন্দ করিতেন না। দুই দুইবার লোকে তাঁহার বিরুদ্ধে 'ছেলে চুরি'র মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাঁহাকে হয়রান করে। সরকারও বুঝিয়াছিলেন যে এই যুবক দেশের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করিতেছে এবং 'অনুশীলন-সমিতি' ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া বৈপ্লবিক হইয়া উঠিতেছে। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের একরাত্রে ২৫০ জন গুর্খা তাঁহার বাড়ী ঘেরাও করিল ও পুলিশ বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া পুলিনকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। সরকার এই সময়ে ধর্ষণনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন ; শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বসু, সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতির সহিত পুলিনবিহারীও ১৮১৮ সালে ৩নং রেগুলেশন অনুসারে নির্বাসনে প্রেরিত হইলেন। চৌদ্দমাস নির্বাসনে বাস করিয়া ১৯০৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী পুলিন মুক্তি পাইলেন। পূর্ববঙ্গে সমিতিগুলি পুনরায় গুপ্তভাবে সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। বিপ্লবকারীরা জিনিষপত্র, বন্দুক, পিস্তল, কার্তুজ প্রভৃতি গুপ্তস্থানে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। পুলিশও ইহাদের খোঁজ রাখিত। ১৯১০ সালের জুলাই মাসে ৪৪ জন বিপ্লবীকে ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলায় আসামী করা হইল। পুলিনবিহারীও ইহাদের সহিত ধরা পড়িলেন। বিচারে ১৫ জনের দুই হইতে সাতবৎসর সশ্রম কারবাসের আদেশ হইল। পুলিনবিহারীর সাতবৎসরের জন্য দ্বীপান্তর হইল ; বিচারাধীন অবস্থায় তাঁহারা দুই বৎসর হাজতে বাস করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় পূর্ববঙ্গের বিপ্লবীদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল।

পুলিনবিহারীর নির্বাসন

ঢাকার ষড়যন্ত্র মামলা

পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবীরা বিঘাটি, রৈতা, মোড়েহল, নেত্র, হলুদবাড়ী প্রভৃতি

কয়েকটি ডাকাতি করে বলিয়া প্রকাশ। হাওড়ার পুলিশ প্রায় ৫০ জন লোককে বিপ্লব অপরাধে চালান করিয়াছিল। এই মামলায় ছয়জনের শাস্তি হইয়াছিল। ইহার পর ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতার কাছাকাছি বিপ্লবীদের আর কোনো উপদ্রব হয় নাই। এগুলি ছাড়া খুলনায় একটি ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে; ইহাতে ১৭ জন আসামী অভিযুক্ত হয়; হাইকোর্টে ইহারা অপরাধ স্বীকার করায় মুক্তি লাভ করে।

এই সমস্ত মামলা ও শাস্তি হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে ডাকাতি খুন বিশেষ কমিল না। বেশ বুঝাগেল বিপ্লবীদের দল তখনও পাতলা হয় নাই। ১৯১০, ১১, ১২ সালে সর্বত্র বিপ্লবীদের হাত দেখা যাইতেছিল। ঢাকার ষড়যন্ত্র-মামলার একজন প্রধান সাক্ষী ছিল মনোমোহন দে। বিপ্লবীরা ১৯১১ সালে তাহাকে হত্যা করিল; মৈমনসিংহের সবইন্সপেক্টর রাজকুমার, গোয়েন্দা-পুলিশ শ্রীশ চক্রবর্ত্তীকে ঐ বৎসরেই তাহারা প্রকাশ্য-স্থানে হত্যা করিল। হত্যাকারীরা কোনো ক্ষেত্রেই ধরা পড়িল না। ১৯১১ সালে ভারতসরকার রাজদ্রোহসূচক সভা বন্ধ করিবার জন্য বিশেষ এক আইন বিধিবদ্ধ করিলেন; ইহাতে রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশেষ ক্ষতি হইল। কিন্তু বিপ্লবীরা গোপনপথে চলিত, তাহাদের গুপ্তকর্ম বন্ধ হইল না। এই বৎসরের ডিসেম্বর মাসে ভারতসম্রাট্ এদেশে আগমন করেন ও বঙ্গচ্ছেদ রদ করিয়া খণ্ডিত বঙ্গ মিলিত করিলেন। কিন্তু ইহাতে রাজনৈতিক আন্দোলন বা বিপ্লবকারীদের উপদ্রব কিছুই কমিল না। রৌলট কমিটির প্রতি-বেদন অনুসারে ১৯১২ সালে বাংলাদেশে ১৪টি রাজ-নৈতিক ডাকাতি ও হত্যা, ১৯১৩ সালে ১৬টি, ১৯১৪ সালে ১৭টি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ১৯১৩ সালে কলিকাতার গোলদিঘিতে সন্ধ্যার সময়ে গোয়েন্দা-পুলিশ হরিপদ দেব বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ দিল; ইহারই পরদিন মৈমন-সিংহে ছোট-দারোগা বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী বোমার দ্বারা নিহত হইল। এই

রাজনৈতিক হত্যা

ব্যক্তি ঢাকা-সমিতির বিরুদ্ধে অনেক কাজ করিয়াছিল বলিয়া বিপ্লবীদের কোপ ইহার উপর পড়িয়াছিল।

এই সময়ে শ্রীহট্টে ঠাকুর দয়ানন্দ নামক একজন সন্ন্যাসী এক ধর্মান্দোলন করিতেছিলেন। একদল লোক এই আন্দোলনের বিরোধী ছিল; সরকার তাহাদের পক্ষ লইয়া এই আন্দোলনকে অশ্লীল অবৈধ বলিয়া প্রচার করেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা তখন দীর্ঘকালব্যাপী এক অহোরাত্র কীর্তন করিতেছিলেন; পুলিশ তাঁহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য সশস্ত্র উপস্থিত হন; সঙ্গে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গর্ডন ছিলেন। সন্ন্যাসীদের উপর অকথিত অত্যাচার হয়। বিপ্লবীরা এই গর্ডনকে হত্যা করিবার জন্য একজন যুবককে বোমা লইয়া প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু বোমা ফাটিয়া সে স্বয়ং মৌলবী বাজারে মারা পড়িল। এই ব্যাপার তদন্ত করিতে গিয়া পুলিশ কলিকাতার কয়েকজন বিপ্লবীর নাম সংগ্রহ করে ও সেই বিষয়ে সন্ধান করিতে গিয়া তাহারা ২৬০।১ অপার সার্কুলার রোডের (রাজাবাজারে) এক বাড়ীতে এক বোমার কারখানা আবিষ্কার করিল। এই রাজা বাজারের আখড়া হইতে বোমা তৈয়ারী হইয়া ভারতের সকল বিপ্লব-কেন্দ্রে প্রেরিত হইত। ১৯১২ সালে ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে মেদিনীপুরে এক রাজসাক্ষীর বাড়ীতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়; ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীতে বড়লাট হার্ডিংএর উপর চক হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়; মৌলবী বাজারের বোমাও রাজাবাজারের কারখানায় নির্মিত; মৈমনসিংহের বোমা রাজাবাজার হইতেই প্রেরিত হইয়াছিল। রাজাবাজার বোমার মোকদ্দমায় সকলে বুঝিতে পারিলেন যে বঙ্গের বিপ্লব এখন বাংলাদেশের মধ্যে আবদ্ধ নহে—উহা সমস্ত উত্তর-ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাজাবাজার বোমার ব্যাপার আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে বরিশালে একটি ষড়যন্ত্র পুলিশ ধরিয়া ফেলে; ২৬ জন আসামীর মধ্যে সেখানে ১২ জনকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া

রাজাবাজার বোমার আড্ডা

শাস্তিদান করা হইয়াছিল। বরিশালের দল ঢাকার অনুশীলন-সমিতির সহিত যুক্ত হইয়া কাজ করিত।

যুদ্ধারম্ভে বিপ্লবী উপদ্রব আরম্ভ

১৯১৪ সালে জুলাই মাসে য়ুরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হইল। বিপ্লবীরা বুঝিল যে ইংরাজ এখন বিব্রত হইবে, সুতরাং এরূপ স্বর্ণসুযোগ ত্যাগ করা নহে। পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবীদল ১৯১২ সালের হাবড়া ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার পর কিছুকাল শান্ত ছিল। এই সময় হইতে তাহারা পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ডাকাতি ইত্যাদি কর্মে লিপ্ত হয়। এই সময়ে বাংলার বিপ্লবীদলের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক যুবকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে অনুশীলন-সমিতি ব্যতীত বাংলার অন্যান্য খণ্ডশক্তি তখনকার মত সম্মিলিত হইল। সমগ্র বাংলার বিপ্লববাদীরা এক হয় নাই। যাহাই হউক বিপ্লবীরা অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থসংগ্রহে বিশেষভাবে মন দিল। ভারতের বাহির হইতে অস্ত্রাদি আনয়নের কিরূপ চেষ্টা চলিতেছিল তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। কলিকাতার বিখ্যাত বন্দুক ও অস্ত্র-বিক্রেতা রডা (Rodda) কোম্পানী হইতে বিপ্লবীরা আগ্নেয়াস্ত্র সরাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ভ্যান্সিটার্ট রোডে কোম্পানীর বন্দুকের গুদাম। ২৬শে আগষ্ট তাঁহাদের জনৈক কর্মচারী কাষ্টামহৌস হইতে বন্দুক ও টোটা প্রভৃতি পূর্ণ ২০২টি পেটি খালাস করে। ইহার মধ্যে ১৯২টি বাক্স গুদামে রাখিয়া অবশিষ্ট দশটি লইয়া সে নিরুদ্দেশ হইয়া পড়ে ও যথাসময়ে বিপ্লবীদের হস্তে সেগুলি সমর্পণ করে। বাক্স দশটিতে ৪০টি Mauser Pistol ও ৪৬,০০০ গুলি ছিল। মসার পিস্তলগুলির একটু বিশেষত্ব ছিল—সেগুলিকে ইচ্ছা করিলে সাধারণ বন্দুকের ন্যায় কাঁধে লাগাইয়া গুলি করা যায়। এই শ্রেণীর এতগুলি পিস্তল ও টোটা বিপ্লবীদের হস্তগত হওয়ায় তাহাদের শক্তি ও উপদ্রব খুবই বাড়িয়া গেল।

রডা কোম্পানি হইতে বন্দুক চুরি

১৯১৪ সালের প্রথমদিকে কলিকাতায় দিনের বেলায় চিৎপুর গ্রেষ্ট্রীট্-এর মোড়ে গোয়েন্দা-বিভাগের দারোগা নৃপেন্দ্র ঘোষকে কয়েকজন বিপ্লবী হত্যা করে। পুলিশ নির্মলকান্ত নামে একজন যুবককে সেখানে ধরে এবং চালান দেয়। হাইকোর্টে তাহাকে দোষী প্রমাণিত করিবার জন্য পুলিশ দুই দুইবার অভিযোগ আনয়ন করে, কিন্তু জুরীরা দুইবারই 'নির্দোষ' বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ব্যরিষ্টার মিঃ নর্টনের জেরা ও যুক্তিতে পুলিশের অনেক কুকীর্ত্তি এই সময়ে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কলিকাতার ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিশ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জীবন লইবার জন্য বিপ্লবীরা বহুকাল হইতে চেষ্টা করিতেছিল। কিছুকাল পূর্বে ঢাকায় তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা হয়; এই বৎসরও বিপ্লবীরা কলিকাতায় তাঁহার বাটীতে বোমা নিক্ষেপ করে; কিন্তু অন্যান্য লোক মারা পড়িল, বসন্তবাবু সে যাত্রায় বাঁচিয়া গেলেন; কিন্তু বিপ্লবীদের চর সর্বদাই তাঁহার পিছন ফিরিতে লাগিল। সরকারী অনুমান যে এই কীর্ত্তি ঢাকার অনুশীলন-সমিতির সভ্যদের, এবং যে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা চন্দননগর হইতে সংগৃহীত।

পুলিশ খুন

১৯১৫ সাল হইতে যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীনে কলিকাতার বিপ্লবীদল বিশেষভাবে কর্মশীল হইয়া উঠিল। এই সময়ে কলিকাতায় মোটর-ডাকাতি সুরু হয়। বার্ড কোম্পানীর প্রায় ১৮,০০০৲ টাকা তাহারা মোটরের সাহায্যে ডাকাতি করিয়া লয়। এই ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে বেলিয়াঘাটার এক ধনী চাল-ব্যবসায়ীর গদি হইতে ২০,০০০৲ টাকা লুণ্ঠন করিয়া বিপ্লবীরা মোটরকার করিয়া পলায়ন করে। পরদিন পথিমধ্যে মোটর-চালকের এক মৃতদেহ পাওয়া যায়, এ ছাড়া ডাকাতির আর কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। ইহারই এক সপ্তাহ পরে সব্-ইন্সপেক্টর সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চিত্তপ্রিয় ঘোষ নামক জনৈক ফেরারী-বিপ্লবীকে দেখিতে পাইয়া যেমন তাহাকে ধরিতে যাইবেন—অমনি

মোটর ডাকাতি

আততায়ীর গুলিতে সেইখানেই তিনি প্রাণ দিলেন। ঘটনাটি কলিকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বেলা দশটার সময় ঘটিল; বিপ্লবীকে কেহই ধরিতে পারিল না।

১৯১৪ সালের পূর্ব হইতেই বাহিরের সাহায্য লইয়া ভারতবর্ষের বিপ্লব-চেষ্টাকে সফল ও ভীষণ করিবার আয়োজন চলিতেছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে জার্মান জাতি যখন ইংরাজের শত্রু হইল, তখন এই শত্রুপক্ষের সাহায্য লইয়া ভারতের কোন সুবিধা হয় কিনা তাহা বিপ্লবীরা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সে ইতিহাস আমরা পরে বিবৃত করিয়াছি। য়ুরোপীয় যুদ্ধের জন্য ভারতের খাস ইংরাজসৈন্য ও ভারতীয় শিক্ষিত সৈন্য অধিকাংশই বিদেশে প্রেরিত হইল; ভারতবর্ষ রক্ষার ভার পড়িল অশিক্ষিত Territorial ও Volunteerদের উপর। বিপ্লবীরা দেখিল এই একটা সুযোগ। প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা বিদেশে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল, এবং ভারতে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময়ে দলে দলে পঞ্জাবীরা ভারতবর্ষ স্বাধীন করিবার কল্পনা লইয়া আমেরিকা হইতে ভারতে ফিরিতেছিল। পঞ্জাবে বিপ্লবায়োজন চলিতে-ছিল। বাংলাদেশে যতীন্দ্রনাথ এই আয়োজনের মূলে ছিলেন। উড়িষ্যার

যতীন্দ্রনাথ ও
বৈদেশিক সাহায্য

মহানদীর মোহনার কাছে জার্মানদের প্রেরিত বন্দুক গোলাগুলি নামাইবার কথা হয়। বিপ্লবীরা বালে-শ্বরে Universal Emporium নাম দিয়া এক দোকান খুলিয়াছিল ও সেইখানে তাহাদের একটি আখড়া স্থাপন করিয়া-ছিল। পুলিশ ইহাদের উদ্দেশ্যের সন্ধান পায় এবং উক্ত দোকান খানাতল্লাসী করিয়া অনেক বিপ্লবী-তথ্য সংগ্রহ করে। বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট সংবাদ পাইলেন যে এম্পারিয়ামের প্রধান প্রধান পাণ্ডারা ধরা পড়েন নাই, তাহারা ময়ূরভঞ্জের পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া তিনি সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্য লইয়া তাহাদের আক্রমণ

করেন। এই ক্ষুদ্র বিপ্লবীদল পুলিশের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়াছিল। চিত্তপ্রিয় ঘোষ এই খণ্ড-যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে, যতীন্দ্রনাথ ও আর একজন বিপ্লবী সাংঘাতিকরূপে আহত হন ও হাসপাতালে গিয়া মারা যান। দুইজন জীবন্ত ধরা পড়েন।

কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বিপ্লবীদের হত্যা ও লুণ্ঠনাদি কার্য্য পূর্ণবেগেই চলিতেছিল। মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীটে একজন পুলিশ কর্মচারী বিপ্লবীদের হস্তে প্রাণ দিল। চাউলপটীতে একটি বড় রকম ডাকাতি হইল; কলিকাতার বাহিরে বিপিন গাঙ্গুলীর নেতৃত্বাধীনে কয়েকটি ডাকাতি হইল অবশেষে আগড়পাড়ার এক ডাকাতিতে সে ধরা পড়িল। পুলিশকে সাহায্য করার অপরাধে এক ব্যক্তিকে বিপ্লবীরা তাহার বাড়ীতে গিয়া বাড়ীর দরজায় ডাকিয়া হত্যা করিল ও নিরাপদে পলায়ন করিল। মফঃস্বলের সবচেয়ে বড় দুঃসাহসিক ডাকাতি নদীয়াজেলার অন্তর্গত পরাগপুর ও শিবপুরে হইয়াছিল। কোনো স্থানে ডাকাতি করিতে যাইবার পূর্বে বিপ্লবীদিগকে সেইস্থান সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইত। স্থলপথ, জলপথ, রেলপথ, বনজঙ্গল, খালবিল প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ের অত্যন্ত খুঁটিনাটি খবর লইয়া তাহারা এই কার্য্যে লিপ্ত হইত। পরাগপুরের ডাকাতির জন্য কলিকাতা হইতে পিস্তল গুলি, সিন্দুক-ভাঙ্গা-যন্ত্র, প্রভৃতি প্রেরিত হইয়াছিল। ডাকাতি করিয়া ফিরিবার সময়ে পথ ভুল হয়। পুলিশ-দারোগা গ্রামবাসীদের সাহায্য লইয়া ডাকাতদের তাড়া করে। উভয়পক্ষে গুলি চলে ও গোলমালে বিপ্লবীদের একজন নিজেদের গুলিতেই আহত হইয়া পড়ে। অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া তাহারা নৌকা ডুবাইয়া পলায়ন করে। শিবপুরের লুণ্ঠনকারীরা সংখ্যায় ২০ জন ছিল। ইহারা এই ডাকাতিতে কৃতকার্য্য হইয়াও উপযুক্ত নেতার অভাবে পুলিশকে এড়াইতে পারে নাই; দলের নয় জন ধরা পড়িয়া দ্বীপান্তরিত হইল।

বিবিধ ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড

বালেশ্বরে যতীন্দ্রনাথ চিত্তপ্রিয় প্রভৃতির মৃত্যু, বিপিন গাঙ্গুলীর গ্রেপ্তার, শিবপুর ডাকাতির দলে নয়জন বিপ্লবীর ধরা পড়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবী-দল বিশেষভাবে শক্তিহীন হইয়া পড়িল। কিন্তু পূর্ববঙ্গে ১৯১৫ সালেও ১৬টি ডাকাতি, হত্যা বা হত্যার চেষ্টা হয়। কুমিল্লার হেডমাষ্টার ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশকে গোপনে সংবাদ দিতেন; বিপ্লবীরা তাঁহাকে ১৯১৫ সালের ৩রা মার্চ তারিখে সন্ধ্যার সময়ে হত্যা করিল। মৈমনসিংহের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যতীন্দ্রমোহন ঘোষ একটি ষড়যন্ত্র মামলার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বিপ্লবীদের চরগণও তাঁহার কার্য্যকলাপ জানিতে পারিল ও তাঁহাকে হত্যা করিবে ঠিক করিল। একদিন তিনি তাঁহার শিশু পুত্রকে কোলে করিয়া বাড়ীর বারেন্দায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কয়েকজন যুবক তাঁহার বাসায় উঠিয়া তাঁহাকে গুলি করিয়া মারিল—শিশু পুত্রটিও পিতৃক্রোড়ে মারা পড়িল। এতদ্ব্যতীত পুলিশকে সহায়তার জন্য দুইজন প্রাক্-বিপ্লবীকে ঐ বৎসরে বিপ্লবীরা হত্যা করিয়াছিল। উত্তর-বঙ্গেও বিপ্লবীদের কর্মচেষ্টা বন্ধ ছিল না। সেদিকেও কয়েকটি ডাকাতি হয়; পুলিশ ইহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত, তখন তথাকার অতিরিক্ত-পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায়সাহেব নন্দকুমার বসুকে বিপ্লবীরা হত্যা করিবার চেষ্টা করিল। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই নাটোরের নিকট বড় রকমের একটি ডাকাতি হয়।

নৃশংস হত্যা

১৯১৫ সালের প্রথমেই ভারত সরকার ভারত-রক্ষা আইন পাশ করেন ও উহার সাহায্যে পঞ্জাবের ও বাংলাদেশের বহুশত যুবককে বিপ্লবী সন্দেহে আবদ্ধ করেন। বিপ্লবীরা ক্রমশই আঘাত পাইতে পাইতে এমনি সতর্ক হইয়া উঠিতেছিল যে তাহাদের বিরুদ্ধে সহজে কোনো মামলা খাড়া করা পুলিশের পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল, অথচ সরকার নিশ্চিত জানিতেন যে তাহারা

অন্তরীন ১৯১৫

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হত্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট। অন্তরীনে বিপ্লবীদিগকে আবদ্ধ করিয়াও তাহাদের কার্য্য একেবারে বন্ধ হইল না। বিপ্লবীদের দল ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, তথাচ তাহাদের অল্পসংখ্যকই গুপ্তহত্যা ও ডাকাতাদি করিয়া বাহিরের জাঁক বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল।

১৯১৬ সালে বিপ্লবীদের কর্ম একেবারে বন্ধ হয় নাই; পূর্ববঙ্গেই ১৫টি ডাকাতি ও হত্যা ঘটিয়াছিল। কলিকাতায় বিপ্লবীরা প্রাণপণে নিজেদের ক্ষুদ্র দলকে নিরাপদে রাখিবার জন্য পুলিশের লোককে হত্যা করিতে লাগিল। বেলা দশটার সময়ে মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে মধুসূদন ভট্টাচার্য্য নামক গোয়েন্দা-বিভাগের জনৈক কর্মচারীকে বিপ্লবীরা হত্যা করিয়া পলায়ন করিল। পুলিশ যাহাদিগকে সন্দেহে ধরিল তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া গেল না—তাহাদিগকে অন্তরায়িত করা হইল।

পুলিশ কর্মচারী হত্যা

বসন্ত চট্টোপাধ্যায়কে হত্যা করিবার চেষ্টার কথা পূর্বেই বলিয়াছি; দুইবার বিপ্লবীরা অকৃতকার্য্য হইয়াছিল; কিন্তু বসন্তবাবুকে হত্যা করিবার জন্য নিরন্তর চর ফিরিত বলিয়া বোধ হয়। একদিন বৈকালবেলায় চৌরঙ্গীতে বিপ্লবীরা তাঁহাকে হত্যা করিল। এই ঘটনার পর পুলিশও অনেক ধরাপাকড় করিয়াছিল। ১৯১৭ সালে বিপ্লবীরা কলিকাতার বড়বাজারে আর্ম্মেনী স্ট্রীটে এক ধনী স্বর্ণকারের দোকান লুট করে। লুটের সময়ে কয়েকজন লোক পিস্তলের গুলিতে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। ডাকাতি করিয়া ফিরিবার সময়ে বিপ্লবীরা সুরেন্দ্র কুশারী নামক একজন সঙ্গীকে আহত দেখিয়া গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া যায়। এই বৎসরে কলিকাতার বাহিরে, পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে সাতটি বিপ্লবী ঘটনা ঘটে। রঙ্গপুরে

১৯১৭ ডাকাতি

ডাকাতি করিয়া ৩১,০০০৲ ও ত্রিপুরায় ৩৩,০০০৲, ঢাকায় আবদুলপুরে ২৪,০০০৲ রাজসাহীতে ২৬,০০০৲ টাকা বিপ্লবীরা লুণ্ঠন করিয়া পায়। এই

সময়ে অনেক বিপ্লবী ফেরারী হইয়া গা-ঢাকা দিয়া বেড়াইতেছিল—কারণ পুলিশ ধরিতে পাইলেই তাহাদিগকে অন্তরায়িত করিবে। একদল বিপ্লবী গৌহাটিতে একটি বাসায় গোপনে বাস করিতেছিল। তাহাদেরই কোনো সঙ্গী পুলিশকে তাহাদের গোপনস্থানের সন্ধান বলিয়া দেয়। পুলিশ সশস্ত্র তাহাদের ঘেরাও করে। রীতিমত খণ্ড-যুদ্ধের পর একদল বিপ্লবী পলায়ন করে; উভয় দলের কয়েকজন হতাহত হয়। এ ঘটনাটি বালেশ্বরের যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতির পুলিশকে বাধা দিবার অনুরূপ ঘটনা। ইহার পর হইতে বিপ্লবীদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার মত সংখ্যাধিক্য আর থাকিল না। ১৯১৮ সাল হইতে অন্তরায়ণের দরুণ বিপ্লবীদলের বড় কেহ সরকারী নজরবন্দীর বাহিরে ছিল না। বাংলাদেশেই প্রায় (১,২০০) বার শত যুবক আবদ্ধ হইয়াছিল। ইহার ফলে বিপ্লবীদের উপদ্রব শান্ত হইয়া যায়।

ইহার পর বাংলাদেশে পাঁচ ছয় বৎসর উল্লেখযোগ্য কোনো বিপ্লবী ঘটনা ঘটে নাই; এবং লোকে ভাবিয়াছিল যে বিপ্লব-বাদ দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। কিন্তু বিপ্লবের বিষ জাতির দেহে একবার প্রবেশ করিলে, তাহা সহজে যায় না, তাহার প্রমাণ ১৯২৩ সালে পুনরায় পাওয়া গেল। কলিকাতায় কয়েকটি ডাকাতি ও হত্যা ঘটে; লোকে তাহা সাধারণ গুণ্ডা বা দস্যুদের কর্ম বলিয়া সন্দেহ করিত; ইহার পশ্চাতে শিক্ষিত যুবক থাকিতে পারে তাহা কেহ ভাবে নাই। কলিকাতায় শাঁখারীটোলার পোষ্টাপিষে টাকা লুট করিবার জন্ত একদল যুবক রিভলবার লইয়া উপস্থিত হয় ও পোষ্টমাষ্টারের নিকট হইতে টাকা চায়। তিনি সেটাকা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, যুবকেরা তাঁহাকে গুলি করে। বরেন্দ্রকুমার ঘোষ নামক এক যুবককে লোকে ধরিয়া ফেলে। বরেন্দ্র ধরা পড়িবার পর পুলিশ চারিদিকে খানাতল্লাসী ও খোঁজ খবর করিতে করিতে একটি ষড়যন্ত্র অবিষ্কার করিল।

১৯২৩ বিপ্লব কর্ম

ইহারই কিছুদিন পরে গোপীনাথ সাহা নামক এক যুবক কলিকাতার পুলিশ-কমিশনর টাগার্টকে হত্যা করিবার জন্ম বাহির হইয়া মিঃ ডে নামক একজন সাহেবকে টাগার্ট-বোধে চৌরঙ্গীতে হত্যা করে। গোপীনাথ কাছারীতে বলেন যে তিনি নিরপরাধ সাহেবকে মারিয়াছেন বলিয়া দুঃখিত, তিনি টাগার্টকে মারিতে পারেন নাই বলিয়া বিশেষ দুঃখিত। গোপীনাথের ফাঁসি হইল। বরেন্দ্রেরও ফাঁসির হুকুম হয়; কিন্তু বিলাতে আপীল করিয়া তাহার ফাঁসি রদ হয়—তাহার দ্বীপান্তর হইয়াছে। বাংলার বিপ্লববাদ নষ্ট হয় নাই —কারণ ১৯২৪ সালেও Red Bengal নামে একখানি বিদ্রোহাত্মক কাগজ প্রকাশিত হইয়াছিল। সরকার পুনরায় ধর্ষণনীতি অবলম্বন করিলেন। অনেক রাজাদেশে-মুক্ত বিপ্লবীকে তাঁহারা পুনরায় রাজ-বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন। মাণিকতলার বোমার যুগের উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধ্য-সময়ের অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিন গাঙ্গুলী প্রভৃতি অনেক মুক্ত-বিপ্লবী পুনরায় আটক হইয়াছেন।

গোপীনাথ সাহা

নূতন শাসন-সংস্কার ভারতে শান্তি আনিতে পারে নাই; দায়ীত্বপূর্ণ স্বায়ত্বশাসন পাইয়া বা নির্বাচনের অধিকার পাইয়া, মন্ত্রীত্বের পদ পাইয়া দেশের হাওয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে ফিরিয়াছে; কিন্তু গান্ধীজির অহিংসক অসহযোগ ও তাঁহার আধ্যাত্মিক একনিষ্ঠা ভারতের বিপ্লববাদকে বিশেষ-ভাবে দূর করিতে সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা করিয়াছে।

বাংলাদেশের অনেক মহাপ্রাণ বিপ্লবকর্মের বিপথে গিয়া প্রাণ দিয়াছে। এই কর্মীদের মধ্যে অনেক প্রতিভাশালী যুবক ছিল; তাহাদের প্রতিভা-বলে বিপ্লবসঙ্ঘগুলির মধ্যে আশ্চর্য্য নিষ্ঠা (Discipline) গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাঙালী যুবকদের Organizationএর ক্ষমতা কতদূর ব্যাপক ও সাঙ্ঘাতিক হইতে পারে তাহা ইতিপূর্বে বাঙালী নিজেও বুঝিতে পারে নাই—

বিপ্লবে বাঙালী-প্রতিভা

বাংলার বাহিরেও কোনো জাতির পক্ষে ইহা বিশ্বাস্য হয় নাই; ইংরাজ-রাজপুরুষেরাও ইহা কল্পনা করিতে পারে নাই। অনুশীলন-সমিতিগুলি বিপ্লববাদীদের বিপুল Organisationএর পরিচায়ক। বিপ্লবীরা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই যে ইংরাজের শাসনযন্ত্র কিরূপ বিস্তৃত, কঠিন, দুর্দ্ধর্ষ ও Thorough। বিপ্লবীরা এই প্রকাণ্ড রাজশক্তির নিকট বারবার পরাভূত হইয়া ক্রমশই নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিকতর গোপনশীল, কর্মীদিগকে অধিকতর নিষ্ঠাবান্ করিয়া তুলিয়াছিল। পুলিশের চরের প্রথা যেমন বিপ্লবীদিগকে অনুধাবন করিত, বিপ্লবীদের চরগণ পুলিশ কর্মচারীদিগের উপর তেমনি শ্যেনদৃষ্টি রাখিত।

বিপ্লব-নেতরা দলের জন্য কর্মীসংগ্রহে বিশেষ সাবধানতা করিতেন। প্রথমত বিদ্যালয় ও কলেজ হইতে অল্পবয়সী যুবক ও বালকদিগের সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশিয়া নেতারা ধীরে ধীরে তাহাদিগকে ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য ও শারীরিক ব্যায়াম-শিক্ষা দিবার জন্য একত্র করিতেন। দলের মধ্যে আসিলেই কাহাকেও বিপ্লব মন্ত্র দেওয়া হইত না; ইহার মধ্যে নানা স্তর ও শ্রেণী ছিল; সকলকে ভীষণ গোপনতা মানিয়া চলিতে হইত। সুতরাং বাহিরের নূতন ছেলে কোনো খবর পাইত না। অনেক পরীক্ষা, শপথ ও দীক্ষার মধ্য দিয়া গিয়া তাহারা বিপ্লবের রূপ দেখিতে পাইত। দীক্ষার

কর্মী-সংগ্রহ ও বিপ্লব-দীক্ষা

প্রথমে শিক্ষার্থীকে এই বলিয়া 'আত্মপ্রতিজ্ঞা' করিতে হইত যে, সে কখনো সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না; সে সমিতির প্রত্যেকটি নিয়ম পালন করিয়া চলিবে; পরিচালকের আদেশ বিনাবাক্যে মানিবে; নায়কের কাছে সত্য ছাড়া কখনো মিথ্যা বলিবে না বা কিছুই গোপন রাখিবে না। এই সব নিষ্ঠার মধ্য দিয়া শিক্ষার্থী যখন গিয়াছে—তখন তাহাকে বিপ্লববাদের অঙ্গীভূত করিবার জন্য অন্য 'প্রতিজ্ঞা' করিতে হইত। এই স্তরে আসিয়া শিক্ষার্থীকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যে, সে সমিতির আভ্যন্তরিক

অবস্থা কথনো প্রকাশ করিবে না, এবং বৃথা তর্ক করিবে না; পরি-চালককে না জানাইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়া-আসার স্বাধীনতা সে নিজে রাখিবে না; এবং যখন যেখানে থাকুক পরিচালককে সে তাহা জ্ঞাপন করিবেই। কোনো ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইলে তদ্দণ্ডেই পরিচালককে তাহা জানাইবে এবং তাঁহার আদেশমত যথানির্দিষ্ট কার্য্য করিবে। ইহার পর যাহারা বিপ্লব-কর্মের মধ্যে প্রবেশ করিবার আরও দায়ীত্বপূর্ণ অধিকার পাইত তাহাদিগকেও 'প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞা' করিয়া বলিতে হইত "ঈশ্বর, মাতা, পিতা, গুরু ও পরিচালকের নামে আমি শপথ করিতেছি যে সমিতির উদ্দেশ্য যতদিন না সিদ্ধ হয়, ততদিন আমি ইহাকে ত্যাগ করিব না। এবং সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, কোনো প্রকার অছিলা না দেখাইয়া পরিচালকের আদেশ পালন করিব।' 'দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা'য় বিপ্লবী প্রতিজ্ঞা করিতেন যে, সে নিজের জীবন দিয়া শেষ পর্য্যন্ত সমিতির কার্য্য করিবে।

বাঙালীর কোমল চরিত্রের মধ্যে এই কঠোর কর্মনিষ্ঠা ও কর্তব্য-পরায়ণতা জাগ্রত করিয়া উহাদিগকে যিনি বিপ্লবপথে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন ঢাকার শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস। পূর্বেই বলিয়াছি ঢাকা অনুশীলন সমিতির অধীন প্রায় ৫০০ সমিতি ছিল। পুলিনবিহারী ১৯০৬ হইতে ১৯০৮ এই দুই বৎসর মাত্র কাজ করেন; তাহার পর ১৯০৮ সালেই তিনি ১৪ মাসের জন্য রাজবন্দী অবস্থায় জেলে বাস করেন। ১৯১০ সালে মুক্তি পাইয়া মাত্র ৫ মাস স্বাধীন ছিলেন; তারপর ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পড়িয়া ২ বৎসর হাজতে ও ৭ বৎসর দ্বীপান্তরে বাস করেন; ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে মুক্তি পাইয়াই অন্তরীনে আবদ্ধ হন; ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি মুক্তি পান। মুক্তির পর তিনি বিপ্লবপথের ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহার শক্তি দেশের শুভকর্মে নিয়োজিত

পুলিন দাস ও বিপ্লব-কর্ম

করিয়াছেন। তাঁহার বিপ্লব-কর্মের জীবন আড়াই বৎসর মাত্র—ইহার মধ্যে তিনি সমগ্র পূর্ববঙ্গে যে শক্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার কাজ সমগ্র বিপ্লব-যুগে চলিয়াছিল। ইঁহারই নেতৃত্বাধীনে ও আদর্শে কাজ করিয়া বাঙালী নীরবে, জয়ডঙ্কা না বাজাইয়া কাজ করিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু সে-কাজ হিংসার কাজ, প্রতিহিংসার কাজ, তাহার দ্বারা শুভ আসে নাই।

বিপ্লবীদের নানাপ্রকার কর্ম ছিল—অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য অর্থ প্রয়োজন; সেই অর্থসংগ্রহের জন্য ডাকাতি; ডাকাতি করিলে বা গুপ্ত-সমিতি স্থাপন করিয়া বাস করিলে পুলিশের দৃষ্টি পড়ে এবং যে-পুলিশ কর্মচারী বা গোয়েন্দা বা দলের লোকের নিকট হইতে কোনো বিপদ সম্ভাবনা তাহাকে হত্যা করা। ডাকাতি করিবার পূর্বে বিপ্লবীদের চর জেলার গ্রামগুলির সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিত। পথ, ঘাট সম্বন্ধে তন্নতন্ন সংবাদ, রেলওয়ে ট্রেণের সময়-সূচী জানা, প্রত্যেক কর্মীর কার্যভাগ, পরিচালকের আদেশ যন্ত্রবৎ মানিয়া লওয়া প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় তাহাদিগকে শিক্ষা করিতে হইত। মাঝিগিরি, মাল্লাগিরি জানা, টেলিগ্রাফের তার কাটিতে জানা, বন্দুক পিস্তল ছুঁড়িতে জানা, নিশ্চল হইয়া মারিতে ও নির্বাক হইয়া মরিতে জানা প্রভৃতি অনেক বিদ্যা তাহাদের আয়ত্ব ছিল।

ডাকাতির নিয়ম নিষ্ঠা

ডাকাতি করিয়া কয়েকটি দল টাকাকড়ি লইয়া ছত্র-ভঙ্গ হইত, কয়েকটি দল যন্ত্রপাতি লইয়া, কয়েকটি দল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সরিয়া পড়িত। "১৯০৬ হইতে ১৯১৭ সালের অনুষ্ঠিত ডাকাতিগুলি বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের কষ্ট-সহিষ্ণুতা, নিয়মানুবর্তিতা, ক্ষিপ্রকারিতা, নির্ভীকতা, লোভশূন্য মনোবৃত্তি প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।" ডাকাতির পর দলের প্রত্যেক লোকের গাত্র খানাতল্লাস হইত, পাছে কেহ কিছুতে লোভ করে। কিন্তু সর্বত্র ও সর্বদা পূর্বোল্লিখিত কঠোর সংযম-অভ্যাস ও বহুবিধ পরীক্ষা গৃহীত হয় নাই; ইহার ফলে দলের মধ্যে মেকি লোক প্রবেশ করে; দলপুষ্টি ও

আশুফললাভের জন্ম নীচ প্রকৃতির লোককেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। এই সব নানা কারণে বিপ্লবীদল নষ্ট হইল। গভর্ণমেণ্টই যে কেবল বিপ্লবীদের ধরিয়া ফেলিত তাহা নহে, দুর্বলচিত্ত বিপ্লবীরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশকে সাহায্য করিয়াছে। উপযুক্ত নেতার অভাব হইলে দলের মধ্যে অনেক স্বার্থপরতা প্রকাশ পাইত। বাংলার বিপ্লববাদের পতনের প্রধান কারণ বাঙালী জাতি এই বিপ্লবকর্ম পছন্দ করে নাই; অতি সামান্ত কয়েকজন যুবক ইহাতে মাতিয়াছিল। বাঙালী খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজের একজনও ইহাতে যোগদান করে নাই। বিপ্লবসাধনের পিছনে কোনো জাতীয়-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়া ইহাকে অনুপ্রাণিত করে নাই। পুলিশের সাহস দক্ষতা ও বিপ্লবীদলের ব্যক্তিবিশেষের কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতা বিপ্লববাদ ধ্বংস হইবার প্রধান কারণ। সৌভাগ্যক্রমে গান্ধীজির অহিংস-আন্দোলন উপস্থিত হওয়ায় বিপ্লবীদের মন ধ্বংস কার্য্য ছাড়িয়া গঠনশীল কর্মের দিকে ঝুঁকিল। অহিংসার বাণী হিংসার উত্তেজনাকে পরাস্ত করিয়াছে।

বিপ্লবের পতন

তৃতীয় পর্ব

পঞ্জাবে বিপ্লব-কর্ম

বাংলার বিপ্লব-সাধনা বাঙালীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিল না। 'যুগান্তরে'র বিপ্লবী-ভাবোন্মত্ততা অল্পবিস্তর ভারতের সকল জাতিকেই স্পর্শ করিয়াছিল। পঞ্জাবীরা ভারতে সর্বশেষে ইংরাজের অধীন হইয়াছিল, শিখ ও পঞ্জাবীদের মধ্যে রণোন্মত্ততা এখনো আছে—সেইজন্য বাংলার বিপ্লবমত্ততা পঞ্জাবীকে রঙীন করিয়া তুলিল।

১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে পঞ্জাবের ছোটলাট স্যর ডেনজিল ইবেটসন লিখিয়াছিলেন যে, পঞ্জাবের মধ্যে নব জাতীয়ভাবের উত্তেজনা প্রবেশ করিতেছে, ইংরাজের বিরুদ্ধে অধিবাসীদের মনকে বিষাক্ত করিবার জন্য সকলপ্রকার উপায় আন্দোলনকারীরা গ্রহণ করিতেছে। শিখদের মন ভাঙ্গাইবার চেষ্টা চলিতেছে; লোকে সরকারী-চাকরকে অবমাননা করিতেছে ইত্যাদি। ছোটলাট বাহাদুর সেই সময়েই পঞ্জাবের মোটামুটি অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক মনে করিয়া ভারত-সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই সময়ে রাবালপিণ্ডিতে রাজস্ববিষয়ক ব্যবস্থা লইয়া প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং সেই অসন্তোষ অল্পকালের মধ্যে দাঙ্গায় পরিণত হয়। জনতা উত্তেজিত হইয়া পিণ্ডির ডাকঘর লুট করে, একটি গির্জাঘর ভাঙ্গিয়া তাহাতে প্রবেশ করে; অবশেষে সৈনিক আসিয়া দাঙ্গাকারীদের নিবৃত্ত করে। এই অশান্তির জন্য সরকার বাহাদুর পঞ্জাবের নেতৃ-স্থানীয় লালা লাজপত রায় ও সর্দার

১৯০৭ লাজপত রায় ও সর্দার অজিত সিংহের নির্বাসন

অজিত সিংহকে দায়ী করিয়া তাঁহাদিগকে রাজবন্দী করিয়া নির্বাসিত করিলেন। তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড মর্লীর মতানুসারে পঞ্জাবের অশান্তির কারণ রাজনৈতিক—রাজস্ববিষয়ক নহে। সর্দার অজিত সিংহ ছয় মাস নির্বাসনে বাসের পর মুক্তি পাইলেন, কিন্তু তিনি আরও ব্যাপকভাবে বিপ্লব-কর্ম করিবার উদ্দেশে সুফী আম্বাপ্রসাদকে লইয়া করাচীর পথে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যান।

পঞ্জাবের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে স্বাদেশিকতা ক্রমশই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। ১৯০৫ সালে হরদয়াল নামে পঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অসাধারণ কৃতি ছাত্র সরকারী-বৃত্তি লইয়া বিলাতে অধ্যয়ন করিবার জন্য গমন করেন। ইহার কিছুদিন পরেই ভাই পরমানন্দ নামক আর একজন কৃতি যুবক ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। ইঁহারা উভয়ে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সহিত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হন। হরদয়াল বিলাতে অবস্থানকালে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষার উপর অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তিনি ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনোপ্রকার উপাধি লইবেন না ঠিক করিয়া সরকারী বৃত্তি-গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিলেন। ভাই পরমানন্দ লণ্ডনে থাকিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতেছিলেন; তিনি শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা প্রভৃতির সহিত মিশিতেন বটে কিন্তু তিনি বিপ্লবী-ভাব কথনো পোষণ করিতেন না বলিয়া তাঁহার আত্মকাহিনীতে লিখিয়াছেন। বৈপ্লবিকদের সহিত মেলামেশা করিবার জন্য পুলিশের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়ে। দেশে ফিরিবার পরই পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন ও মুচলেখা লইয়া সে-যাত্রায় ছাড়িয়া দেন। সরকারের চক্ষে তিনি ভীষণ বিপ্লবী বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার আত্মকাহিনীতে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া লিখিয়াছেন।

বিলাতে হরদয়াল ও ভাই পরমানন্দ

ইতিমধ্যে ১৯০৮ সালে হরদয়াল বৈপ্লবিক মতবাদে উত্তেজিত হইয়া

দেশে ফিরিলেন ও লাহোরে যুবকদের মধ্যে নূতন স্বাধীনতার কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। তখন বাংলাদেশের বৈপ্লবিক ঘটনাসমূহ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে; পঞ্জাবে এই ব্যাপার তখন বিশেষ উত্তেজনা ও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৯১১ সালে হরদয়াল ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় যান; কিন্তু ১৯০৮ হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত হরদয়ালের চেষ্টায় পঞ্জাবে বিপ্লবভাব বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কিছু কিছু বিপ্লব-সাহিত্য প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতেছিল। দীননাথ ও

পঞ্জাবের গুপ্ত সমিতি

হরদয়াল ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময়ে দিল্লীর আমীরচাঁদকে তাঁহার প্রতিনিধি ও বিপ্লবের পাণ্ডা করিয়া রাখিয়া যান ও দীননাথ নামক আর একজনকে লাহোরের সহকারী মনোনীত করেন। এই দীননাথ ও বসন্তকুমার নামক একজন বাঙালী যুবক লাহোরের লরেন্স উদ্যানে একটি বোমা রাখিয়া আসে; সেখানে সর্বদাই সাহেবরা যাওয়া আসা করিত বলিয়া, তাহাদের হত্যা করিবার জন্য উহা রক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু একটি হতভাগ্য মালী মারা পড়ে। দীননাথ গুপ্ত-সমিতিতে গিয়া বলে যে লালা হংসরাজের পুত্র বালরাজ ও ভাই পরমানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র বালমুকুন্দ এই কার্য্য করে। ইতিমধ্যে দেরাদুন বন-বিভাগের হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু পঞ্জাবের ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন ও তাহাদের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠেন। তাঁহার দ্বারাই প্রধানত কলিকাতা হইতে বোমা প্রভৃতি পশ্চিমে নীত হইত। রাজাবাজার বোমার আথড়া আবিষ্কারের ফলে সেখানকার কাগজপত্রে দিল্লীর অনেক তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। পুলিশ সেই সূত্র ধরিয়া দিল্লীর আমীরচাঁদকে ও লাহোরের দীননাথকে ধরে। দীননাথ পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া প্রাণ-ভয়ে রাজসাক্ষী হইয়া যায় ও ষড়যন্ত্রের সকল কথা পুলিশকে বলিয়া দেয়।

ইতিপূর্বে ১৯১২ সালের ২৭শে ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিংজ যখন নূতন দিল্লী নগরীতে শোভাযাত্রা করিয়া প্রবেশ করিতেছেন, তখন চকের একটি বাড়ীর ছাদ হইতে বড়লাটের উপর বোমা পড়িল। মাহুত মারা পড়িল; বড়লাট ও তাঁহার পত্নী আহত হন। লেডী হার্ডিংজ বোমার আওয়াজে এমনি আঘাত পান যে তিনি আর ভাল করিয়া সারিতে পারিলেন না এবং উহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল বলিয়া শোনা যায়। দীননাথের স্বীকারোক্তি হইতে গভর্ণমেণ্ট বেশ বুঝিলেন যে দিল্লীর এই কাণ্ড রাসবিহারী ও তাহার সঙ্গীদেরই কীর্তি। রাসবিহারীকে পুলিশ ধরিতে পারিল না, পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া সে পলায়ন করিল এবং ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত বিপ্লবকর্মের গুরু ও নেতারূপে উত্তর-ভারতেই বাস করিতে লাগিল। আমীরচাঁদ, আউদবিহারী, ভাই বালমুকুন্দ, বসন্তকুমারের ফাঁসী হইল; বালরাজ ও নেবন্ত সহাইএর সাত বৎসরের কারাগার হইল। বালমুকুন্দের পূর্বপুরুষ মতিদাসকে আরঙজেব যেখানে করাত দিয়া চিরিয়া কাটেন সেই স্থানেই বালমুকুন্দ হাসিতে হাসিতে শহীদ হইল। বালমুকুন্দের স্ত্রী শ্রীমতী

১৯১২
লর্ড হার্ডিংজকে
হত্যার চেষ্টা

রামরাখী 'সতী' হইলেন। এই পুণ্যবতী বালিকা কয়েকমাস পূর্বে মাত্র বিবাহ করিয়াছিল; সে স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে আত্মঘাতী হইল। এই ঘটনাটি পঞ্জাবময় খুবই আলোচিত হয় ও বিপ্লবীদের কর্মের প্রসার ও তাহাদের cause অগ্রসর করিয়া দেয়। ১৯১৪ সালের প্রথম দিকে দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলা শেষ হইয়া গেল; সরকার ভাবিলেন সকল অপরাধীই ধরা পড়িয়াছে, তাহাদের শাস্তি হইয়া গিয়াছে, এ-শিক্ষার পর আর কোনো লোক এ-পথ দিয়া দেশ স্বাধীন করিতে চেষ্টা করিবে না; কিন্তু সরকার দেশের অশান্তি দূর করিবার যথার্থ উপায় আবিষ্কার করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল বিপ্লব-চেষ্টাকে সাময়িকভাবে নষ্ট করিয়া ভাবিলেন যে

১৯১৪
দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা

দেশে শান্তি ফিরিয়াছে; কিন্তু ইহাতে তাঁহারা কি পরিমাণে ভ্রান্ত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ অল্পকালের মধ্যে প্রকাশ পাইল।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ১৯১১ সালে হরদয়াল ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া আমেরিকায় উপস্থিত হন। তিনি ইংরাজদের সভ্যতা ও ইংরাজের শাসনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উহাকে আমূল ধ্বংস করিবার বিপুল বাসনা পোষণ করিয়া পশ্চিমে গমন করেন। আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে

হরদয়াল ও আমেরিকায় 'যুগান্তর আশ্রম'

বহু সহস্র ভারতবাসী, বিশেষভাবে পাঞ্জাবী ও শিখ শ্রমজীবি বাস করিত। তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহ-প্রচার ছিল হরদয়ালের উদ্দেশ্য। স্যনফ্রান্সিস্কোতে তিনি 'যুগান্তর-আশ্রম' নামে এক মুদ্রণ-কার্য্যালয় স্থাপন করিলেন ও 'গদর' (বিদ্রোহ) নামে এক পত্রিকা উর্দু ও হিন্দীতে ছাপাইয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। বোধ হয় 'যুগান্তর আশ্রমের' এই নামটি বাংলাদেশের 'যুগান্তর' হইতে গৃহীত। 'গদর' পত্রিকা ভারতবর্ষে বহুল পরিমাণে প্রচারের চেষ্টা চলিয়াছিল। হরদয়ালের অদম্য উৎসাহ ও কর্মশীলতার ফলে আমেরিকায় 'হিন্দু' জাতির মধ্যে বিপ্লবভাব জাগ্রত হইল; এতদিন তাহারা নিজেদের অর্থ উপার্জন প্রভৃতি কার্য্যেই মনোযোগী ছিল, তাহাদের অধিকাংশই সামান্য লেখাপড়া জানিত। কিন্তু হরদয়াল ও তাঁহার প্রধান দুই সহায় রামচন্দ্র ও বরকৎ-উল্লার প্রচারের ফলে এই নিরক্ষর শ্রমজীবিদের মধ্যে বিপ্লবভাব দেখা দিল। বিদেশে বাস করিয়া ইহাদের চক্ষু খুলিয়া গিয়াছিল। কানাডায় ক্রমেই শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের ভেদ স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছিল। কানাডাবাসীরা এশিয়াবাসী শ্রমজীবিদিগকে সে-দেশে

ভারতীয় শ্রমজীবি সম্বন্ধে কানাডার নিয়ম

প্রবেশ করিতে দিতে নারাজ; কিন্তু চীন ও জাপানী সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম করিতে তাহারা সাহসী হইত না; অথচ ভারতবাসীর আসা বন্ধ করিতে হইবে। সেইজন্য কানাডা-গভর্ণমেণ্ট নিয়ম করিলেন যে যে-

শ্রমজীবিরা কানাডায় উপস্থিত হইবে, তাহাদিগকে তাহাদের নিজ দেশ হইতে সোজাসুজি আসিতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে কোনো জাহাজ সোজাসুজি কানাডায় যায় না। সেইজন্য বহু ভারতবাসী হংকং হইয়া কানাডায় গমন করিয়াছিল। কিন্তু এই নিয়ম পাশ হইলে তাহাদিগকে কানাডা হইতে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা হংকংএ আসিয়া দিশাহারা হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

গুরদিৎ সিং নামক জনৈক শিখ সিঙাপুর ও মালয় উপদ্বীপে বহুকাল ব্যবসায় করিয়া যশ ও অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। তিনি কানাডা-গভর্ণমেণ্টের জাহাজ সম্বন্ধে অছিলা পরীক্ষা করিবার জন্য 'কোমাগাটামারু' নামক একখানি জাপানী জাহাজ ভাড়া করিয়া হংকং হইতে প্রত্যাবৃত্ত পঞ্জাবীদিগকে উঠাইয়া লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন; ইতিপূর্বে পাঞ্জাব হইতে কয়েকশত লোক কানাডায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল। মোট ৩৭২ জন পঞ্জাবী কানাডার উদ্দেশ্য 'কোমাগাটা-মারু'তে যাত্রা করিল। কানাডার বৃটীশ-কলম্বিয়ার প্রধান নগর ভাঙ্কুভারে জাহাজ পৌঁছিলে উহাকে বন্দরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। কর্তৃপক্ষ বলিলেন যে ভারতবাসীদিগকে নামিতে দেওয়া হইবে না। এই সংবাদে জাহাজে ভীষণ চঞ্চলতা দেখা দিল; উভয় পক্ষে তর্কবিতর্ক চলিল। অবশেষে বলপ্রয়োগের আশঙ্কা হইল। জাহাজের নোঙড় না তুলিলে তাঁহারা বলিলেন যে জাহাজ তোপ দিয়া ডুবাইয়া দিবেন। অগত্যা জাহাজ ফিরিল—কানাডা-গভর্ণমেণ্ট জাহাজের খরচ ও খেসারত দিতে রাজী হইলেন।

'কোমাগাটামারুর' যাত্রীদল

'কোমাগাটামারু' যখন ভারতে আসিতেছে তখনই য়ুরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হয়। প্রত্যাবৃত্ত শিখ ও পঞ্জাবীদের মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। পথিমধ্যে হংকং, সিঙাপুর,

রেঙ্গুন—যেখানে জাহাজ থামিল—তাহারা কূলে গিয়া ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে অসন্তোষ অগ্নি জ্বালাইবার চেষ্টা করিল। তাহাদের ও অন্যান্য বিপ্লবীদের প্ররোচনায় সিঙাপুরে একদল পঞ্জাবী সৈন্য যুদ্ধে যাইতে অস্বীকৃত হইল। এই দল বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, উভয় পক্ষের বহুশত প্রাণ নষ্ট হয়; অবশেষে জাপানী-সৈন্যদের সাহায্য লইয়া ইহাদের ধ্বংস করা হইল।

'কোমাগাটামারু' ১৯১৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার নিকটে বজবজে আসিয়া নোঙড় করে। যাত্রীদের মনের অবস্থা কিরূপ উষ্ণ ও বিদ্রোহী ছিল তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি; স্থলে আসিয়া তাহারা শুনিল যে তাহাদের জন্য ট্রেণ প্রস্তুত, তাহাদিগকে বিনা ভাড়ায় পঞ্জাবে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে! এক ইংরাজ সরকারের নিকট হইতে তাহারা যে-ব্যবহার পাইয়া আসিতেছে, তাহাদেরই আর এক সরকারের এইরূপ সাধু প্রস্তাব তাহারা বিনা সন্দেহে গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহারা কলিকাতা হইয়া নিজেদের ইচ্ছামত যাইবে বলিল। ইহারই ফলে পুলিশ ও শিখ-পঞ্জাবীদের মধ্যে দাঙ্গা হয়। উভয়পক্ষে গুলি চলিল ও ১৮জন শিখ মারা পড়িল। পুলিশও মরিল। গুরদিৎ সিং প্রমুখ উনত্রিশ জন শিখ নিরুদ্দেশ হইল। অবশিষ্টদের ধরিয়া পুলিশ দেশে চালান করিল। এই ঘটনাটির আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি ব্যাপারই ভারতে ও ভারতের বাহিরে সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত স্থানে পঞ্জাবীদের মনকে বৈপ্লবিক করিয়া তুলিল। আমেরিকার 'গদর' দল এই ঘটনাটি লইয়া ভারতবাসীদিগকে ভীষণ উত্তেজিত করিয়া তুলিল; এদিকে বিপ্লবীরা মনে মনে ঠিক করিয়াছিল যে 'কোমাগাটামারু'র যাত্রীরা ফিরিয়া আসিলে তাহাদিগকে দলে টানিবে।

বজবজে শিখ ও পুলিশে দাঙ্গা

আমেরিকাবাসী হিন্দুরা এই সময়ে সেখানে বসিয়া ভারতে বিপ্লব আনিবার কিরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা আমরা পরে জানিতে পারিব। তবে তাঁহাদের একটি কাজ হইল একদল লোককে 'গদর' (বিদ্রোহ) ভাবে

উত্তেজিত করিয়া ভারতে প্রেরণ করা। স্থির ছিল যে প্রত্যাবৃত্ত হিন্দুরা দেশে আসিয়া শিখ ও পঞ্জাবীদের যুদ্ধে যোগদান করিতে নিষেধ করিবে ও অন্যান্য বিপ্লবকর্ম আরম্ভ করিবে। সেই উদ্দেশ্য লইয়া ১৯১৪ সালে অক্টোবর মাসে 'তোসামারু' জাহাজে ১৭০ জন শিখ ভারতে ফিরিল। সরকার তাহাদের প্রত্যেকের ইতিহাস, মত ও বিশ্বাস, কর্মশীলতা প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য পূর্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং দেশে আসিবামাত্র ১০০ জনকে জেলে অন্তরায়িত করিলেন। আমেরিকাপ্রবাসী শিখ ও পঞ্জাবীরা দেশে ফিরিবার পর পঞ্জাবে বিপ্লব-ভাব বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই দলের লোকেরা একপ্রকার 'মরিয়া' হইয়াই দেশে ফিরিয়াছিল এবং একটা কিছু বিপ্লব বাধাইবে বলিয়া একপ্রকার কৃতসংকল্প হইয়াছিল; শিখ ও পঞ্জাবীদের মধ্যে বিপ্লবীদের বয়স সকলেরই ত্রিশের উপর ছিল,—বৃদ্ধ লোকও ছিলেন; কিন্তু ইহাদের নেতা কর্তার সিং বিশ বৎসরের যুবক মাত্র। সকলে একবাক্যে বলিয়াছেন যে এরূপ উৎসাহী বুদ্ধিমান যুবক সচরাচর দেখা যায় না—যে কোনো দেশে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের নেতা হইবার মত ক্ষমতা তাহার ছিল; কিন্তু বিপথে গিয়া সে তাহার জীবনকে নষ্ট করিল। পঞ্জাব সরকার প্রত্যাগত শিখদের চালচলন ভাবগতিক দেখিয়া মোটেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। অথচ স্পষ্ট অপরাধের অভাবে কোন সন্দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার মত কোনো আইন তখন দেশে ছিল না—সেই জন্যই ১৯১৫ সালের প্রথমেই ভারত-রক্ষা-আইন পাশ হয়।

'গদর' ও প্রত্যাবৃত্ত পঞ্জাবী

১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বিষ্ণু গণেশ পিংলে নামক জনৈক মারাঠা যুবক বহুকাল আমেরিকায় বাস করিয়া দেশে ফিরিলেন। তিনি আমেরিকায় 'গদর' ও অন্যান্য বিপ্লব-প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন ও ভারতে বিপ্লব জাগরণের জন্যই তাঁহার আগমন। তিনি

বাঙালী-বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হন ও রাসবিহারীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া দেশময় প্রকাণ্ড বিদ্রোহ জাগাইবার নানারূপ জল্পনা করিতে থাকেন। পঞ্জাবে আসিয়া তিনি বিপ্লব-ভাবাপন্ন লোকেদের একত্র করিয়া দেশকে কেমন করিয়া স্বাধীন করা যায় সে-সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন ও কিরূপ-ভাবে সরকারী খাজাঞ্চীখানা লুট করিতে হইবে, দেশীয় সৈন্যদের ভাঙ্গা-ইতে হইবে, অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিতে হইবে, বোমা প্রস্তুত করিতে হইবে, ডাকাতি করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেন। নেতারা লুধিয়ানা অঞ্চলের সমস্ত রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছে ছোট ছোট কমিটি গঠন করিয়া এই সমস্ত বিপ্লবকর্ম করিবার বন্দবস্ত করিলেন। অনেক-গুলি ডাকাতি হইল। পুলিশের সঙ্গে আমেরিকা প্রত্যাগত শিখ ও পঞ্জাবীদের কয়েকবার গুলি ছোড়াছুড়ি পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ডাকাতি যে সর্বদা বৈদান্তিকভাবে সমাহিত হইত তাহা নহে; বিপ্লবীদের কাহারও ব্যক্তিগত ক্রোধ আক্রোশ মিটাইবার জন্য তাঁহারা লুণ্ঠন ইত্যাদি করিয়া-ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। এইরূপ একটি নৃশংস হত্যাকাহিনী ভাই পরমানন্দ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন।

বিষ্ণু পিংলে ও রাসবিহারী

দিল্লীর ষড়যন্ত্র-মামলার সময় হইতে রাসবিহারী বসু ফেরার হইয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিয়াছি। তাঁহার ফোটো প্রধান প্রধান স্থানে লটকানো ছিল,—এবং তাঁহাকে ধরিয়া দিতে পারিলে পুলিশ হইতে বিস্তর টাকা পারিতোষিক পাইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। এত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি পুলিশ ও গোয়েন্দাদের চক্ষে ধুলি দিয়া বাংলা ও পঞ্জাবের মধ্যে বিপ্লব-সূত্র গ্রথিত করিবার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। প্রত্যাগত শিখেরা আমে-রিকা হইতেই রাসবিহারীর দিল্লী-ষড়যন্ত্র প্রভৃতির কাহিনী শুনিয়া আসিয়াছিল। তাহারা রাসবিহা-রীকে পঞ্জাবে আহ্বান করিল; পঞ্জাবের ক্ষেত্র

রাসবিহারীর বিপ্লবকর্ম

কিরূপ জানিবার জন্য রাসবিহারী তাঁহার প্রধান সহায় শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে কাশী হইতে প্রেরণ করেন। শচীন্দ্র পঞ্জাবের অবস্থা অনুকূল বোধ করায় রাসবিহারী তথায় গমন করেন ও পঞ্জাবী-বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হন। রাসবিহারীর সংগঠনের অত্যদ্ভুত শক্তি ছিল। তিনি পিংলে, কর্তার সিং, সোহন সিং, শচীন্দ্রনাথ প্রভৃতি দেশীয় সৈনিকদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিবার আয়োজন করিলেন; কয়েকটি স্থানের সৈনিকেরা রাজী হইল। স্থির হইল ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী পঞ্জাবে বিদ্রোহ হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে কৃপাল সিং নামক একজন বিপ্লবী পুলিশের নিকট সমস্ত বলিয়া দেয়। সরকার তখনই গোরা পল্টন আনাইয়া বারুদঘরে, তোপখানায় বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করিয়া সতর্ক হইলেন; তখন বিপ্লবীরা স্থির করিল যে ১৮ই বিদ্রোহ জাগাইবে; কিন্তু সরকারের ভাবগতিক ও আয়োজন দেখিয়া সৈনিকেরা ভয় পাইল এবং ঐ দিনের বিদ্রোহের কথাও কৃপাল সিংহের সহায়তায় পুলিশ যথাসময়ে জানিল।

১৯১৫
২১ ফেব্রুয়ারী
বিদ্রোহের দিন

চারিদিকে খানাতল্লাসী ধরপাকড় চলিল। রাসবিহারীর এক বাসায় অনেক রিভলবার, গুলি, বোমা প্রভৃতি আবিস্কৃত হইল, কিন্তু সেবারও পুলিশ রাসবিহারীকে ধরিতে পারিল না। পিংলেও তখন ধরা পড়িল না। কিন্তু কয়েকদিন পরে মিরাটের এক কেল্লার মধ্যে পিংলে কতকগুলি বোমাসমেত ধরা পড়িল। এই বোমাগুলি এমন উপাদানে গঠিত যে সরকারী-মতে সেগুলি অনায়াসে অর্দ্ধেক রেজিমেণ্ট উড়াইয়া দিতে পারিত। পিংলের ফাঁসি হইল। বিপ্লবীরা আর একজন যুবককে বিদেশ হইতে অস্ত্রাদি সংগ্রহের জন্য আফগানিস্থানাভিমুখে পাঠাইতেছিল, পথিমধ্যে সেও ধরা পড়িয়া গেল। পুলিশ লাহোরের এই বিপুল বিপ্লব চেষ্টার আভাস পাইয়া অতি ব্যাপকভাবে খানাতল্লাসী খোঁজখবর করিয়া এক

মামলা খাড়া করিয়া তুলিল। ইহার একদলে ৬১ জন, একদলে ৭২ জন ও একদলে ১২ জন আসামী। ২৮ জন বিপ্লবীর ফাঁসি হইল; ২৯ জন খালাস পাইল; অবশিষ্টদের নানা সময়ের জন্য জেল হইল। বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে অধ্যাপক ভাই পরমানন্দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল। পরমানন্দের হরদয়াল প্রভৃতির সহিত পরিচয় ছিল বটে, কিন্তু তিনি কখনো বিপ্লববাদ বা হত্যাদি করিবার মত পোষণ করিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন যে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন; বিপ্লবীদের যে সব আত্মচরিত প্রকাশিত হইয়াছে— তাহাতে কোথায়ও ভাই পরমানন্দের নাম নাই। পুলিশের চক্ষেই কেবল তাঁহার অপরাধ আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলার সময়ে ভারতীয় বিপ্লববাদীদের বিপ্লবের বিচিত্র চেষ্টার ইতিহাস প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ইহাদের সহিত আমেরিকাবাসী 'গদরে'র সহিত ঘনিষ্ট যোগ, আমেরিকাস্থ জার্মান কন্সাল ও গুপ্তচরদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণের আয়োজন, বাংলার বিপ্লবীদের সহিত যুক্ত হইয়া সেথান হইতে বোমা ও অন্যান্য বিস্ফোরক আমদানী, ডাকাতি ও হত্যা প্রভৃতি ভীষণ কার্য্য জনসাধারণ জানিতে পারিল। ১৯১৫ সালের প্রথম দিকে ভারত-রক্ষা আইন পাশ হইয়াছিল; সেই আইনের সাহায্যে সরকার ১৬৮ জন পঞ্জাবীকে বিপ্লবী সন্দেহে অন্তরায়িত করিয়াছিলেন। Ingress Ordinance নামক আর একটি বিধি অনুসারে ৩৩১ জন লোককে ১৯১৪ হইতে ১৯১৭ সালের মধ্যে আবদ্ধ করা হয়; প্রত্যাগত শিখদের মধ্যে ২,৫৭৬ জনকে নিজ নিজ গ্রামে আবদ্ধ রাখা হইল।

ভারত-রক্ষা আইন প্রভৃতির সাহায্যে অন্তরায়ণ

লাহোর ষড়যন্ত্রে প্রধানত শিক্ষিত লোক ছিল। তাহারা সকলেই মরিল অথবা জেলে পচিতে লাগিল। মোট কথা এই ব্যাপারের পর পঞ্জাবের

বিপ্লব করিবার শেষ আশা নষ্ট হইল। এই সকল রাজনৈতিক বিপ্লব দমনকর্মে শিখ সর্দারগণ, পঞ্জাবী জমিদার ও প্রধান ব্যক্তিগণ সরকারকে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন; তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত কেবল পুলিশের পক্ষে এরূপভাবে কাজ করা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। সরকারের চক্ষে পঞ্জাব শান্ত হইয়া গেল। ১৯১৬ সালে লাটসাহেব তাঁহার রিপোর্টে ঐ কথাই ব্যাপকভাবে লিখিয়াছিলেন।

চতুর্থ পর্ব

বিপ্লবে বৈদেশিক সহায়তা

যুরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভারতবর্ষের রাজনীতি আন্দোলনকারীরা ইংরাজকে সাহায্য করিয়া আশা করিয়াছিলেন যে যুদ্ধান্তে শাসন-পদ্ধতির কিছু সংস্কার হইবে, তাঁহাদের বহুকালের আশা আকাঙ্ক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ হইবে; তেমনি বিপ্লবীরাও যুরোপীয় যুদ্ধে ইংরাজদের বিপন্ন দেখিয়া সেই সুযোগে দেশের মধ্যে বিদ্রোহ জাগাইবার চেষ্টা ও দেশের বাহিরে ইংরাজের শত্রুদের সহিত মিত্রতা-স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল। আমেরিকাস্থ প্রবাসী ভারতবাসীরা ইংরাজ-শত্রু জার্মানদের সহিত মিত্রতা করিতে অগ্রণী হন। সেখানকার কয়েকজন বৈপ্লবিক মার্কিন রাজ্যস্থিত জার্মান-দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রস্তাব করেন যে, তাঁহারা তাহাদের ইংরেজ-বিদ্বেষ ও জার্মানদের সহিত তাহাদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবার জন্য ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকদের একটি সৈনিক-বাহিনী গঠন করিয়া জার্মানীতে পাঠাইতে চান। বৈপ্লবিকেরা সৈন্য, ডাক্তার ও সেবার লোকজন নিজেরাই দিবে, আর সব ভার জার্মান গভর্ণমেণ্টের। এই প্রস্তাবকারীদের মধ্যে বাঙালীও ছিলেন। কিন্তু 'গদর' দলের নেতারা এ বিষয়ে একমত হইতে পারিলেন না; তাঁহাদের মত ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়া বিপ্লব চেষ্টা করিতে হইবে। 'কোমাগাটামারু' যাত্রীদের প্রতি কানাডীয় গভর্ণমেণ্টের দুর্ব্যবহার ও ইংরাজ-সরকারের সহানুভূতির অভাব, কলিকাতায় তাহাদের লাঞ্ছনা প্রভৃতি ঘটনা

আমেরিকায় বিপ্লবীদের জার্মান-সহায়তার সন্ধান

পঞ্জাবী ও শিখ 'গদর'দের মনকে ভীষণ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। সেইজন্য 'গদর' নেতারা ভারতের মধ্যে বিপ্লব-চেষ্টার জন্য বেশী ব্যস্ত হইয়া দেশে সব লোক পাঠাইতেছিলেন। আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে নিম্নলিখিতদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—লালা হরদয়াল, তারকানাথ দাস, বরকত-উল্লা, চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, হেরম্বলাল গুপ্ত, সুরেন্দ্র কর।

য়ুরোপেও জার্মান সহায়তা লাভের চেষ্টা

য়ুরোপেও কয়েকটি বিপ্লবীদল নানাভাবে সেদেশে ও এদেশে বিপ্লব-কার্য্যে সহায়তা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ও তাঁহার সঙ্গীদের ক্রিয়া কলাপের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রীমতী কামা নাম্নী এক তেজস্বী পারসিক মহিলা ভারতীয় বিপ্লবী যুবকদের মধ্যে বিশেষভাবে কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লববাদকে বা ভারতের স্বাধীনতাকে বৃহৎ অন্তর্জাতিক (International Relation) সম্বন্ধের সহিত যুক্ত করিয়া, তাহার জন্য বিদেশে রাষ্ট্রসমূহের কার্য্য করিবার কথা বিপ্লবীরা প্রথমদিকে স্থিরভাবে চিন্তা করেন নাই। ১৯১১ সালে শ্রীযুক্ত অবনী মুখোপাধ্যায় এই উদ্দেশ্য লইয়া বিদ্যার্থীরূপে জার্মানী গমন করেন। অবনী জার্মান-সরকারের নিকট ভারতীয় বিপ্লববাদীদের অভিসন্ধি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু ভারতবাসী ও বিশেষতঃ বাঙালী যুবকেরা যে এইরূপ কোনো বিপ্লব-চেষ্টা করিতে পারে, তাহা অতিবিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞেরাও সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; এবং অবনীকে বাধ্য হইয়া জার্মানী ত্যাগ করিতে হইল। ইহার পর য়ুরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হইলে য়ুরোপের ভারতীয় বিপ্লববাদীরা পুনরায় জার্মান সরকারের সহিত মিলিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সুইটজারল্যাণ্ডে একদল যুবক আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিষয় অনেক জল্পনা কল্পনা করিতেন। চেম্পাকম্মন্ পিল্লৈ নামক একজন তামিল যুবক

ছিলেন এই দলের নেতা বা সভাপতি। ইঁহাদের দলেই বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন বিপ্লবী ছিলেন। জার্মানীতে অবনী মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বরকত উল্লা ছিলেন। আমেরিকা হইতে হরদয়াল আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আমেরিকায় যখন জার্মান-দূতের সহিত বৈপ্লবিকেরা কথাবার্তা বলিতে-ছেন, তাহারই কিছুদিন পরে জার্মানীস্থিত ভারতীয় বিপ্লববাদীরা একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন—তাহার মর্ম এই যে "ভারতে এই সময়ে বিপ্লব-চেষ্টার সাহায্য করিলে জার্মানীর এই যুদ্ধে কি সুবিধা হইতে পারে।" যাঁহারা এই পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাঁহারা বাঙালী-নামধারী। এই পুস্তিকা জার্মান-গভর্ণ-মেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করে ও তাহার ফলে বৈপ্লবিকেরা Foreign Officeএ আহুত হন। জার্মান গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় বিপ্লববাদীদের কিছু সংবাদ রাখিতেন এবং প্রবাসস্থিত বৈপ্লবিকদের কে কোথায় আছেন তাহারও সন্ধান রাখিতেন। জার্মান-সরকার স্থির করিলেন যে ভারতীয় বৈপ্লবিকদের স্বাধীনতা-সমরে তাঁহারা সাহায্য করিবেন।

জার্মানীতে ভারতীয় বিপ্লবী

এই অপ্রত্যাশিত সাহায্য পাইয়া বৈপ্লবিকেরা আশান্বিত হইলেন এবং এই কয় সর্তে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; (১) বৈপ্লবিকেরা জার্মান গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটা জাতীয়-ঋণ গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা এক দলিলে দস্তখত করিয়া দেন, যে ভারত স্বাধীন হইলে বৈপ্লবিকেরা ঐ ঋণ শোধ করিবেন। (২) জার্মানরা অস্ত্রশস্ত্রাদি সরবরাহ করিবে ও দেশ-বিদেশে তাহাদের যত প্রতিনিধি (consuls) আছে সকলে বৈপ্লবিকদের কর্মের সহায়তা করিবে। (৩) তুর্কী-গভর্ণমেণ্ট তখনও নিরপেক্ষ (neutral) ছিল, জার্মানদের পক্ষ হইয়া মিত্রশক্তির বিপক্ষে তাহাকে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে হইবে; এই 'জেহাদ' ঘোষণার ফলে ভারতীয় মুসলমানেরা

জার্মানদের সহিত সাহায্য সর্ত

ইংরাজের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবে ও তাহাতে ভারতে বিপ্লব-চেষ্টার সুবিধা হইবে। (ভূপেন্দ্রনাথ, বঙ্গবাণী ১৩৩১, আশ্বিন)

১৯১৪ সালের শেষাশেষি জার্মানীতে ভারতীয় বৈপ্লবিক-কমিটি (সরকারী নাম Indian Independence Committee) সংস্থাপিত হইল। এই কমিটির সর্বপ্রথম কর্ম হইল দেশ ও বিদেশস্থিত বৈপ্লবিকদের সংবাদ দান করা ও কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য আমন্ত্রণ প্রেরণ। এই আহ্বানে দেশে ও বিদেশে সাড়া পড়িয়া গেল। এই কমিটির নির্দেশমত অনেক বিপ্লবমত-বিশ্বাসী ছাত্র দেশে চলিয়া আসে ; তাঁহাদের অনেকে বার্লিন ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। পিংলেও বার্লিন হইয়া ভারতে ফিরিয়াছিলেন। এই কমিটিতে রাজামহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকত-উল্লা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ মনসুর, হরদয়াল ছিলেন। চারিদিক হইতে যুবকদের অর্থ দিয়া ভারতের চারিদিকে প্রেরণ করা হয়, যেন তাঁহারা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের এই সংবাদ ও কর্মের জন্য অর্থ প্রদান করেন। ভারতের চারিদিকে বৃদ্ধ হইতে যুবক পর্য্যন্ত বিভিন্ন ন্যাশনালিষ্ট ও বৈপ্লবিক নেতাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হয় ও অস্ত্রাদি আমদানীর ব্যবস্থার চেষ্টা করিবার পরামর্শ দেওয়া হয়। কমিটি স্থাপনার প্রারম্ভ হইতে ভারতীয় সমস্ত বৈপ্লবিক দলগুলিকে একত্র করিয়া কর্ম করিবার চেষ্টা করা হয়। বাহিরে আমেরিকার 'গদর' দল বার্লিন-কমিটির সহিত সম্মিলিতভাবে কর্ম করিতে আরম্ভ করায় কমিটির বিশেষ লোক-বল লাভ হয়। এই সময়ে হাজার হাজার শিখ ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। (ভূপেন্দ্রনাথ)

জার্মানীতে ভারতীয়-বৈপ্লবিক সমিতি

যুদ্ধ ঘনাইয়া উঠিলে বৈপ্লবিকদের কর্মচেষ্টা ও জার্মানদের সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। বরকত-উল্লা ভারতীয় বন্দীসৈন্যদের মধ্যে ইংরাজ-বিদ্বেষ প্রচারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পিংলে বার্লিন হইতে বৈদেশিক খবর প্রেরণের গুপ্ত সাঙ্কেতিক কোড (code) শিখিয়া তাঁহার এক বিশ্বস্ত

চন্দ্রকে তাহা শিখাইয়া তাহাকে শ্যামরাজ্যে প্রেরণ করিলেন। সেখান হইতে যুদ্ধের সংবাদ ছাপাইয়া চারিদিকে প্রচার করিবার মতলব হয়। হেরম্বলাল গুপ্ত আমেরিকায় জার্মানদের এজেন্ট হন; তাঁহার পরে ডাক্তার চন্দ্রকুমার ঐ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন। বার্লিন হইতে পারস্যের পথে বসন্ত সিংহ, কেদারনাথ ও করসাম্প (পার্শীযুবক) ভারতে আসিতেছিলেন; পথে ইংরাজের হাতে পড়িয়া তাঁহারা প্রাণ দেন। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ বৃন্দাবনের প্রেম-মহাবিদ্যালয় নামক একটি টেক্‌নিক্যাল স্কুলের স্থাপয়িতা; এই ধনী যুবক যুদ্ধারম্ভের কিছুকাল পরেই আফগানিস্থানের পথে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যান ও য়ুরোপে উপস্থিত হইয়া জার্মানীস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত যুক্ত হন। তাঁহার প্রতিভাবলে তিনি অল্পদিনের মধ্যে জার্মান ফরেন-অফিসের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া লন ও Vonder Goltzএর সহিত তিনি ও বরকত-উল্লা আফগানিস্থানে ষড়যন্ত্র করিবার জন্য উপস্থিত হন। মহেন্দ্রপ্রতাপ এশিয়ার বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভারতের বাহিরে বিপ্লব-চেষ্টার জন্য তিনি বহুলপরিমাণে দায়ী।

প্রবাসী বিপ্লবীদের বিচিত্র চেষ্টা

রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপ

জার্মানদের সহায়তা লাভের জন্য যেমন জার্মানীতে একদল বিপ্লবী চেষ্টা করিতেছিলেন, আমেরিকায় আমেরিকান-জার্মানদের ও মার্কিন-সরকারের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টাও হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে শ্রীসুরেন্দ্র কর আমেরিকায় রওনা হন; এই ক্ষীণ রুগ্ন যুবকের অদম্য উৎসাহ অসম সাহস ছিল। ইনি হরদয়াল প্রতিষ্ঠিত ও রামচন্দ্র পরিচালিত 'গদর' দলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন ও মার্কিন-দেশের জনসাধারণের নিকট ভারতের কথা প্রচার করেন। "বিগত মহাযুদ্ধের পর যখন প্রেসিডেন্ট উইলসন্ 'চৌদ্দ দফা সর্ত্তের' সৃষ্টি করেন, সেই সময় এই সুরেন্দ্র করই তাহার মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার

আমেরিকায় সুরেন্দ্র কর

দাবী উল্লেখ করিবার জন্য প্রেসিডেণ্টকে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই 'গদর'-সমিতি ভারতে বিপ্লব-সাধনের জন্য তিন লক্ষের অধিক টাকা এবং বহুলোক পাঠাইতে পারিয়াছিল। (বিপ্লববাদ)

জার্মানদের ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র ছিল (১) ভারতের পশ্চিম-প্রান্ত, (২) শ্যামরাজ্যের বাঙ্কক সহর ও (৩) জাভাদ্বীপের বাটাভিয়া সহর। শেষোক্ত দুইটি কেন্দ্র আমেরিকাস্থিত জার্মানদূতের অধীন ছিল; তাঁহারই ব্যবস্থা ও আদেশক্রমে সাংহাই ও জাভার জার্মান-কন্সালেরা কাজ করিতেন বলিয়া বোধ হয়। পশ্চিম প্রান্তস্থিত কেন্দ্রের কাজ ছিল প্রধানত মুসলমানজাতি ও রাজ্যসমূহের মধ্যে ইংরাজ-বিদ্বেষ সৃষ্টি; এটি জার্মানীর ফরেন-অপিসের অধীন ছিল বোধ হয়।

ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র

বঙ্গে বার্লিন-কমিটি সংস্থাপনের ও জার্মান সাহায্যের বার্তা য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রেরণ করা হয়। অর্থও লোকদ্বারা প্রেরিত হয় এবং সে অর্থও নিরাপদে পৌঁছায়। এই সংবাদের ফলে অনেক বাদানুবাদের পর বিভিন্ন দল একত্র হইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বার্লিন হইতে প্ল্যান (Plan) ঠিক ছিল বালেশ্বরে অস্ত্রাদি গ্রহণ করিতে হইবে। সেইজন্য বৈপ্লবিকেরা Harry & Sons প্রতিষ্ঠিত Universal Emporium নামক কারবার খুলিয়াছিলেন। (ভূপেন্দ্রনাথ)। বাঙ্ককের বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হইবার জন্য ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবক প্রেরিত হইল। ১৯১৫ সালের গোড়ায় জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাংলায় বিপ্লবীদের সংবাদ দিলেন যে জার্মানরা বাটাভিয়ায় বাঙালী-বিপ্লবীদের প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য বলিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য জার্মানদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য C. Martin নাম লইয়া বাটাভিয়া যাত্রা করেন। ঐ মাসেই অবনী মুখোপাধ্যায় জাপানে প্রেরিত হইল।

বাংলার বিপ্লবীদের সহিত যোগ

মার্টিন ওরফে নরেন্দ্র বাটাভিয়ায় উপস্থিত হইয়া জার্মান-কন্সালের সহিত পরিচিত হইলেন এবং খবর পাইলেন যে অস্ত্রশস্ত্র-বোঝাই জাহাজ আমেরিকা হইতে রওয়ানা হইয়াছে। নরেন্দ্রের কথামত ঐ জাহাজ সুন্দরবনে আসিয়া ভিড়িবে ঠিক হইল। Harry & Sons নামক ছদ্মনামধারী কারবারে জার্মান-এজেণ্টরা ৪৩,০০০ টাকা তারযোগে প্রেরণ করে; পুলিশ জানিবার পূর্বেই প্রায় ৩৩,০০০ বিপ্লবীদের হস্তগত হয়। নরেন্দ্র ১৯১৫ সালের জুন মাসে দেশে ফিরিয়া আসে। যতীন্দ্রনাথ, যাদুগোপাল, নরেন্দ্র, ভোলানাথ, অতুল ঘোষ প্রভৃতি বিপ্লবীরা আমেরিকা হইতে আগত Maverick জাহাজের বন্দুক গোলাগুলি কোথায় কিরূপ রাখিতে হইবে সে-বিষয়ে পরামর্শ করেন। স্থির হইল সুন্দরবনের হাতিয়াতে, কলিকাতা ও বালেশ্বরে সেগুলি ভাগ করিয়া রাখিতে হইবে। বাংলাদেশে সে-সময়ে যে সৈন্য ছিল তাহার জন্য বিপ্লবীরা ভয় পায় নাই; কিন্তু অপর প্রদেশে হইতে সৈন্য যাহাতে না আসিতে পারে, তজ্জন্য প্রধান প্রধান রেলওয়ে ব্রীজগুলি উড়াইয়া দিবার পরামর্শ হইল। যতীন্দ্র মাদ্রাস রেলপথের বালেশ্বরে, ভোলানাথ বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের চক্রধরপুরে, সতীশ চক্রবর্ত্তী ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের অজয়ের ব্রীজ উড়াইয়া দিবার জন্য প্রেরিত হইল। এ ছাড়া আরও অনেক আজগুবী কল্পনা হইয়াছিল।

মার্টিন ওরফে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিপ্লবের প্লান

য়ুরোপের ফরাসী চার-বিভাগ ভারতীয় বিপ্লবকারীদের ষড়যন্ত্রের কথা প্রথম জানিতে পারে। আগষ্ট মাসে ফরাশী পুলিশ ইংরাজ-সরকারকে জানাইল যে তাহারা জানিতে পারিয়াছে এই মাসে বাঙ্গালী বৈপ্লবিকেরা একটা বড় রকম বিপ্লব ঘটাইবে এবং জার্মানরা তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে। ৭ই আগষ্ট পুলিশ হ্যারি এণ্ড সন্সের দোকান খানাতল্লাসী করিল; কয়েক

বালেশ্বরের এম্পোরিয়াম

জনকে গ্রেপ্তার করিল। বালেশ্বরের Emporium খানাতল্লাসী করিতে করিতে সুন্দরবন-হাতিয়ার একখানি ম্যাপ আবিষ্কৃত হইল ও 'মাভেরিক' জাহাজ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্যও পুলিশ সংগ্রহ করিল। পুলিশ এখানে যে-সব সংবাদ পাইল, তাহাতে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। ম্যাজিস্ট্রেট অনেক পুলিশ, সৈন্য যোগাড় করিয়া যতীন্দ্র-প্রমুখ নিরুদ্দেশ বিপ্লবীদের ধরিবার জন্য যাত্রা করিলেন। বালেশ্বর হইতে ২০ মাইল দূরে কপ্তিপাদ নামক পার্বত্য স্থানে পঞ্চ বিপ্লবীর সহিত পুলিশের সাক্ষাৎ হইল। চিত্তপ্রিয় মারা পড়িল; যতীন্দ্রনাথ সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হইয়া অল্পকাল পরেই মারা যান। নীরেন্দ্র, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষ ধরা পড়িল। প্রথম দুইজনের ফাঁসি হইল; জ্যোতিষের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইল; বর্তমানে জ্যোতিষ বহরমপুরের পাগলা-গারদে। এই ঘটনার পর বাংলায় বিপ্লবীদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল।

Maverick জাহাজের কোনো সংবাদ না পাইয়া তাহারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া দুইজন কর্মীকে গোয়ায় প্রেরণ করিল। সেখান হইতে ভোলানাথ B. Chatterten নামে বাটাভিয়ায় 'মার্টিন'কে এক তার করে; ইতিপূর্বে মার্টিন বাটাভিয়ার জার্মান দূতের সহিত কিংকর্তব্য স্থির করিবার জন্য গিয়াছিলেন। গোয়ার তারের ব্যাপার পুলিশ জানিয়া সেখানে খোঁজ করিয়া ভোলানাথ ও তাহার সঙ্গীকে ধরে। ভোলানাথ কয়েকদিন পরে পুণার জেলে আত্মহত্যা করে। ওদিকে নরেন্দ্র দেশে বিপ্লব-চেষ্টার সকল আশা নিভিয়া গেল দেখিয়া বাটাভিয়া হইতে আমেরিকায় পলায়ন করিল। রাসবিহারী লাহোরে বিদ্রোহ জাগাইতে অসমর্থ হইয়া ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই ছদ্মবেশে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। তাঁহার পলায়ন ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। রাসবিহারীর নামে হুলিয়া ছিল; তথাচ সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি পুলিশকে ফাঁকি দিলেন। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ জাপান

বিপ্লবীদের শেষ দশা

যাইতেছেন। রাসবিহারী P. N. Tagore নাম লইয়া ও রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়—তাঁহার পূর্বে জাপানে গিয়া ব্যবস্থাদি করিতে হইবে এই অজুহাতে Pass-port প্রভৃতি লইয়া দেশত্যাগী হইলেন। Maverick আসিবার যখন কথা তখন তিনি জাপানে। অবনী মুখোপাধ্যায় রাসবিহারীর সহিত পরামর্শ করিবার জন্য জাপান গিয়াছিলেন। টোকিওতে রাসবিহারীর সহিত অবনীর দেখা হইল। তাঁহারা ঐ অঞ্চলের সকল বিপ্লবীকে সংঘবদ্ধ করিলেন এবং চীনদেশস্থ জার্মানদিগকে তাঁহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সাংহাই-এর জার্মান-কন্সালের সহিত তাঁহারা সাক্ষাৎ করিয়া ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ করিলেন। কিন্তু অবনী ফিরিবার সময়ে সিঙাপুরে ধরা পড়িল; তাহার নোটবুকে অনেক ঠিকানা, বিপ্লবীদের অনেক তথ্য টোকা ছিল; এই খাতা হইতে পুলিশ অনেক ঘটনা অনুসন্ধানের সুবিধা পাইল। বিচারে অবনীর মৃত্যুদণ্ড হইল। কিন্তু সে মৃত্যুকে এড়াইল; সিঙাপুর কেল্লা হইতে পলায়ন করিয়া অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়া জাভায় আশ্রয় গ্রহণ করে, সেখানে একজন য়ুরোপীয়ের ভৃত্য হইয়া য়ুরোপে চলিয়া গিয়া রুশিয়াতে বাস করে।

সাংহাই ও সিঙাপুরে বিপ্লবের আভাস

১৯১৫ সালে অক্টোবর মাসে সাংহাইতে একজন চীনার নিকট ১২৯টি পিস্তল ও ২০,৩৮০টি টোটা পাওয়া গেল। সেগুলি কলিকাতায় অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইবার কথা ছিল। সেগুলি বিপ্লবীরা ভারতবর্ষে বিপ্লব-সহায়তার জন্য প্রেরণ করিতেছিল। সাংহাই-এর ব্যাপার হইতে বিপ্লবের আরও অনেক ইতিহাস আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল; ব্রহ্মদেশেও সৈনিকদের মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দিয়াছিল। রাজদ্রোহ অপরাধে অমরসিং নামক একজন পঞ্জাবীর মান্দালেতে ফাঁসি হইল। সিঙাপুরের সৈন্যদের বিদ্রোহের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। মোট কথা সর্বত্রই এরূপভাবে বিপ্লবের আবর্ত শেষ হইয়া আসিতেছিল। এইবার আমরা মাভেরিক (Maverick) প্রভৃতি

জাহাজের কি হইল এবং কেন সেগুলি ভারতে আসিয়া পৌঁছিল না সেই ইতিহাস অনুধাবন করিব।

মাভেরিক (Maverick) ছিল Standard oil কোম্পানীর তেলের জাহাজ। একটি জার্মান কোম্পানী সেই জাহাজখানি ক্রয় করিয়া বিপ্লবীদের হাতে সমর্পণ করে। ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে কালিফোর্ণিওর San Pedro নামক এক বন্দর হইতে খালি জাহাজ রওয়ানা হইল। 'গদর'দলের নেতা রামচন্দ্র ও স্যানফ্রানসিস্‌কোর জার্মান-কন্সাল এই জাহাজের ব্যবস্থা করেন। ২৫ জন নাবিক ইহাতে ছিল, তন্মধ্যে পাঁচজন ভারতবাসী নিজেদিগকে পারসিক বলিয়া পরিচয় দিয়া চালাইয়া দেয়। কথা ছিল Anne Larson নামে আর একখানি জাহাজে জার্মানরা বন্দুক প্রভৃতি লইয়া পথে আসিয়া 'মাভেরিক'কে ধরিবে। কিন্তু সে জাহাজ পথেই মার্কিণ-গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ধৃত হয়; ওয়াশিংটনের জার্মান-কন্সাল মালগুলি তাঁহার নিজস্ব বলিয়া দাবী করিলেন, কিন্তু মার্কিণ-সরকার তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সেগুলি বাজেয়াপ্ত করিলেন। Maverick বহুকাল অপেক্ষা করিয়া যাভার দিকে খালিই রওয়ানা হইল। বাটাভিয়ায় জাহাজখানি কয়েকদিন থাকিয়া পুনরায় আমেরিকায় ফিরিয়া যায়; সেই জাহাজে নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমেরিকায় পলায়ন করে।

'মাভেরিক' ও অন্যান্য জাহাজের কি হইল

Henry S নামে আর একখানি জাহাজে জার্মানরা রসদ পাঠাইয়াছিল। ফিলিপাইনদ্বীপ হইতে জাহাজখানি সাংহাই পৌঁছিলে, সেখানে উহার মালপথ আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। কাষ্টাম্‌সে সমস্ত মালপত্র নামাইয়া লইল। অপর একখানি জাহাজেও গোলাগুলি আসিতেছিল, সেখানি আন্দামানের কাছে ইংরাজ ক্রুজার ডুবাইয়া দেয়।

Maverick ও Henry S এর রসদ সরবরাহের চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও জার্মানরা ভারতে অর্থ ও রসদ পাঠাইবার চেষ্টা হইতে বিরত হইল না।

ভাগ্যক্রমে কোনটিই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। Wehde ও Boehm নামক দুইজন আমেরিকান-জার্মান Henry S জাহাজে আসিতেছিল; তাহারা ধরা পড়িয়া আমেরিকায় প্রেরিত হইল। শিকাগোতে Wehde, Boehm ও হেড়ম্বলাল গুপ্তের বিচার হইল ও সকলেই শাস্তি পাইল। স্যানফ্রানসিস্কোতে একদল ভারতবাসীর বিচার হইল; কিন্তু এত গুরু অপরাধেও কাহারো ১৮ মাসের অধিক কারাগার হইল না।

স্যানফ্রানসিস্কোর মোকদ্দমা

এইরূপে বাহিরের সাহায্য লইয়া ভারত-স্বাধীন করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। শোনা যায় জার্মান সরকার ভারতীয়-বিপ্লবের জন্য এককোটি টাকা ব্যয় করেন; এই টাকার কিয়দংশ স্বার্থপর তথা-কথিত বিপ্লববাদীরা আত্মসাৎ করিয়াছিল; কিন্তু খুব বেশীর ভাগই জার্মানদের হাতেই পড়িয়াছিল। (বিপ্লববাদ)।

বিপ্লব ব্যর্থ হইল; তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার মত মালমশলা এখনো আমাদের হাতে আসে নাই এবং দার্শনিক চক্ষে দেখিবার মত কালের ব্যবধান এখনো পড়ে নাই। তবুও যে কয়টি কারণে সহজেই চক্ষে পড়ে তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথমত এই শ্রেণীর বিপ্লব জাগরণ করিয়া দেশ স্বাধীন করা বর্তমান যুগে অসম্ভব; কারণ আজকালকার শাসনপ্রণালী, চার-ব্যবস্থা, সমর-সজ্জা সমস্তই ইহার প্রতিকূল। দ্বিতীয়ত বিপ্লববাদ দেশমধ্যে প্রচার হয় নাই; জাতীয় জাগরণ আনিবার জন্য যে সাহিত্য প্রয়োজন তাহা সৃষ্ট হয় নাই। তৃতীয়ত বাহিরের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ রক্ষা না করিয়া ভারতের রাজনীতিকে টুক্‌রা করিয়া দেখিবার অভ্যাসবশত তাঁহারা ক্ষুদ্র ঘটনায় জোর দিয়াছিলেন। দেশের মধ্যে ডাকাতি, হত্যাদির ফলে বিপ্লববাদীরা দেশের মধ্য হইতে প্রাণ পাইল না—অথচ বাহিরের চক্ষে ভারতকে বড় করিয়া তুলিবার চেষ্টা, আত্ম-

বিপ্লব ব্যর্থ হইবার কারণ

র্জাতিক সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা তেমন নিষ্ঠার সহিত গৃহীত হয় নাই। চতুর্থত বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানে বাঙালী, পঞ্জাবী, মারাঠী প্রভৃতি জাতিরা অসমসাহস, কর্তব্য-নিষ্ঠা দেখাইয়াছিল। কিন্তু ইহার পাশেই কদর্য্য স্বার্থপরতা, নীচতা, অর্থ-লোভ, বিশ্বাস-ঘাতকতা বাসা বাঁধিয়াছিল। "পঞ্জাবী বৈপ্লবিকেরা বলেন যে, যুদ্ধের সময়ে বিপ্লবোত্তমের চেষ্টায় পঞ্জাবীরা প্রাণ দিয়াছে, আর বাঙালীদের মধ্যে কেহ কেহ টাকা চুরি করিয়াছে। কথাটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের দোষ ত্যাগ করিয়া সমষ্টির গুণ গ্রহণ করিলে গুণের দিকেই পাল্লা ভারি হয়।" (ভূপেন্দ্রনাথ)। কিন্তু ব্যক্তির দোষে জাতিও কলঙ্কিত হয়, কার্য্যও পণ্ড হয়। বৈপ্লবিক কর্মশীলতা জাতীয় জীবনে শিকড় গাড়িতে পারে নাই বলিয়া আজ ভারতবর্ষ সে-পন্থা ত্যাগ করিয়া অহিংসক-আন্দোলন গ্রহণ করিয়াছে এবং ভারতবাসী হিংসার পথে চলিয়া, হত্যাকাণ্ড করিয়া রাজনীতিকে পঙ্কিল করিবে না বলিয়া কৃতসংকল্প হইয়াছে।

———o———

পঞ্চম পর্ব

বাংলায় নূতন আইন

গত ২৪শে অক্টোবর ১৯২৪ সালে বড়লাট বাহাদুর বিশেষ হুকুম জারী (Ordinance) করিয়া বাংলাদেশকে বিপ্লবী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; এবং দেশকে 'আতঙ্কের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য' বিশেষ আইন জারী করিয়াছেন। সেই আইনের সাহায্যে তাঁহারা প্রায় ৭২ জন যুবক ও কর্মীকে বন্দী করিয়াছেন। ৫০০ স্থানে খানাতল্লাস হইয়াছে। এই সকল স্থানে খানা তল্লাসের উদ্দেশ্য—বোমা, রিভলবার, মসার পিস্তল, অগ্নিকাণ্ডের সরঞ্জাম, মসলা ও নিষিদ্ধ পুস্তক প্রভৃতি পাওয়া। কিন্তু কোনো স্থানে কিছু পাওয়া গিয়াছে বলিয়া কাগজে জানা যায় নাই। নিম্নে আমরা এই আইনের মর্ম উদ্ধৃত করিতেছি—

১৯২৪
২৪ অক্টোবর

"বাঙ্গালার সংশোধিত ফৌজদারী নূতন আইনে" এই প্রকার ব্যবস্থা আছে :—

যে কোন লোক প্রথম ধারার অপরাধে অপরাধী, এই নূতন আইন অনুসারে নিযুক্ত কমিশনারদের নিকট স্থানীয় সরকার তাহাদের বিচারের লিখিত আদেশ দিতে পারেন।

এই আইনের মামলার বিচার তিনজন কমিশনার করিবেন। বিচারকদের মধ্যে বিচার-বিভাগের অন্ততঃ দুইজন লোক লইতে হইবে। তাঁহাদের অন্ততঃ তিন বৎসরকাল দায়রাজজ বা অতিরিক্ত দায়রাজজের কাষ করা

১৯২৪ অব্দের
নূতন আইন

দরকার, আর একজন হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইবার মত উপযুক্ত হওয়া দরকার।

আসামীরা বিচারার্থ উপস্থিত না হইলেও এই নূতন আইন অনুসারে নিযুক্ত কমিশনারেরা তাহাদের বিচার করিতে পারেন। বিচারের সময় কমিশনারেরা ৩৫৬ ধারা অনুসারে সাক্ষ্যবাক্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

বিচারের জন্য আবশ্যক মনে করিলে কমিশনারেরা মামলা মুলতুবী রাখিবেন, অন্যথা মুলতুবী রাখিতে বাধ্য হইবেন না।

কমিশনারদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে অধিকাংশের মত গ্রাহ্য হইবে।

কমিশনারেরা আইন অনুযায়ী যে কোন দণ্ড ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

কমিশনারেরা কোন আসামীর বিচার করিবার সময়, যে-ব্যক্তি কোন অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অথবা তাহার সাহায্যকারী, তাহার সম্বন্ধে সকল কথা জানিবার জন্য যে-ব্যক্তি তাহার জানা সকল ঘটনা ও সকল লোকের নাম প্রকাশ করিয়া দিবে, তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিবেন।

কমিশনারের বিচারে দণ্ডিত যে-কোন ব্যক্তি হাইকোর্টে আপীল করিতে পারেন। হাইকোর্ট ৩১ অধ্যায়ের নিয়ম অনুসারে সে আপীলের বিচার করিবেন।

যখন কমিশনারেরা প্রাণদণ্ড দিবেন, তখন সে-মামলার কাগজপত্র হাইকোর্টে পাঠাইবেন। হাইকোর্ট দণ্ড সমর্থন না করিলে আসামীর দণ্ড হইবে না।

যে ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিবেচনা করিবেন অথবা এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিবেন যে, কোন ব্যক্তি—

(১) ভারতীয় অস্ত্র-আইন (১৮৭৮ খৃঃ) ও বিস্ফোরক-আইনের (১৯০৮ খৃঃ) ধারার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিয়াছে, করিতেছে অথবা করিতে উদ্যত হইয়াছে

(২) দ্বিতীয় ধারার কথিত অপরাধ করিয়াছে, করিতেছে অথবা করিতে উদ্যত হইয়াছে, যে-ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিশ্বাস করিবেন যে, সে-ব্যক্তি কোন সমিতির (যেরূপ সমিতির উদ্দেশ্য বা কার্য্য প্রণালীর মধ্যে ঐরূপ কার্য্য অথবা ঐরূপ অপরাধ করার কথা আছে) সদস্য বা সেরূপ কোন সদস্য কর্তৃক পরিচালিত অথবা উত্তেজিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা নিম্নলিখিতরূপ এক বা একাধিক আদেশ দিতে পারেন; সে ব্যক্তি—

(ক) আদেশমত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নিজ বাসস্থান ও তাহার পরিবর্তনের কথা জানাইবে।

(খ) নির্দেশমত সময়ে ও নিয়মে পুলিশের নিকট নিজের সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবে।

(গ) নির্দেশমত চলিবে এবং নিষিদ্ধ কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হইবে।

(ঘ) বৃটীশ ভারতের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে বাস করিবে।

(ঙ) আদেশপত্রে কথিত স্থানে প্রবেশ অথবা বাস করিবে না।

(চ) কোন জেলে হাজতে রাখা হইবে।

বড়লাটের সম্মতি ব্যতীত স্থানীয় সরকার বাংলার বাহিরের কোন স্থান (ঘ) দফা অনুসারে এবং কোন জিলা (চ) দফা অনুসারে নির্দেশ করিবেন না।

নূতন ক্ষমতা

স্থানীয় সরকার (১) উপধারা অনুসারে আদেশ করিতে পারেন।

(ক) যে কোন স্থানে তাহার বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার।

(খ) যে কোন স্থান খানাতল্লাস; যে স্থান (১) উপধারা অনুযায়ী অপরাধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, হইতেছে অথবা হইবার উপক্রম হইতেছে।

সরকারের যে-কোন কর্মচারী, স্থানীয় সরকার কর্তৃক সাধারণ অথবা বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া যে-কোন লোককে বিনা পরোয়ানায়

গ্রেপ্তার করিতে পারে। সে-লোকটীর সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ থাকিলেই তাহার বিরুদ্ধে ৩২ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী আদেশ করিবার মত আইন অনুসারে কারণ ঘটিলেই, তাহাকে এইভাবে গ্রেপ্তার করা চলিবে।

যে-ব্যক্তি উক্ত ধারা অনুযায়ী অপরাধ করিয়াও আদেশ অগ্রাহ্য করিবে তাহাকে কারাদণ্ড দেওয়া হইবে এবং জরিমানাও করা যাইতে পারে। কারাদণ্ডের পরিমাণ তিন বৎসর পর্য্যন্ত হইতে পারে।

আদেশ প্রদানের এক মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকার দুইজন বিচারকের (২য় দায়রা জজ, অথবা অতিরিক্ত দায়রা জজ যাঁহারা অন্ততঃ ৫ বৎসর-কাল উক্ত পদে কাজ করিতেছেন) নিকট উক্ত আদেশ প্রদানের কারণ, ঘটনা ও বিবরণ আদি উপস্থিত করিবেন। যে-সকল বিবরণ তদন্তের পক্ষে উপযোগী, এবং পরে যে-সকল বিবরণ জানা যাইবে, যে-সকল অভি-যোগ আসামীর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করা হইবে, সে-সম্বন্ধে আসামী যে উত্তর দিবে সে-সব উপস্থিত করিতে হইবে। বিচারকেরা বিচার বিবে-চনা করিয়া স্থানীয় সরকারের নিকট রিপোর্ট করিবেন—ঐরূপ আদেশ প্রদান করিবার আইন সঙ্গত ও যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন কি না।

এই নূতন আইন অনুসারে জ্ঞানবিশ্বাসমতে যাহা করা হইবে বা করিবার সঙ্কল্প করা হইবে, তাহার জন্ম কোন মামলা মোকদ্দমা করা যাইতে পারিবে না।

প্রথম ধারা

সমিতির (যাহার উদ্দেশ্য বা কার্য্য প্রণালীতে নিম্নলিখিত কোন অপ-রাধ করার কথা আছে) সদস্য অথবা কোন সেরূপ সদস্য কর্ত্তৃক উত্তেজিত বা পরিচালিত কোন লোক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এই সকল অপরাধ।

(ক) ভারতীয় দণ্ডবিধির নিম্নলিখিত যে কোন ধারা অনুযায়ী যে কোন অপরাধ ১৪৮, ৩০২, ৩০৪, ৩২৬, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭,

৩৯২, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪৩১, ৪৩০, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪৪, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০ ও ৫০৫।

(খ) ১৯১৮ অব্দের বিস্ফোরক-দ্রব্য-আইন অনুযায়ী যে কোন অপরাধ।

(গ) ১৮৭৮ অব্দের ভারতীয় অস্ত্র-আইন অনুযায়ী যে কোন অপরাধ।

(ঘ) উপরিলিখিত যে কোন অপরাধ করিবার বা তাহাতে সাহায্য করিবার চেষ্টা বা ষড়যন্ত্র।

দ্বিতীয় ধারা। ভারতীয় দণ্ডবিধির নিম্নলিখিত যে কোন ধারার অনুযায়ী অপরাধ (১) ১৪৮, ৩০২, ৩০৪, ৩২৬, ৩২৯, ৩৩২, ৩৩৩, ৩২৯, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪৩১, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৫৫০, ৪৫৪, ৪৫৭ ও ৬০৬।

(১) উপরিলিখিত যে কোন অপরাধ করিবার বা তাহাতে সাহায্য করিবার চেষ্টা বা ষড়যন্ত্র।

সরকারের এই আদেশের প্রতিবাদ করিবার জন্য সমগ্র বাংলাদেশ এক হইল। সারা বাংলায় প্রতিনিধিবর্গের স্বাক্ষরিত ইস্তাহার প্রকাশিত হইল। ৩০শে অক্টোবর কলিকাতায় টাউনহলে লর্ড লীটনের আদেশের প্রতিবাদ-সভা হইল ও পরদিন সমগ্র বংলায় হরতাল হইল। গান্ধীজি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লিখিলেন "এই ঘটনায় যেন আমাদিগকে বিভীষিকাগ্রস্ত না করে। আজ রাউলাট এক্ট মরিয়াছে, কিন্তু যে-ভাব রাউলট এক্টকে জন্ম দেয়, তাহা এখনও অক্ষুণ্ণ ও অম্লান হইয়া রহিয়াছে। যতদিন ভারতবাসীর স্বার্থের সহিত ইংরাজের স্বার্থ মিলিবে না, ততদিন বৈপ্লবিক অরাজকতা অথবা তাহারই আশঙ্কা-সংশয় থাকিবেই, এবং ততদিন রাউলাট এক্টের নব নব সংস্করণ ঘটিবে, ইহা অনিবার্য্য। ইহার উত্তরে,

বেঙ্গল অর্ডিনান্স

গান্ধীজির প্রতিবাদ

একমাত্র অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনই মুক্তির উপায় করিতে পারিত; কিন্তু আমাদের তাহা পরীক্ষা করিবার যথেষ্ট ধৈর্য্য ও যথেষ্ট সামর্থ্য ফুটিয়া উঠিল না।”

কলিকাতায় কয়েকদিন পরে গান্ধীজি, মতিলাল নেহেরু আসিলেন। সকলের ইচ্ছা স্বরাজ্য-দল, সত্যগ্রহী-দল, এক হইয়া কার্য্য করেন। বাংলাদেশের এই নিদারুণ অবস্থা মিলিবার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়তা করিল। গান্ধীজি কলিকাতায় আসিয়া নেতাদের সহিত মিলিত হইলেন—তিনি কলিকাতায় যেরূপ অভ্যর্থনা পাইলেন তাহাতে বেশ বুঝা গেল যে লোকে তাঁহার সহিত একমত না হইলেও তাঁহাকে পূজা করে। গান্ধীজির সহিত স্বরাজ্যদলের মিলনের জন্য এক সন্ধি-পত্র প্রস্তুত হইল, আমার নীচে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

গান্ধী নেহেরুদাস সন্ধিপত্র

“যেহেতু স্বরাজ্যই ভারতের সকল সম্প্রদায়ের একমাত্র লক্ষ্য হইলেও, আজ দেশ বিভিন্ন প্রকার দলে বিভক্ত, যাহারা আপাতদৃষ্টে পরস্পর বিরুদ্ধ কাজ করিতেছে;

ও যেহেতু এরূপ বিরোধী কার্য্য জাতির স্বরাজ্য-মুখে উন্নতি-যাত্রার পথে প্রত্যবায় সৃষ্টি করিতেছে;

ও যেহেতু ইহাই বাঞ্ছনীয় যে, যতদূর সম্ভব সকল দলকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ও একই সাধনপীঠে আনিয়া দাঁড় করান হয়;

ও যেহেতু আবার স্বয়ং কংগ্রেসই এক্ষণে দুই বিরোধী দলে বিভক্ত, আর তার ফলে দেশের সাধনাই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে;

ও যেহেতু ইহাই বাঞ্ছনীয় যে, এই অখণ্ড-দেশ মুক্তির সাধনা সিদ্ধ করিবার জন্য এই দুই দল পুনঃ-সম্মিলিত হয়;

ও যেহেতু বাংলায় স্থানীয় শাসনপক্ষ কর্তৃক বড়লাট বাহাদুরের সম্মতি লইয়া দমন নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে;

ও যেহেতু নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীগণের অভিমতে, এই দমননীতি যথার্থই বিপ্লবপন্থীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হইয়া, পরন্তু বাংলার স্বরাজ্যদলের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, আর তার মানে উহা বিধি-তন্ত্র ও শৃঙ্খলানিষ্ঠ আন্দোলন মাত্রের বিরুদ্ধেই লক্ষীভূত হইয়াছে ; এবং—

যেহেতু এই কারণেই এক্ষণে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, সকল দলকে আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের সাহচর্য্য গ্রহণ করা হয়, যাহাতে ঐক্য-বদ্ধ জাতি সমবেত শক্তি চালিয়া এই দমননীতির প্রতিবিধানে তৎপর হয়—

অতএব আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ বক্ষ্যমাণ কর্মনীতিই সর্বদলের গ্রহণীয় ও পরিণামে বেলগাঁও কংগ্রেসেও অবলম্বন করিতে সানির্বন্ধ পরামর্শ দিতেছি :—

কংগ্রেসে জাতীয় কর্মতন্ত্ররূপে অসহযোগ-নীতি গ্রহণ করা স্থগিত থাকুক ; কেবল ভারতে প্রস্তুত ছাড়া বস্ত্র ব্যবহার বা পরিধান করা হইবে না, এই বিষয়ে অসহযোগ-নীতি অক্ষুন্ন থাকিবে।

কংগ্রেসে আরও ইহা স্থির হইয়া যাউক যে, উহার বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মগুলির ভার প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন দল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ভাগ করিয়া লইবে।

আরও স্থির করা হউক যে, হাতে-কাটা সূতায় হাতে-বোনা খদ্দর প্রচলনের জন্য যে চরকা, তাঁত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যসাধন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিশেষ হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ঐক্য-সংবৃদ্ধির জন্য কার্য্য এবং হিন্দুদের মধ্যে স্বসমাজের অস্পৃশ্যতা নিরাকরণের কার্য্য, এই কাজগুলি কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত সকল শ্রেণীই করিবে—এবং ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভা সংক্রান্ত কার্য্য করিবার ভার কংগ্রেসের সপক্ষে স্বরাজ্য-দলই গ্রহণ করিবে ও কংগ্রেসের সঙ্ঘতন্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়া তাহারা এই কার্য্য করিবে। আর এই কার্য্যের জন্য স্বরাজ্যদল নিজমত বিধি প্রণয়ন ও নিজ অর্থভাণ্ডার ব্যবস্থা করিবে।

যেহেতু অভিজ্ঞতাবলে বুঝা গিয়াছে, যে সার্বজনীন সূতা-কাটা ব্যতীত ভারতবর্ষ বস্ত্রবিষয়ে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারে না এবং যেহেতু চরকায় সূতা-কাটাই জনসাধারণের সহিত কংগ্রেস-বিশ্বাসী নর-নারীর মিলন-পরিচয়ের এক প্রত্যক্ষ ও সারবান্ উপায়—আর দেশব্যাপী চরকা প্রবর্তন ও খদ্দর প্রচলনের জন্যই কংগ্রেসকে তার অনুষ্ঠান-তন্ত্রের ৭নং বিধি প্রত্যাহার করিয়া নিম্নলিখিত বিধানটি তৎস্থলে প্রতিষ্ঠা করা উচিত :—

মূল কংগ্রেসের বা কংগ্রেস-কমিটির সভ্য হইতে হইলে, তাহার বয়স ১৮ বৎসরের উপর হাওয়া চাই এবং তার রাজনৈতিক ও কংগ্রেস-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদিতে ও কংগ্রেসের কার্য্যনির্বাহ কালে হাতে-কাটা সূতায় ও হাতে-বোনা খদ্দর পরিধান না করিলে চলিবে না এবং প্রত্যেক সভ্যকেই প্রতিমাসে নিজের কাটা সমান-পাকের সূতা পরিমাণে ২০০০ গজ চাঁদা স্বরূপ না দিলে চলিবে না ; কেবল অসুস্থ হইলে, কিম্বা ও অন্য অপরিহার্য্য কারণে অসমর্থ হইলে অপরের দ্বারা উক্ত পরিমাণ সমান-পাকের সূতা কাটাইয়া দিলেও চলিবে।

শ্রীমোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস
শ্রীমতিলাল নেহেরু

ইহার পর ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে কর্ণাটদেশে বেলগাঁতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। গান্ধীজি সভাপতি হইলেন। স্বরাজদলের সহিত যে মিলনের সন্ধি-পত্র হইয়াছিল, এখানেও তাহা গৃহীত হইল। বাংলাদেশের দুরবস্থায় সকলে সহানুভূতি দেখাইলেন।

এদিকে বাংলার সরকারের দিক হইতে পূর্বোল্লিখিত অর্ডিনান্সকে পাকা আইনে পরিণত করিবার জন্য বিল আনা হইবে স্থির হইল। পূর্বোক্ত আইন বিধি-অনুসারে মাত্র ছয়মাস কার্য্যকারী থাকিতে পারে। দেশে খুবই প্রতিবাদ হইতে লাগিল। তথাচ সরকারী তরফ হইতে বিল

আনীত হইল। কিন্তু কৌন্সলে সরকারী-পক্ষ ভোটে হারিয়া গেলেন। সরকার দেশের মধ্যে যে ভীষণ বিপ্লব কল্পনা করিয়াছেন ও যত উদাহরণ ও নজীর দিয়াছেন তাহাতে দেশবাসী মোটেই তুষ্ট হয় নাই। এমন কি স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র যিনি রাউলট কমিটিতে ছিলেন, তিনিও ইহার প্রতিবাদ করিলেন ও সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। (৭ই জানুয়ারী ১৯২৫)

সার হিউ ষ্টিফেনসন উক্ত বিল আনিবার সময়ে বাংলার যে বিপ্লবের চিত্র দিয়াছিলেন, তাহার আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া এই পর্ব শেষ করিব।

সার হিউ ষ্টিফেনসনের বক্তৃতা

সার হিউ ষ্টিফেনসন বলেন, আমি ফৌজদারী দণ্ডবিধির সংশোধন মানসে একটী নূতন বিল উত্থাপন করিবার প্রস্তাব করিতেছি; এই বিল পাঁচ বৎসর কাল বলবৎ থাকিবে। সরকারের মতে, এই আইন চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে, রাউলাট কমিটিও তাহা মানিয়া লইয়াছেন।

ভীষণ ষড়যন্ত্র

দেশে যে ভীষণ ষড়যন্ত্র বর্তমান, সে-বিষয়ে ইতিপূর্বেই অনেক প্রমাণ-পত্র পাওয়া গিয়াছে। ইতিপূর্বেই এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ৩টী খুন, দুইবার খুনের চেষ্টা, একটি বোমার কারখানা আবিষ্কারের কথা জানিতে পারা গিয়াছে; 'রক্তবাংলা' নামক এক ইস্তাহার ইতিমধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, উহাতে পুলিশ কর্মচারী এবং যাহারা সরকারকে সাহায্য করিতেছে বলিয়া বিপ্লববাদীরা সন্দেহ করিবে, তাহাদিগকে হত্যার ভয় দেখান হইয়াছিল। ইহাছাড়া সরকার জুলাই মাসের প্রারম্ভে আরও পাঁচটী হত্যার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া খবর পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কাগজে প্রকাশিত হয় নাই।

গভর্ণমেণ্টের মতে সিরাজগঞ্জ-প্রস্তাব এই ষড়যন্ত্রের অনেক উৎসাহ দান করিয়াছিল।

গত সপ্তাহে (১৯২৫ জানুয়ারীর প্রথমে) সরকার একখানি পুস্তিকা

বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন ; আপনারা হয়ত অনেকেই শচীন্দ্রনাথ সান্যালের বিপ্লবময় জীবনের ইতিহাস জানেন, তিনি উহাতে লিখিয়াছেন যে, "যাঁহারা বলেন ভারতে বিপ্লবমূলক কোন আন্দোলন নাই, এবং দমননীতিমূলক কোন ব্যবস্থাকে যাঁহারা সরকারের অত্যাচার বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ঠিক কথা বলেন না। কেননা বিপ্লববাদমূলক এক ভীষণ ষড়যন্ত্র এ-দেশে বাস্তবিকই আছে, ঐ দল বিপ্লব-বাদের ভিতর দিয়াই দেশের স্বাধীনতা আনয়ন করিতে চাহে।" বর্তমানে রাজবন্দী একজন বিপ্লববাদী বিপ্লববাদ প্রচারের কার্য্য-তালিকা কি-ভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন আমি তাহার একটু নজির আপনাদিগকে দিতে চাই। কি-ভাবে সমস্ত খোজ-খবর জোগাড় করিতে হইবে, এই কার্য্যতালিকায় তাহারই নির্দেশ ছিল :—

ভিতরের ইতিহাস

(১) সরকারী কার্য্যালয় (ক) আদালত (খ) থানা (গ) ট্রেজারী (ঘ) ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিস।

(২) পুলিশ ষ্টেশনে পুলিশের সংখ্যা, এবং রিজার্ভ পুলিশ।

(৩) ইংরেজ অফিসারদিগের আবাসস্থল।

(৪) রেল ষ্টেশন ও রেল লাইন।

(৫) অর্থবান লোকদের বাসস্থান—আবশ্যকীয় খবর।

খবরাখবর এবং গোয়েন্দার কার্য্য।

(ক) অন্যান্য লোকদের কার্য্য (খ) সরকারের কার্য্য (গ) সরকারের ক্ষমতা (ঘ) শক্তি সংগ্রহের উপায়। যখন শিক্ষা-নবীশিতে আসিয়া বিপ্লববাদীগণ প্রবেশ করে, তখন তাহাদিগকে ঐ সমস্ত বিষয়ে শিক্ষিত এবং পারদর্শী করিয়া তোলা হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয় :—

(ক) গুলিছোড়া (খ) ছোরাচালন (গ) বিস্ফোরক (ঘ) লাঠি। এতদ্ব্যতীত বিপ্লববাদীদিগের বিগত বিপ্লবের ইতিহাস মনোযোগ সহকারে

আলোচনা করিতে হয়, উহাতে তাহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্য সাধিত হয় এবং পূর্ববারের অপেক্ষা কৃতিত্বের সহিত তাহারা কাজ করিতে পারে। অস্ত্র-শিক্ষা গোপন রাখার সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশও উহাতে আছে।

বিপ্লবের বিস্তৃতি সম্বন্ধে আমি এখন কয়েকটী কথা বলিতে চাই। বর্তমানে রাজবন্দী একজন নেতার নিকট ঐ সম্বন্ধে কতকগুলি কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে। তিনি বাংলার বাহিরে বিপ্লববাদ নিয়ন্ত্রিত করার কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তাহার একখানি কার্য্যবিবরণী সরকারের হস্তগত হইয়াছে। উহার কতকটা আমি আপনাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি।

বিপ্লবের বিস্তৃতি

(১) এক্ষণে কেবলমাত্র দুই ভাবে কাজ চালান হইবে (ক) প্রচার (খ) অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ।

(২) প্রচার সম্পর্কে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবিলম্বিত হইবে।

(ক) গোয়েন্দাদের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন তুলিতে হইবে। (খ) দমননীতিমূলক আইন-কানুনের বিরুদ্ধে আন্দোলন জাগাইয়া তুলিতে হইবে। (গ) আমাদের কার্য্যে বিরুদ্ধতামূলক কংগ্রেস-প্রস্তাবগুলির তীব্র সমালোচনা করা (ঘ) বোলশেভিকবাদ প্রচার (ঙ) প্রচারের জন্য ইতিবৃত্তি গল্প প্রভৃতি সংগ্রহ করা।

(৩) সমিতির কাজ গোপন রাখিবার জন্য সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা।

(৪) প্রত্যেক জেলার কর্মচারীকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তিনি যেন সমস্ত মহকুমা এবং গ্রাম্য-কেন্দ্রগুলিকে সাহায্য করেন এবং আদিষ্ট হইলেই আমাদের সমিতির নীতি-পদ্ধতি স্মরণ করিয়া সেইভাবে প্রণোদিত হইয়া কংগ্রেসে ঢুকিয়া পড়েন।

(৫) কর্মচারীদিগকে কার্য্য ভাগ করিয়া দিবার জন্য জেলা-সমিতি-

গুলিকে নিম্নলিখিত উপায়সমূহ অবলম্বন করিতে হইবে। (১) গ্রাম্য সংগঠন (২) গুপ্ত কার্য্যাবলী (৩) আরও ছোটখাট নানারূপ বিপ্লববাদ সহায়ক কার্য্য। ঐ কাগজখানাতে বাংলার বাহিরের ২৩টা জেলাতে ঐ প্রকার সমিতি এবং কর্ম-প্রচেষ্টার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ; ঐ সকল সমিতি রীতিমত ভাবে কাজ চালাইতেছেন।

আপনারা হয়ত বলিবেন গত ২৫শে অক্টোবর পুলিশ খানাতল্লাসে কোন অস্ত্রশস্ত্র পায় নাই। কাজেই বিপ্লববাদীদিগের হাতে কোনই অস্ত্রশস্ত্র নাই ; কিন্তু আপনারা জানেন, অনেক পূর্বেই এই বিপ্লববাদের অস্তিত্বের কথা প্রমাণিত এবং প্রকাশিত হইয়াছিল ; কাজেই বিপ্লববাদীরা যে পুলিশের নাগালের ভিতর কোন অস্ত্রশস্ত্র রাখিবেন না ইহা আপনারা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। বিপ্লববাদ সম্পর্কে যত খুন হত্যা বা হত্যার চেষ্টা এযাবৎ এদেশে হইয়াছে, তাহাতে যে-সমস্ত গোলাগুলি, বোমা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা দেখিয়াই বোঝা যায় যে, উহা কোন গুপ্ত সমিতি কর্তৃক আমদানী করা হইয়াছে— আমরা জানি ভারতে গোপনে বোমা তৈয়ারী হইয়াছে, ৬টা বোমা এবং একটা শেল "ওয়ার্ড" ইনষ্টিটিউসনে পাওয়া গিয়াছিল। আমরা খবর পাইয়াছি ঐ প্রকার আরও অনেক বোমা তৈয়ারী হইয়া থাকে। সম্প্রতি ফরিদপুরে যে কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, উহাতে যে-তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে,— তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মানে হয় যে, শুদ্ধ কলিকাতাতেই কারখানা আবদ্ধ নহে, বোমার কারখানা আরও অনেক স্থানেই আছে।

অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ

আমরা জানি, অনেকের অনেক অস্ত্রশস্ত্র চুরি গিয়াছে, বন্দর হইতেও অস্ত্রশস্ত্রের বাক্স অনেক চুরির কথা আমরা শুনিয়াছি। বর্তমান বৎসরের মধ্যে কলিকাতা হইতে ৩৪টি চোরাই পিস্তল বাহির করা হইয়াছে। বিশ্বাস হয়, দেশে প্রবলভাবে বিপ্লবের স্রোত চালাইবার উপযুক্ত উৎসাহ দেশেই আছে এবং প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্রও তাহাদের হাতে আছে।

আমরা জানি, গতযুদ্ধের সময় বিপ্লববাদীদল একটা কিছু করিয়া ফেলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। উহারা জার্মানদের সাহায্যে ভারতে এক জাহাজ মাল আনিবার চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু সে-অভিলাষ তাহাদিগের সিদ্ধ হয় নাই। ঐ সময়ে পয়সা দিলেই এবং মাল গ্রহণ করিবার সুবিধা করিতে পারিলেই, সকল দেশই সকলকে মাল দিতে রাজী ছিল। আমরা জানি, জার্মান হইতে এদেশে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র-শস্ত্র আমদানী করিবার জন্য একজন নেতা সুদূর প্রাচ্যে বসিয়া খুব চেষ্টা করিতেছেন। আপনাদের হয়ত মনে আছে, গত বৎসরের মধ্যেই দারবান, কলোম্বো, সাংহাই, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ জাহাজ ধরা পড়িয়াছে। আমরা খবর পাইয়াছি, ঐ সমস্ত জাহাজের দুইখানা জাহাজ ভারতের বিপ্লববাদীদের জন্যই আসিয়াছিল।

জার্মানীর সঙ্গে যোগ

অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, এ কথা আপনারা কেহই বিশ্বাস করিবেন না। অশ্বিনীবাবুকে আমি ব্যক্তিগতভাবে না জানিলেও কৃষ্ণকুমার মিত্র মহোদয়কে আমি বিশেষভাবে জানি। এই ভদ্রমহোদয় যে কোন গুপ্ত-ষড়যন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, এ কথা আমিও স্বীকার করিতেছি। ইহাদিগকে ৩ আইনে আটক করা হইয়াছিল, শুধু ইঁহাদের প্রকাশ্য ইংরেজ বিদ্বেষ প্রচারের জন্য। ইঁহারা কোন প্রকার ভাব গোপন না করিয়াই দেশময় ইংরেজ বিদ্বেষ তীব্রভাবে প্রচার করিতেন। অশ্বিনীবাবুর সম্বন্ধেও আর একটী কারণ এই ছিল যে সমগ্র ব্রজমোহন কলেজটি ছিল তাঁহার মুঠার মধ্যে, আর ঐ ব্রজমোহন কলেজ হইতে তাঁহারই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া বৎসর বৎসর দলে দলে প্রচণ্ড ব্রিটিশ বিদ্বেষী যুবকদল বাহির হইয়া আসিতেছিল। আর একজনের সম্বন্ধেও ঐ অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। তিনি হইতেছেন কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্তমান চীফ একজিকিউটিভ অফিসার। তাঁহার সম্পর্ক

অশ্বিনীকুমার ও কৃষ্ণকুমার

মিঃ স্কার পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন যে, শ্রীযুত সুভাষবাবু কোন বৈপ্লবিক সভায় যোগ দিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; কেবল মাত্র এই খবর তিনি পাইয়াছেন। কিন্তু মিঃ স্কারের এই উক্তি যথার্থ সত্য নহে। তিনি হয়ত এ সম্বন্ধে সঠিক খবর পান নাই। যাহা হউক, শ্রীযুত সুভাষ বাবুর বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা এবং অনুসন্ধান করা হইতেছে, যদি তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন, তাহা হইলে সত্বর তাঁহাকে মুক্তি দান করা হইবে।

পূর্ব হইতে এই সমস্ত বিপ্লববাদের জন্য সাবধানতা করা বিশেষভাবে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্যই বর্তমান আইন ব্যবস্থাপক-সভায় উত্থাপিত হইতেছে। যদি এই শক্তি দেশের সর্ববিধ অনিষ্টকর বিপ্লববাদ দমনে যথেষ্ট না হয়, তাহা হইলে আবার আমরা অধিকতর ক্ষমতার জন্য কাউন্সিলে সমবেত হইব। দেশের উন্নতি রাষ্ট্রনৈতিক পথে যতদূর অগ্রসর হয়, সকলেরই সেদিকে যত্নশীল হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু আপনারা দৃঢ়ভাবে মনে রাখিবেন, বিপ্লববাদ শুধু দেশের রাষ্ট্রনৈতিক গতিকে পিছাইয়াই দিবে। কাজেই বিশেষ আবশ্যক বোধে আমি সকলের সম্মুখে এই অবশ্য গ্রহণীয় উপায় উপস্থিত করিতেছি। আপনারা, ভারতীয় এবং শ্বেতাঙ্গ, হিন্দু এবং মুসলমান সকলেই বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া যাহাতে এই আইন পাশ হইতে পারে, যাহাতে দেশকে ভীষণ বিপ্লববাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া প্রকৃত উন্নতির পথে আগাইয়া লওয়া যায়, সেজন্য বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া যে-পন্থা অবশ্য অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করেন, তাহা গ্রহণ করিবেন।" *

সতর্কতা

বাংলার গভর্ণর বাহাদুর লর্ড লীটন এই আইন রাজ্যের মঙ্গলের জন্য অবশ্যপ্রয়োজ্য মনে করিয়া তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা উহাকে 'সার্টিফাই' করিয়াছেন।

স্বরাজ, ২২শে পৌষ, ১৩৩১।

———o———

তৃতীয় খণ্ড

মোসলেম ভারত

প্রথম পর্ব

ইসলাম সভ্যতার ভূমিকা

বুদ্ধ, খৃষ্ট ও মহম্মদ পৃথিবীর প্রধান ধর্ম-প্রবর্তক; হিন্দু, পার্শী ও ইহুদী ধর্ম-কোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রবর্তিত ধর্ম নয় বলিয়া উহাদিগকে সনাতন বলা যায়। মহম্মদ শেষ ধর্ম-প্রবর্তক; ইসলাম-প্রচারের পর পৃথিবীতে আর কোনো নূতন ধর্মমত প্রচারিত হয় নাই এবং পৃথিবীতে আর কোনো নূতন ধর্মের স্থানও আর নাই। ইসলাম-ধর্ম পৃথিবীতে শেষ রাষ্ট্রীয় সামাজিক, নৈতিক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে বলিয়া মুসলমানেরা মহম্মদকে শেষ Prophet বলিয়া বিশ্বাস করেন।

মহম্মদ শেষ ধর্ম-প্রবর্তক

আরবজাতির মধ্যে অফুরন্ত নিহিত প্রাণশক্তি ছিল বলিয়া মহম্মদের নিকট হইতে ইসলাম ধর্মমত পাইয়া উহার সরল একেশ্বরবাদ ও উদার সমাজনীতি প্রচারে তাহারা ব্রতী হইয়াছিল। মহম্মদের মৃত্যুর আশী বৎসরের মধ্যে আরবেরা স্পেন হইতে ভারতবর্ষ ও মধ্যএশিয়া হইতে আফ্রিকা পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে ইসলাম-ধর্ম প্রচার ও ইসলাম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হইবার বিশেষ কতকগুলি কারণ ছিল; প্রথমত ইসলামের উদার সমাজনীতি ও সহজ ধর্মনীতি মানুষকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। দ্বিতীয়ত ইসলামের অভ্যুদয়ের সময়ে তৎকালীন ধর্মমতগুলি নিতান্ত

ইসলাম ধর্ম প্রচার

অন্তসার শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। বৈজয়ন্তীয় গ্রীক সাম্রাজ্য, এশিয়া ও মিশরে যে খৃষ্টীয় ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা আড়ম্বরই অধিক জমিয়া উঠিয়াছিল; পার্শী ও বৌদ্ধধর্মও তদ্রূপ। ভারতের হিন্দু ধর্ম জাতিভেদ ও আচারের বেড়াজালে মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং ইসলামের সরল অথচ তেজঃপূর্ণ বাণী সহজে চারিদিকে প্রচারিত ও গৃহীত হইতে লাগিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈজয়ন্তীয় গ্রীক ও পারসিকেরা ছিল প্রবল ও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এশিয়া-মাইনর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া লইয়া নিরন্তর পারস্য ও রোমান-সম্রাট্‌দের বিবাদ হইত। গ্রীক-সম্রাটগণও পারসিকদের মধ্যে এই লইয়া বহু যুদ্ধ হইবার পর উভয়ে ক্লান্ত ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এ ছাড়া পারস্যের মধ্যে কে রাজা হইবে তাহা লইয়া অনেক রক্তপাত হইয়াছিল; তাহার ফলেও ইহারা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং রণক্লান্ত গ্রীক্‌দের নিকট হইতে আরবদের পক্ষে সিরিয়া জয় করা যেমন সহজ হইল, বীর-শূন্য পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করা তদপেক্ষা অধিক শ্রমসাধ্য হইল না। যে-সব জাতি বা দেশ আরবের অধীন হইল তাহারা যে কেবল আরবের রাজকীয় প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া হইল তাহা নহে, তাহারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা স্বীকার করিয়া লইল। মহম্মদ ধর্ম ও সমাজ বা আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মিলনকে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব গঠনের পরিপন্থী বলিয়া বিবেচনা করিতেন না; তিনি একধারে ধর্মের গুরু ও রাজ্যের রাজা ছিলেন; সেইজন্য ইসলামে সাম্রাজ্য ও ধর্মরাজ্য এক। সামাজিক জীবনে মানুষের সহিত মানুষের মিলিবার ও বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার কোনো বাধা ইসলামে নাই বলিয়া আরবেরা বিভিন্ন জাতির বিচিত্র Culture একত্র করিয়া ইসলামীয় সভ্যতা ও ইসলাম জাতি গঠন করিয়া তুলিল।

ইসলাম সভ্যতা

আরবজাতির অভ্যুত্থান ও বিস্তৃতির ইতিহাস ৬০০ হইতে ১০০০

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। দশম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত আরব-গৌরব বিদ্যমান ছিল ; ইহার পর হইতে যদিও আরব-রবি অস্তমিত হইতে আরম্ভ করে—তথাচ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইসলাম-সভ্যতা সর্বতোভাবে য়ুরোপীয় খৃষ্টান-সভ্যতা হইতে উন্নততর ছিল। সাত শত বৎসরের মধ্যে ইসলামের কেন এমন পতন হইল ও বর্তমানে ইসলাম রাষ্ট্র-সমূহ পৃথিবীতে এমন হীন স্থান অধিকার করিতেছে এ প্রশ্নের সামাধান করা প্রয়োজন—কারণ পৃথিবীর ২৫ কোটি মুসলমানের মধ্যে ছয় কোটি ভারতবাসী মুসলমানের রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক উত্থান পতন অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

ইসলামের অন্তরের মধ্যে তাহার পতনের ও দুর্বলতার বীজ নিহিত ছিল। মহম্মদের মৃত্যুর পর হইতে আরবদের মধ্যে 'খলিফ' বা ইসলামের ধর্মরাজ্যের উত্তরাধিকারী কে হইবে তাহা লইয়া মতভেদ ও বিবাদ উপস্থিত হয়। মহম্মদের পর আবুবকর, ওমর ও ওসমান পর পর 'খলিফ' হইলেন। কিন্তু আবুবকরের খলিফত্ব-কালে, মহম্মদের জামাতা আলিকে 'খলিফ' বা উত্তরাধিকারী করিবার জন্য একদল লোক মত করে। এই মতভেদ কালে মুসলমান জগৎকে 'সিয়া' ও 'সুন্নী' এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া দেয় এবং পরবর্তী যুগে মোসলেম রাষ্ট্রে এই সম্প্রদায়িক মতভেদ অনেক রক্ত-পাতের কারণ হইয়াছে। ৬৬১ খৃষ্টাব্দে আলি নিহত হন ; তাঁহার পুত্র হাসানকে সেইদলের লোকে 'খলিফ' পদে বরণ করিল। কিন্তু ওসমানীয় বংশীয় মোয়াবিয়ের দল প্রবল থাকায় তিনিও তাঁহার দল কর্তৃক

খলিফত্ব লইয়া মতভেদ

খলিফ পদে নির্বাচিত হইলেন। এই সব ক্ষেত্রে 'খলিফ' মুসলমান-আরবদের দ্বারা নির্বাচিত হইতে-ছেন। ৬৮০ খৃষ্টাব্দে মোয়াবিয়ের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র য়েজীদ ও হাসানের ভ্রাতা হোসেনের মধ্যে পুনরায় খলিফত্ব লইয়া বিবাদ বাঁধিল এবং কারবালার মরুভূমিতে পুণ্যাত্মা হোসেন সদলবলে

সিয়া সুন্নী ভেদ

য়েজীদ-হস্তে প্রাণ দিলেন। সে-কাহিনী হিন্দু মুসলমান সকলের নিকট সুপরিচিত। মহম্মদের দৌহিত্র হোসেন ওমায়েদ দল কর্তৃক নিহত হইলে 'সিয়া' 'সুন্নী'র ভেদটি সুস্পষ্ট হইল। সিয়ারা এখনও হোসেনের মৃত্যু দিনে (মহরমে) তাঁহাকে স্মরণ করে ও তাঁহাকে ইসলামের জন্য 'শহীদ' (martyr) মনে করে। শিয়াদের নিকট হোসেনের কবরস্থান পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম পবিত্র স্থান।

ওমায়েদ-খলিফগণ মেদিনা হইতে দামাস্কাসে তাঁহাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। প্রথমত মক্কায় ও মেদিনায় হোসেনের দল প্রবল ছিল এবং ইসলাম-সভ্যতার মধ্যে ক্রমশ আরব-element ব্যতীত অন্যান্য প্রভাব প্রবেশ করিতেছিল বলিয়া ইসলাম ও আরব-সভ্যতা প্রতি-শব্দবাচক থাকিল না। দ্বিতীয়ত ইসলাম-সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করিতেছিল এবং মরুভূমি মধ্যস্থিত কোনো স্থান রাজধানীর উপযুক্ত হইতে পারে না বলিয়া খলিফরা দামাস্কাসে খলিফত্বের কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। সিয়া সম্প্রদায় এই খলিফকে ধর্মগুরু বলিয়া মনিত না; তাহারা মাঝে মাঝে খলিফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে এবং নিজেদের 'মাহিদ' বা পরিত্রাণ-কর্তাকে প্রচার করিয়াছে। আরবদের মধ্যে আলি ও ওমায়েদদল ব্যতীত মহম্মদের খুল্লতাত আব্বাসের একটি দল ছিল। ইসলাম প্রচারের পূর্বযুগ হইতে ওমায়েদ ও আব্বাস-পরিবারের মধ্যে বৈরীভাব ছিল। আব্বাসীরা ওমায়েদগণকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছিল; এক্ষণে আলির বংশধর-গণের সহিত যোগদান করিয়া ওমায়েদদিগের ধ্বংসসাধন করিল ও আলি-দের খলিফ না করিয়া নিজ পরিবারে খলিফত্ব আবদ্ধ করিল।

ওমায়েদ খলিফগণ

খলিফত্ব লইয়া বিবাদ

মোআবিয়, য়েজীদ, আবদল মলিক, ওয়ালীদ, হিসাম ছিলেন ওমায়েদ-বংশের খলিফ। ইহাদের রাজত্বকালে ৮ম শতাব্দীর আরম্ভে বোখরা,

সমরকন্দ, খিবা, ফেরগণা, তশকন্দ, চীন-প্রান্ত, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, ইরাক্, পারস্য, কাবুল, কান্দাহার প্রভৃতি রাজ্য ইসলাম-রাজ্যের অন্তর্গত হইল; খলিফের সৈন্তদল মিশর, আফ্রিকার উত্তর উপকূলস্থ প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়া জিব্রালটার প্রণালী পার হইয়া স্পেনে উপনীত হইল। স্পেন অধিকার করিয়া তাহারা পিরীনীস পর্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ ফ্রান্স জয় করিল এবং মনে হইল পশ্চিম-য়ুরোপ ইসলামের নিকট বুঝি বা পরাভূত হয়। 'তুরে'র যুদ্ধে (৭৩২) চার্লস মার্টেল মুসলমান দিগকে পরাজিত করিলে, তাহারা পিরীনীসের দক্ষিণে ফিরিয়া আসিয়া স্পেনে রাজ্য স্থাপন করিল, এবং সে-রাজ্যে আটশত বৎসর নিজ মহিমার গৌরবে অক্ষুণ্ণ ছিল। অপরপ্রান্তে ইসলামের সৈন্ত ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সিন্ধুদেশ জয় করিল এবং ভবিষ্যতে ইসলামের বিপুল সাম্রাজ্য ও বলের আধার ভারতবর্ষকে সে জানিল। বাহিরের এত বৃদ্ধি ও প্রচার সত্ত্বেও দলাদলি ও বিদ্বেষের ফলে হিসামের রাজত্বকালে (৭৪৩) ওয়ামেদ-খলিফগণের পতন সুরু হইয়াছিল; ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে আব্বাসীগণ ইসলামের খলিফত্ব দখল করিল। যে খলিফত্ব ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসী মুসলমানদের শুভ ইচ্ছা ও মতের উপর নির্ভর করিত, তাহা এক্ষণে সৈন্তবলের সাহস ও সংখ্যার উপর নির্ভর করিল।

এশিয়া, আফ্রিকা, য়ুরোপে ইসলাম রাজ্য

খলিফত্ব লইয়া যুদ্ধ

খলিফগণ ক্রমে ক্রমে ইমামদের ধর্মভাব ও গভীর আধ্যাত্মিকতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়া বিলাসী, ঐশ্বর্য্যলোভী ও আড়ম্বর-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধর্মের জন্ত লোকে যাহা ইমামকে দিত, তাহা এখন খলিফদের ভোগবিলাসের ইন্ধন জোগাইবার জন্ত দুর্বহ কর-স্বরূপ হইয়া উঠিল।

চারিদিকে বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। ধর্মবন্ধনের উপর মানুষের জাতীয়তা, বর্ণত্ব (Race) বড় হইয়া উঠিল; ইসলাম সকল বর্ণভেদ দূর

করিবার চেষ্টা করিয়াও নিজদেশ বা জাতির প্রতি ভালবাসিবার মধুর দুর্বলতা হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারে নাই। ইসলামের যে সরল একেশ্বরবাদ আরবজাতির অন্তরে ছিল, মহম্মদ তাহাই নূতনভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমানবিজিত অন্যান্য জাতি ইসলাম গ্রহণ করিয়াও নিজ জাতীয় বিশিষ্টতা ত্যাগ করিতে পারে নাই এবং সেগুলি ইসলামের মধ্যেই থাকিয়া গেল। আফ্রিকা, স্পেন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন বর্ণ বা Race এর লোক বাস করিত, তাহাদের ইতিহাস, পুরাণ, ভাষা সম্পূর্ণরূপে আরব হইতে পৃথক্। সেইজন্য পরযুগে আফ্রিকার মুসলমানদের মধ্যে পীর-পূজার প্রাদুর্ভাব, পারস্যের মধ্যে মরমিয়ার ভাবোচ্ছ্বাস, ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে বৈদান্তিকতা প্রবেশ করিয়াছে ও এই বিশিষ্টতা ক্রমেই জাতীয় জীবনে স্ফুটতর হইতে লাগিল। খোরাসান বিদ্রোহী হইয়া পৃথক খলিফ নির্বাচন করিয়া স্বাধীন হইল; স্পেনের রাজধানী কর্দোভাতে তথাকার মুসলমানেরা নিজেদের খলিফ নির্বাচন করিল। মিশরের মুসলমানেরা মহম্মদের কন্যা ফতিমার কোন এক বংশধরকে খলিফ করিয়া তথাকথিত ফতেমার খলিফ বংশ স্থাপন করিল।

ধর্ম হইতে জাতীয়তা শ্রেষ্ঠ

এক ধর্মরাজ্য থাকিল না

আব্বাসী খলিফগণ দামাস্কাস হইতে ইরাকের বোগদাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া লইলেন। ৭৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৫৮ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় তাঁহারা রাজত্ব করেন। ঐ শেষ বৎসরে মুঘল সেনাপতি হুলাকু খাঁ বোগদাদ ও খিলাফৎ-সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া দেয়। ইতিমধ্যে মোসলেম জগতে তুর্কী নামে একটি জাতির অভ্যুদয় হইল; কিন্তু তাহাদের বিজয়ের কথা বর্ণিবার পূর্বে আরবদের চিন্তা-জগতে যে-সব বিপ্লব চলিতেছিল তাহার কথা সংক্ষেপে বলিব।

আব্বাসী খলিফগণ

আরবেরা জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনায় ও উৎসাহ-দানে প্রাচীন জগতে অতুলনীয় ছিল। পরের জ্ঞান আহরণ করিতে ও সে-বিষয়ে গবেষণা করিতে তাহাদের কৃপণতা বা গোঁড়ামী ছিল না। গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত গ্রন্থাদি তর্জমা করিয়া তাহারা আরবী সাহিত্য ও চিত্তকে সম্পদবান করিয়াছিল। কিন্তু যতদিন তাহাদের মনের সতেজতা ছিল, ততদিনই এইরূপ উদার সংগ্রহনীতি চলিয়াছিল। মধ্যযুগে তাহারাই য়ুরোপের প্রাচীন জ্ঞানের বর্তিকা জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল। চিত্ত যতদিন মুক্ত থাকে ততদিন নব নব মত ও চিন্তা বিকশিত হয়। ইসলামের মধ্যে বহুবিধ মত ও সম্প্রদায় দেখা দিল। ইহাদের মধ্যে 'মোতাজেল' মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা যুক্তিকে সকলের উপর স্থান দিয়া ইসলামকে বিচার ও প্রচার করিতেন। আব্বাসী-খলিফদের প্রথমদিকে কোন কোন খলিফ মোতাজেলদিগকে বিশেষভাবে সমাদর ও উৎসাহ প্রদান করিতেন। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে অন্যান্য গোঁড়া সম্প্রদায় কোরাণ, হদীস ও প্রাচীন Traditionকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া ইসলামকে প্রতিক্রিয়াপন্থী করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিল। আব্বাসী খলিফদের বিশেষ আগ্রহ সত্ত্বেও 'মোতাজেল' মত মাথা তুলিতে পারিল না। বিচিত্র মত ও বিশ্বাসকে প্রতিহত করিবার জন্য পণ্ডিতগণকে নিরন্তর চেষ্টা করিতে হইত; তাহারই ফলে ইসলাম ধর্মতত্ত্ব সৃষ্ট হইল ও উত্তরোত্তর তাহা তর্কজালে বাড়িয়া চলিল। ইসলামের সহজ অগ্রসরের পথ, জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই রুদ্ধ হইয়া আসিল। 'মোতাজেল'গণ মোসলেম ধর্মমত ও দর্শনকে যুক্তি দিয়া বিচার করিয়া নিবৃত্ত হইলেন না, তাঁহারা বলিলেন মক্কায় যেমন প্রাচীনকালে 'খলিফ' বিশ্বাসীগণের মতানুসারে নির্বাচিত হইতেন, বর্তমানেও তাহাই বাঞ্ছনীয়, খলিফ-পদ বংশানুক্রমিক হওয়া সম্পূর্ণ-

প্রাচীন ইসলামের চিন্তা-জগৎ

মোতাজেল ও খজিরৎ

রূপে অ-মোসলেমোচিত। খজিরৎগণ আরও অগ্রসর হইয়া বলিলেন যে খলিফত্বের প্রয়োজন নাই, ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সব মত প্রসার লাভ করিলে পরবর্তীযুগের খলিফগণ তাহা ইসলামের পরিপন্থী বলিয়া প্রচার করিয়া তাহাদের উচ্ছেদসাধন করিলেন। ইসলামের যুক্তিবাদ ও স্বাধীন-চিন্তা নষ্ট হইল।

আব্বাসী-খলিফগণের অধঃপাতের সহিত মুসলমান-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছিল। খলিফগণ বোগদাদে রাজধানী পরিবর্তিত করিয়া প্রাচীন ইমামদের আধ্যাত্মিক-জীবনের সরলতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভৌগোলিক নৈকট্যহেতু পারসিক সম্রাটদের বাদসাহী চাল, বিভব ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর, খলিফদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। পারসিকগণ ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিজেদের জাতীয় মহাকাব্য 'সাহনামা'কে ত্যাগ করে নাই, নিজেদের প্রাচীন পারসিক নাম বদলাইয়া আরবী নাম সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নাই, জাতীয় জীবনে, সাহিত্যে তাহারা নিজেদের বৈশিষ্ট বজায় রাখিয়া মুসলমান হইল। প্রাচীন পারসিকেরা রাজার দৈবোৎপত্তি মানিত; তাহাদের রাজ্যশাসনের বাদসাহী-আদর্শ, রাজার দৈবোৎপত্তিবাদ ক্রমে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। খলিফত্ব বংশানুক্রমিক এই মতবাদ প্রচারিত হইল। তখন মোতাজেল ও খজিরৎগণ উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। খলিফত্বকে বংশানুক্রমিক ও বাদসাহী (Imperialistic) করিয়া তুলিবার জন্য আব্বাসী খলিফগণ রীতিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ওমায়েদদের সহিত বৈরীভাব থাকায় আব্বাসী-খলিফগণ বোগদাদে আরবী সৈন্য অপেক্ষা পারসিক ও তুর্কী সৈন্যের সংখ্যা অধিক রাখিয়াছিলেন। তুর্কী নামে এক দুর্দ্ধর্ষ জাতি এই সময়ে দলে দলে আসিয়া খলিফদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিতেছিল। উত্তরকালে ইহারাই খলিফগণের কালস্বরূপ হইয়া উঠিল।

খলিফত্ব বংশানুক্রমিক ও বাদসাহী

ইসলাম-জগতে তুর্কীদের অভ্যুদয় ও বিস্তার পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক যুগান্তর ঘটাইয়াছে বলিয়া এইখানে এই জাতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হইতেছে। তুর্কীরা বহু উপজাতি বা Tribeএ বিভক্ত ছিল; তাহাদের নানাজাতি বোগদাদে ও খলিফদের অধীনে নানাস্থানে কর্মপ্রার্থী হইয়া দলে দলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে থাকে—তাহা বলিয়াছি। সেলেজুক নামে তাহাদের একটি উপজাতি আনাটোলিয়াতে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া অত্যন্ত অসহিষ্ণু গোঁড়ামীর সহিত শাসন আরম্ভ করে। ইকোনিয়ামে (Iconium) তাহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। মামেলুক নামে আর একটি তুর্কীজাতি মিশরে গিয়া রাজ্যস্থাপন করিল। কিছুকাল পরে ওসমানলী বা ওথমান (Ottoman) তুর্কীরা প্রথমে এশিয়ামাইনরে ও পরে য়ুরোপের বলকান উপদ্বীপে ও বৈজয়ন্তীয়-সাম্রাজ্যে উপনিবেশ ও রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। পূর্বদিকে ঘজনী, ঘোর প্রভৃতি স্থানের ও ভারতের পাঠান রাজগণ তুর্কীবংশোদ্ভব। ইহা হইতে তুর্কীদের ব্যাপ্তি ও শক্তি কি পরিমাণ ছিল তাহা আমরা সহজেই অনুমান্ করিতে পারি।

তুর্কী জাতির অভ্যুদয়

তুর্কীদের মধ্যে শারীরিক বলের ও যুদ্ধনৈপুণ্যের সমাদর ছিল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে ইহারা যেমন বর্বর ছিল, ধর্মান্তরে আশ্রয় লইয়াও ইহাদের ব্যবহারে অকস্মাৎ কোনো পরিবর্তন লক্ষিত হইল না। এতদিন ইসলামরাজ্য এশিয়া-মাইনরে ব্যাপ্ত হয় নাই। তুর্কীরা গ্রীকদের রাজ্য এশিয়ামাইনর অধিকার করিল। খৃষ্টানদের ধর্মস্থান জেরুজালেম আরবেরা ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু খলিফ ওমর খৃষ্টানদের প্রতি যাহাতে কোনো অন্যায় অত্যাচার না হয় সে বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরেও এই রীতি বরাবর অনুসৃত হইয়াছিল। কিন্তু সেলেজুক তুর্কীরা প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া প্রভৃতি অধিকার করিলে;

সেলেজুক তুর্কী ও ক্রুজেড

প্রাচীন রীতির পরিবর্তন হইয়া গেল। তুর্কীদের অসহিষ্ণু গোঁড়ামীর ফলে খৃষ্টান তীর্থযাত্রীদের উপর জুলুম আরম্ভ হইল এবং তাহারই জন্য য়ুরোপ এশিয়াতে ক্রুজেড-অভিযান প্রেরণ করিল। খৃষ্টান ও ইসলামের স্থায়ী বিরোধের জন্য এই তুর্কীরাই দায়ী।

খিলাফতের পতনের বিবিধ কারণের মধ্যে তুর্কীদের অভ্যুদয় অন্যতম; তুর্কীদের দ্বারা খলিফের রাজ্য প্রায় সবই অধিকৃত হইয়াছিল; বোগদাদের খলিফের রাজ্য বোগদাদেই সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে খলিফত্বের এই সামান্য সম্মান ও এশিয়ার শেষ খলিফ মুঘল-সেনাপতি হলাকু খাঁর হস্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

তুর্কী কর্তৃক খলিফদের রাজ্যহরণ

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মধ্য এশিয়ায় মুঘল নামে এক অর্দ্ধ-যাযাবর অর্দ্ধ-বর্বর জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইহারা হুন, তুর্কীদের অপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ ও ভীষণ। জেঙ্গীস খাঁ নামক একজন অদ্ভুত কর্মবীর মুঘলদের বিচ্ছিন্ন জাতিসমূহকে একত্র করিয়া এশিয়ায় চীন হইতে য়ুরোপের হাঙ্গেরী পর্য্যন্ত ভূখণ্ড জয় করেন। উহারা বহুজাতিকে গৃহছাড়া করিয়াছিল, বহুদেশ উৎসন্ন করিয়া দিয়াছিল। জেঙ্গীসের মুঘল-সৈন্য পৃথিবীতে দুঃস্বপ্নের মত চলিয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুর পর পাঁচটি মুঘল রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ১ম—কুবলাই খাঁ চীনের পেকিনে রাজধানী করিয়া য়ুয়ান বংশ স্থাপন করেন। ২য়—সাইবেরিয়াতে সিবির রাজ্য; ৩য়—মধ্য-এশিয়াতে জগতাই রাজ্য; ৪র্থ—পারস্যের ইলখাঁ রাজ্য; ৫ম—য়ুরোপীয় রুশিয়াতে কিপচক রাজ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুঘলগণ ভারতবর্ষের তুর্কী-পাঠান সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া মুঘল-সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে ইলখাঁ রাজ্যের মুঘল সেনাপতি হুলাকু খাঁ বোগদাদ অধিকার ও খিলাফৎ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া দিল। খলিফের রাজ্য নষ্ট হইল; তুর্কীরা

মুঘল রাজ্যসমূহ

খলিফ-রাজ্য ধ্বংস

কিছুকাল মুঘল আক্রমণে ও উৎপীড়নে হীনবল হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের চলিয়া যাইবার পর পশ্চিম-এশিয়াতে সর্বত্র তুর্কীদেরই প্রাধান্য হইল।

আব্বাসী শেষ খলিফ মুসতাসিম মুঘলদের দ্বারা নিহত হইল। ইহাদেরই কোনো দূর আত্মীয় বোগদাদ হইতে পলায়ন করিয়া মিশরে মামেলুক তুর্কীদের আশ্রয় গ্রহণ করেন ও কাইরোতে নামে-'খলিফ' হইয়া খলিফত্ব স্থাপন করেন; ধর্মসংক্রান্ত ক্ষমতা ব্যতীত অন্য কোনো রাজকীয় ক্ষমতা মামেলুক তুর্কীরা ইঁহাদের হস্তে অর্পণ করে নাই। ১২৫৮ হইতে ১৫১৭ সাল পর্য্যন্ত মিশরে খলিফেরা কেবলমাত্র ধর্মগুরুরূপে বাস করিলেন। শেষোক্ত বৎসরে কনষ্টান্টিনোপলের তুর্কী সুলতান মিশরের শেষ খলিফকে টাকা দিয়া পেনশন দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন ও স্বয়ং খলিফত্ব গ্রহণ করিলেন। সেই হইতে তুর্কীর সুলতানই রুমের বাদসাহ, মোসলেম জগতের খলিফ বলিয়া পরিচিত।

রাজ্যশূন্য খলিফ

আমরা কিয়ৎপূর্বে বলিয়াছি যে তুর্কীরা এশিয়ামাইনর অধিকার করিয়াছিল। ইতিমধ্যে তুর্কীদের তৃতীয় শাখা ওসমানলী-তুর্কীরা ইতিহাসে দেখা দিল। তাহারা বলকান-উপদ্বীপ জয় করিয়া কনষ্টান্টিনোপলের দ্বারে আসিয়া বহুকাল অপেক্ষা করিয়াছিল। অবশেষে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা কনষ্টান্টিনোপল দখল করিল। কনষ্টান্টিনোপল এগারশত বৎসর খৃষ্টানদের রাজধানী ছিল এবং তাহারও পূর্বে প্রায় ছয়শত বৎসর গ্রীক সভ্যতার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যোগযুক্ত ছিল। এতকাল পরে এই মহানগরী মুসলমানদের হস্তগত হইল। সেই হইতে য়ুরোপীয় খৃষ্টান সভ্যতাকে পরাভূত করিবার জন্য তুর্কীর সুলতানগণ নিয়ত চেষ্টা করিয়াছেন; তুর্কীর গোলন্দাজ সৈন্য ও কামান য়ুরোপের ভীতির কারণ ছিল; তাহাদের

ওসমান-তুর্কীর কনষ্টান্টিনোপল জয়

সৈনিকদের সাহস ও হিংসার কাছে য়ুরোপের সর্বোৎকৃষ্ট সৈন্যও ভয়ে কাঁপিত। ইহারা দুইবার জার্মান সাম্রাজ্যের রাজধানী ভিয়েনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল; অবশেষে ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা পরাভূত হইবার পর হইতে স্রোত উজান বহিতে সুরু করিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে তুর্কীর পতন ও পরাভবের সূত্রপাত হইল।

বলকান-উপদ্বীপ মুসলমানদের হস্তগত হইল—খৃষ্টান-দেশ ও খৃষ্টান-নগরী কনষ্টান্টিনোপল এগারশত বৎসর খৃষ্টান ধর্মের বিশিষ্ট কেন্দ্র থাকিবার পর তুর্কী মুসলমানদের হস্তগত হইল। এত বড় ঐতিহাসিক বিপ্লব ইতিহাসে খুব কম হইয়াছে। অপরদিকে স্পেনের মুর-মুসলমানেরা আটশত বৎসর তথায় রাজত্ব করিবার পর তথা হইতে বহিষ্কৃত হইল; স্পেন স্বাধীন হইল, তাহাদের স্বর্ণময় যুগ আরম্ভ হইল। মুসলমানদের একদিক ভাঙ্গিল, একদিক গড়িল; কিন্তু এ বিষয় লইয়া তখন কোনো আন্দোলন হয় নাই; কারণ তুর্কী পৃথক—মুর পৃথক জাতি। কনষ্টান্টিনোপল মুসলমানদের হস্তগত হইলে তথাকার পণ্ডিতগণ য়ুরোপময় ছড়াইয়া পড়িল।

য়ুরোপের নব-জাগরণ

য়ুরোপের বিদ্যার কেন্দ্রগুলিতে, রাজার সভায়, পোপের প্রাসাদে এই সকল জ্ঞানীদের আবির্ভাবে য়ুরোপের চিত্ত যেন খুলিয়া গেল। য়ুরোপ জ্ঞানের অনুসন্ধানে মন দিল; প্রাচীন গ্রীক ও লাতিনের জ্ঞানলাভ করিয়া লোকে চার্চের নিরানন্দময় ধর্মতত্ত্ব, মূঢ় বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল; য়ুরোপে ইহাই Renaissance নামে খ্যাত। এই নব-জ্ঞানের সাড়া য়ুরোপীয়দের জীবনের সকল কোঠায় দেখা গেল। সর্বাপেক্ষা বড় কাজ হইতেছে পৃথিবী আবিষ্কার—আমেরিকা ও ভারতের সমুদ্রপথ আবিষ্কার।

এতকাল য়ুরোপীয়গণ ভারতের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য করে নাই। ভারতের সহিত বাণিজ্য স্থলপথেই ছিল। আরবেরা ছিল পূর্ব-সাগরের বণিক; ভেনিস ছিল ভূমধ্যসাগরের বণিক। এতকাল পূর্বদেশের

সামগ্রী পাইতে য়ুরোপের কোনো অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু তুর্কীরা এশিয়া-মাইনর, মেসোপটেমিয়া, বলকান প্রভৃতির অধীশ্বর হওয়াতে বাণিজ্যপথ রুদ্ধ হইল। ইতিমধ্যে রেনাসান্স

বাণিজ্যপথের সন্ধান

ও বিজ্ঞানের আলোচনার ফলে য়ুরোপের মূঢ় সংস্কারসকল দূর হইতেছিল; প্রাচীনের গবেষণা ও নূতনের আবিষ্কারের জন্য য়ুরোপের তরুণ মন জাগ্রত হইল। সেই আবিষ্কারের নেশায় য়ুরোপ ভারতবর্ষের বাণিজ্যপথ সন্ধান করিতে বাহির হইয়াছিল; তাহার ফলস্বরূপ আমেরিকা আবিষ্কৃত হইল, ভারতবর্ষের সন্ধান মিলিল, আফ্রিকায় সে প্রবেশ করিল। আমেরিকার অকথিত ধনৈশ্বর্য্য স্পেনীয়ার্ড, পর্টুগীজ, ইংরাজজাতির হস্তগত হইল। অতুল ঐশ্বর্য্যবলে, সতেজ বুদ্ধিবলে য়ুরোপে নবযুগের আবির্ভাব হইল। Modern Europeএর আরম্ভ হইল।

মুসলমান প্রাধান্যের অবসান ও বর্তমান য়ুরোপের উত্থান

এতকাল এশিয়ার পারসিক, হুন, মুঘল, তুর্কী জাতিরা য়ুরোপকে পূর্ব হইতে পশ্চিমে ধাক্কা দিয়া আসিতেছিল,—য়ুরোপের জাতিরা ক্রমেই হটিতে হটিতে পশ্চিমে সমুদ্র কিনারায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সেখানে সমুদ্রের আশ্রয় পাইয়া সে নূতন জগতের অধীশ্বর হইল। সমুদ্রপথে ঘুরিয়া আসিয়া সে এশিয়ার দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানকে পিছন হইতে আক্রমণ করিল; এইখান হইতেই ইসলাম-সাম্রাজ্যের পতন সুরু হইল। মধ্যযুগের ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস শেষ হইল, য়ুরোপের খৃষ্টীয় সভ্যতা—বর্তমান যুগের ইতিহাস সুরু হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মুসলমান রাজ্যসমূহ কোনো প্রকারে য়ুরোপীয়ানদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইবার পূর্বেই ভারতের মুঘল-সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল ও আংশিকভাবে ইংরাজদের অধীন হইল। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের অধীনতা সম্পূর্ণ হইল।

সর্বত্র মুসলমানদের পতন

মিশর-সুদান ইংরাজের অধীন হইল। রুশিয়া ককসস পার হইয়া মধ্য-এশিয়া জয় করিল। ফরাসীরা উত্তর-আফ্রিকা গ্রহণ করিল; ওলন্দাজগণ-পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মুসলমান রাজ্যগুলি অধিকার করিল। য়ুরোপীয় জাতিরা ধীরে ধীরে তুর্কীর অধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। গ্রীক্, বুলগার, সার্ব, রুমেনিয়ান প্রভৃতি বিচিত্র জাতি নিজ নিজ স্বাধীনতা লাভ করিল; এই সব সংগ্রামে তুর্কী দেখিত খৃষ্টীয় শক্তিসমূহ সাধারণত তাহার বিরুদ্ধে গিয়াছে। ক্রিমিয়ান যুদ্ধে তুর্কী ভীষণভাবে লাঞ্ছিত হইল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে Turkey in Europe বলিয়া যে ভূখণ্ডে তুর্কীর সুলতানের সাম্রাজ্যরূপে নির্দিষ্ট ছিল—য়ুরোপীয় মহাসমরের অব্যবহিত পূর্বে সে-সীমানা সঙ্কুচিত হইয়া রাজধানীর কয়েক ক্রোশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। পারস্য বৃটেন ও রুশিয়ার ভয়ে সর্বদাই সঙ্কুচিত থাকিত। আফগানিস্থান ইংরাজের আজ্ঞাধীন মিত্ররাজ্য ছিল। বিংশ শতাব্দীতে ২৫ কোটি মুসলমানের ইহাই ছিল রাজনৈতিক অবস্থা।

———o———

দ্বিতীয় পর্ব

ইসলামের নব জাগরণ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান-সভ্যতা সর্বত্র ধ্বংসমুখীন হইয়াছিল। মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা কেবল ইসলামের ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বাদসাহী বিলাস ও বর্বর দারিদ্র পাশাপাশি বাসা বাঁধিয়াছিল। ইসলামের সামাজিক সাম্য চূর্ণ; বাদসাহ, ওমরাহ, উজীর, ফৌজদার প্রভৃতিদের আভিজাত্য-ভাব ও বিলাসপ্রিয়তা, সকল দেশের রাজশাসনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিরোধের রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। ইসলাম ধর্মও অধঃপতিত হইতে সুরু হইয়াছিল। আধ্যাত্মিকতার অপেক্ষা ধার্মিকতা বা বাহিরের অনুষ্ঠান বড় হইয়া উঠিয়াছিল। আরবী না বুঝিয়া মন্ত্র পড়ার মত কলমা পড়া, পীর ফকিরের কবর পূজা, 'হজ' করা, তাগা, মালাধারণ প্রভৃতি বিবিধ সংস্কার সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমানের মধ্যে ধর্মের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল; ধনী মুসলমান ইসলামের নিষিদ্ধ অনেক জিনিষই ব্যবহার করিত—মদ্যপান, অহিফেন-সেবন সমাজকে বিশেষভাবে ধ্বংস করিতেছিল। ইসলামের অন্তরের মধ্যে পাপ, দুর্নীতি, দুর্বলতা প্রবেশ না করিলে এমন করিয়া চারিদিকে বিশাল সাম্রাজ্যগুলি অল্পকালের মধ্যে ধ্বংস হইয়া পড়িত না—উদাহরণ স্বরূপ বলিতে পারি আরঙজেবের মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মুঘল-সাম্রাজ্যের মধ্যে য়ুরোপীয় জাতির কয়েকটি

মুসলমান সমাজ ধর্ম ও রাজ্যের এককালীন অধঃপতন

বণিকসঙ্ঘ কখনই সাম্রাজ্য স্থাপনের বীজ বপন করিতে পারিত না। (আরঙজেবের মৃত্যু ১৭০৭, পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭)।

সংস্কার ও ওহাবিয় আন্দোলন

মুসলমান-সমাজকে জাগ্রত করিবার প্রথম চেষ্টা হইল আরবের মধ্যে। আরবদের মধ্যে জাতীয় ভাব খুবই প্রবল ছিল বলিয়া তাহারা তুর্কীর খলিফদের বাদসাহী চাল কখনো পছন্দ করে নাই। ইসলামের পতনের পর সংস্কারের জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহাকে ওহাবিয় আন্দোলন বলে। মহম্মদ আবদুল ওহাব ১৭০০ খৃষ্টাব্দে নেজদে জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল ওহাবের পাঁচশত বৎসর পূর্বে ইবন্ তয়মিয়া (৮ম শতাব্দীতে) ইসলামের মধ্যে পৌরাহিত্য ইমামপ্রাধান্য প্রভৃতি যে-সব অমুসলমানোচিত ব্যাপার তখন প্রবেশ করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। তাহার ফলে তাঁহাকে কারাগার ভোগ করিতে হয়। আবদুল ওহাব বলিলেন—মুসা, যীশু, মহম্মদ সকলেই মানুষ সুতরাং মানুষের ভুলভ্রান্তি তাঁহাদের মধ্যে বর্তাইত। তাঁহাদের কাছে প্রার্থনা করা ঈশ্বর-নিন্দার সমান অন্যায়। তাহাদের কবরপূজা পৌত্তলিকতার রূপান্তর মাত্র। মদ্যপান, তামাকু-সেবন প্রভৃতি জঘন্য পাপ। ইসলামকে প্রাচীন পবিত্র অবস্থায় ফিরাইবার জন্য তিনি সচেষ্ট হন। সম্প্রদায়টি ক্রমে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইল। ওহাবিয়দের শক্তি দেখিয়া অনেকের মনে হইল যে তাহারা সমগ্র ইসলামকে বুঝি পুনরায় পবিত্র করিবে। তাহাদের উত্থান ও বিস্তার তুর্কীর খলিফের স্বার্থের পরিপন্থী। সুতরাং তিনি ভীত হইয়া ওহাবিয়দের উচ্ছেদ সাধনের জন্য তাঁহার অধীনস্থ মিশরের ‘খেদিভ’ মহমৎ আলিকে আহ্বান করিলেন। এই আলবানিয়ান সাহসিকের য়ুরোপীয় কায়দায় সুশিক্ষিত সৈন্যদল ও গোলন্দাজের সম্মুখে ওহাবিয়েরা ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

ওহাবিয়দের রাজ্যস্থাপনের আশা দূর হইলেও ইসলামকে পবিত্র

করিবার বাসনা মুসলমানদের কাছে ব্যর্থ হইল না। ভারতের পঞ্জাব প্রদেশে ওহাবিয়দল এক রাজ্য স্থাপন করে; কিন্তু শিখেরা ১৮৩০ সালে উহা ধ্বংস করিয়া দেয়; ইংরাজদের পঞ্জাব জয়ের পরেও তাহারা সেখানে প্রবল ছিল এবং তাহাদের উচ্ছেদ করিতে রীতিমত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। আফ্রিকার আল্‌জিরিয়া প্রদেশে মহম্মদ বেন্ সেনুসি মক্কায় আসিয়া ওহাবিয়ের মতের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া নিখিল-ইসলাম ঐক্য বন্ধনের চেষ্টা আরম্ভ করেন। পারস্যের বাবী ধর্মমত ওহাবিয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও ইসলামকে সংস্কার করিবার জন্য যে-চেষ্টা ইহাদের মধ্যে দেখা দিয়াছিল, উহা তাহারই ফল।

সংস্কারের বিবিধ চেষ্টা

ওহাবিয়েরা প্রাচীন আরব যুগের ইসলাম ধর্মের গণ্ডির মধ্যে ফিরিয়া যাইবার জন্য এই আন্দোলন উত্থাপিত করেন। কিন্তু অতীতে প্রত্যাবর্তন করা অসম্ভব। অনেকের ধারণা যে মহম্মদ বুঝি সকল প্রকার অগ্রসর ও জ্ঞানাহরণের বিরোধী ছিলেন; কিন্তু তাহা সত্য নহে। ইসলামের অধঃপতন ও মুসলমানদের আধোগতি হইয়াছে বাহিরের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বন্ধ করিয়া অন্ধভাবে প্রাচীনের মধ্যে মগ্ন থাকিবার জন্য। ভারতবর্ষেই প্রথম সংস্কারকদল বুঝিয়াছিলেন যে য়ুরোপীয় জ্ঞানকে তুচ্ছ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যিনি সর্বপ্রথমে এই কথাটি জীবনে উপলব্ধি করিবার জন্য য়ুরোপ গমন করেন ও বহু বাধার মধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের নিকট এই মত প্রচার করেন—তাঁহার নাম আজ ভারতে প্রাতঃ-স্মরণীয়। তিনি হইতেছেন স্যর সৈয়দ আহমদ। তাঁহার মতে মোতাজেলদের যুক্তিবাদ ও জ্ঞানপিপাসা পুনরায় মুসলমানদের মধ্যে আলোচনা প্রয়োজন। এই নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া মৌলবী চিরাগ আলি ও আমীর আলি ভারতের মুসলমানদের সংস্কার-

ইসলাম অগ্রসরের বিরোধী ছিল না

ভারতে সংস্কারক সৈয়দ আহমদ

করিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কোরাণ মানুষের উন্নতির সহায়, তা বৈ তাহার জ্ঞান ও উন্নতির অন্তরায় নহে। ইসলাম ধর্মে জ্ঞানোন্নতির বাধা নাই। সৈয়দ আহ্‌মদ বলিলেন যে "প্রাচীন আরবেরা যেমন পিথাগোরাসের মত পাঠ করিয়া নিজেদের মত পরিবর্তন করিতে ভীত হন নাই, তেমনি আমাদের ভীত হইলে চলিবে না।" ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যত্রও উদারতার ভাব দেখা দিল। তুরস্কে ক্রিমিয়ান যুদ্ধের পর তুর্কীদের মধ্যে শাসন-সংস্কার ও নব্য-তন্ত্রতার (liberalism) হাওয়া বহিল। মিশরের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অল্-অজরের মধ্যেও ইহা দেখা দিল। মোসলেম জগতের সর্বত্রই য়ুরোপকে জানিবার, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আয়ত্ব করিবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল। এবং সেই আকাঙ্ক্ষার আবেগে অনেকে য়ুরোপীয় সভ্যতার মোহে এমনি মুগ্ধ হইলেন যে তাঁহারা ইসলামের রক্ষণশীলতার উল্টা পথে চলিতে লাগিলেন, ধর্মের প্রতি উদাসীনতাই তাঁহাদের ধর্ম হইল। কিন্তু ইহাদের দল সংখ্যায় কম ও প্রভাবে ক্ষীণ।

সবত্র জাগরণের সাড়া

য়ুরোপের নিকট হইতে আঘাত পাইতে পাইতে ইসলামের আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য জাগরণ দেখা দিল। খৃষ্টীয়-য়ুরোপ খৃষ্টান স্বার্থ বা শ্বেতাঙ্গ স্বার্থের জন্য যত সহজে মিলিত হইয়া যুদ্ধ-অভিযান, বাণিজ্য-যাত্রা, মিশনারী-প্রেরণ করিতে পারে—ইসলাম-জগত সেরূপ করিতে পারে না; এবং তাহার ফলে জগতে ইসলামের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠ বা সম্মান নাই; সেইজন্যই য়ুরোপের রাজনীতিকেরা তুর্কীকে রোগী বা 'sickman' বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন।

ইসলাম-আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, ইসলাম-প্রধান মধ্য-এশিয়া, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি ইসলাম-রাজ্য সমস্তই য়ুরোপের অধীন। যাহারা স্বাধীন তাহারা নামেমাত্র স্বাধীন। পশ্চিমের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন ধরণের বিদ্রোহ হইয়াছে; আলজিরিয়াতে আবদল কাদের, ককসাসে

শ্যামিলের বিদ্রোহে, বিদ্রোহীরা মুসলমানদের মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই লাভ করে নাই। ক্রিমিয়ান সমরের পর হইতে মোসলেম জগতের নানাস্থানে 'মাহদী' বা ভবিষ্যৎ অবতারের অবির্ভাব হইতে লাগিল; পশ্চিম ও য়ুরোপীয় সভ্যতাকে রোধ করিয়া ইসলামের জয় ঘোষণাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। মিশরে, সুদানে, উত্তর-আফ্রিকায়, আফগনিস্থানে, ভারতে, মধ্য-এশিয়ায়, চীন তুর্কীস্থানে, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে—সর্বত্র মুসলমানদের মধ্যে গোঁড়ামীরা বাড়াবাড়ি বা বিদ্রোহ দেখা দিল। কিন্তু নিখিল মোসলেমদের মধ্যে এমন কোন ঐক্য বন্ধন বা রাজনৈতিক সঙ্ঘবদ্ধতা ছিল না যাহার দ্বারা তাহারা পৃথকভাবে বা সমবেতভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারে।

ইসলামের এই দুরবস্থা দূর করিবার জন্য নানাদেশে লোকে নানাভাবে চিন্তা করিতেছিলেন। ইসলামের ধর্ম মুসলমানমাত্রকেই মক্কায় 'হজের' জন্য আহ্বান করে; এবং তাহার ফলে লক্ষাধিক লোক একত্র হইয়া ইসলাম জগতের খবরাখবর পাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মিলিত হইবার সাধারণ উপাদান যথেষ্ট আছে। মুসলমানে মুসলমানে মিলিত হইবার স্বাভাবিক ইচ্ছা ইসলামের মূল। কিন্তু তাহাদের বিচ্ছিন্ন চিত্তকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে কেহ পারে নাই। ওহাবিয় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল নিখিল মোসলেম জগতকে এক করা। সেনুসিও সেই উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন।

রাজনৈতিক সঙ্ঘবদ্ধতার জন্য জেলালুদ্দিন অল্ আফগানী নামে এক জন প্রতিভাশালী ব্যক্তি নিখিল-ইসলাম আন্দোলন (Pan-Islam) প্রবর্তন করিলেন। জেলালুদ্দিন উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের দিকে পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে তিনি মোসলেম জগত ও য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া ইসলামের দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব লইয়া বিশেষ নাড়াচাড়া করিলেন না; রাজনীতিক আলোচনা ও আন্দোলনই তাঁহার জীবনের প্রধান বিষয় হইল। তিনি য়ুরোপের হস্তে মোসলেমদের পরাভবের কারণগুলিকে

খুব ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন।

জেলালুদ্দিন অল আফগানী ও Pan-Islam আন্দোলন

তাঁহার প্রচার ও আন্দোলন য়ুরোপীয় রাজনীতিজ্ঞেরা সুনজরে দেখিতে পারিলেন না; তাঁহার য়ুরোপীয় বিদ্বেষের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কিছুকাল কয়েদ করেন; ১৮৮০ সালে মিশরে গিয়া তিনি সেখানে আরবী-পাশার বিদ্রোহান্দোলনে যোগদান করেন। ১৮৮২ সালে ইংরাজ মিশর জয় করিয়া লইলে, জেলালুদ্দিন সেখান হইতে বিতাড়িত হইলেন ও ঘুরিতে ঘুরিতে কনষ্টান্টিনোপলে উপস্থিত হন। এই সময়ে তুর্কীর সুলতান আবদুল হামিদ নিখিল মোসলেমকে একত্র করিবার কল্পনা করিতেছিলেন; জেলালকে পাইয়া তিনি তাঁহাকে এই আন্দোলনের প্রধান পদে নিযুক্ত করিলেন। সেই হইতে ১৮৯৬ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি মোসলেম জগতকে 'এক ধর্মরাজ্য পাশে' বাঁধিবার জন্য বিস্তৃতভাবে আন্দোলন করিয়াছিলেন। য়ুরোপ ও বিশেষভাবে খৃষ্টীয়-য়ুরোপকে বাধা দিবার জন্য মোসলেম জগতকে একত্র হইতে হইবে—ইহাই জেলালের উদ্দেশ্য ছিল। সুলতান আবদুল হামিদ য়ুরোপে ও এশিয়াতে খৃষ্টীয়-জগতের বিরুদ্ধে ইসলাম-জগতকে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৯০৮ সালে Young Turk-দের বিপ্লব, তুরস্কের নব-জাতীয়তা প্রভৃতি ঘটনা কিছুকালের মত নিখিল-আন্দোলনকে রুদ্ধ করিয়া দিল। যুব তুর্কী Pan-Islam এর পক্ষপাতী নহে; তাহারা তীব্র রকমে National স্বদেশভক্ত; মিশরের মুসলমানেরাও জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত, তাহাদের কাছে দেশের কথা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

য়ুরোপের বিরুদ্ধে মোসলেম-জগতের জাগরণের কারণ একটির পর একটি ঘটিতে লাগিল। এই সময়ে পারসীকেরা পারস্যে পার্লামেণ্ট (মজলীস্) স্থাপন করে ও শাসনের সংস্কার চেষ্টা করে; কিন্তু রুশিয়ার জুলুমবাজী ও ইংলণ্ডের বাদসাহী শাসননীতির জটিলজালের মধ্যে পারসিক-

দের সকল চেষ্টা কিরূপভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল তাহা অনেকেই জানেন। Schuster তাঁহার Strangling of Persia নামক গ্রন্থে অতি বিস্তৃতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া জগতের সমক্ষে দেখাইয়াছেন যে একটি প্রাচ্য জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে য়ুরোপীয় রাজনীতি কিরূপ-ভাবে নষ্ট করিয়া দিতে পারে।

মুসলমান-রাজ্যের বিরুদ্ধে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রশক্তি

১৯১২ সালে ইতালি অকারণে তুর্কীর আফ্রিকাস্থিত রাজ্য ত্রিপোলি আক্রমণ করিল। ১৯১২ সালে বলকানের খৃষ্টীয় শক্তিপুঞ্জ একত্র হইয়া তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং কনষ্টান্টিনোপল ব্যতীত তুর্কীর য়ুরোপস্থ সাম্রাজ্যের প্রায় সমস্তই অধিকার করিয়া লইল। ফ্রান্স ও স্পেন মরক্কোতে অধিকার বিস্তার করিল। সর্বত্রই মুসলমানদের রাজ-নৈতিক ক্ষমতাকে সকলেই অপমান করিতে লাগিল।

এই সকল ঘটনা পরম্পরা সমগ্র মোসলেম-জগতকে বিক্ষুব্ধ করিল; 'নিখিল-মোসলেমকে এক করিবার জন্য আন্দোলন এই সব ঘটনায় বৃদ্ধি পাইল। তুর্কীকে সাহায্য করিবার জন্য বলকান্ সমরের সময়ে ভারতবর্ষ হইতে Red Crescent Society প্রেরিত হইয়াছিল। এশিয়ার অ-মুসলমান জাতিদের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন ও আত্মকর্তৃত্বের চেষ্টা দেখিয়া মুসলীম জগত আশান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছিল। রুশ-জাপানের যুদ্ধে রুশের পরাজয় মোসলেম-জগতকে বিশেষভাবে উল্লসিত করিয়া তুলিয়াছিল—পশ্চিমের একটি খৃষ্টান শক্তি পরাভূত হইয়াছে ইহা একটা খুব বড়আশার কথা। ভারতেও ১৯০৪ সালের স্বদেশী-আন্দোলন যখন হিন্দুদের মনকে আশায়, আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত করিল, ভারতীয় মুসলমানগণ তখন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই। চীনের সাধারণ-তন্ত্র স্থাপনের সময়ে চীনা মুসলমানেরা সান-ইয়াৎ সেনকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করিয়াছিল। ১৯১৪ সালে য়ুরোপীয়

জাতীয় আন্দোলন

সময় আরম্ভ হইবার পূর্বে মোসলেম-জগতের মধ্যে সর্বত্র আত্মোন্নতির জন্য চেষ্টা দেখা দিল; তবে এই চেষ্টার মধ্যে ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথায়ও ন্যাশনাল বা জাতীয়ভাবের অপেক্ষা Pan-Islam বা নিখিল-মোসলেমের আন্দোলনের প্রভাব অধিক দেখা দেয় নাই। ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে সর্বত্র জড়ত্ব কাটিয়াছে এবং দাঁড়াইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে।

যুরোপীয় যুদ্ধে তুর্কী জার্মানদের পক্ষ অবলম্বন করিল; মিশরের খেদিভ তুর্কীর (নামমাত্র) বশ্যতা সূত্র ছিন্ন করিয়া স্বয়ং সুলতান উপাধি গ্রহণ করিয়া ইংরাজদের আশ্রয় লইলেন। আরবে মক্কার সরিফ তুর্কী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতা প্রচার করিলেন। ভারতীয় মুসলমানগণ তুর্কীর সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল; মেসোপটেমিয়ার মুসলমানগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে গেল। মোট কথা যুদ্ধের সময়ে মোসলেম জগত যতদূর সম্ভব উল্টাপাল্টা রকমে পক্ষ অপক্ষ নির্বাচন করিয়াছিল। এই ক্ষেত্রে Pan-Islam কার্য্যকরী হইল না; National বা জাতীয় ভাবই সর্বত্র জয়ী হইয়াছিল; এবং জাতীয় স্বার্থবোধে সকলে পক্ষ নির্বাচন করিয়াছিল। সকলেই 'দেশে'র কল্যাণের দিকে তাকাইয়া কার্য্য করিয়াছে। যুদ্ধে তুর্কীর পরাজয় হইল। সুলতানের ঐহিক ক্ষমতা নাম মাত্র থাকিল। যুদ্ধের সময় ইংরাজ-রাজমন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে যুদ্ধের পর তুর্কীর অসম্মানকর কিছু করা হইবে না; কিন্তু যুদ্ধান্তে সন্ধিপত্রে যাহা প্রকাশ পাইল, তাহা দেখিয়া মুসলমান জগত বিস্মিত। ভারতীয় মুসলমানগণ বিশেষভাবে খলিফের পক্ষ লইয়া এক আন্দোলন উপস্থিত করিল। তাহাই খিলাফৎ-আন্দোলন নামে খ্যাত। আমরা এক্ষণে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় ও প্যান ইসলাম আন্দোলনের বিবর্তন-ইতিহাস বিবৃত করিব।

মুসলমান স্বার্থ বনাম জাতীয়-স্বার্থ

তৃতীয় পর্ব

ভারতে মোসলেম-জাগরণ

রাজনৈতিক আন্দোলনে ভারতীয় মুসলমান সমাজ অধিকদিন যোগদান করেন নাই। স্যর সৈয়দ আহমদ, যিনি ভারতের মুসলমান সমাজের প্রধান ও প্রথম সংস্কারক—তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে স্বয়ং কখনো অবতীর্ণ হন নাই এবং ভারতীয় মুসলমানদিগকেও সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন বা সমালোচনা করিবার জন্য কখনো উৎসাহিত করেন নাই।

সৈয়দ আহমদ ও মুসলমান সমাজ সংস্কার

তিনি বলিতেন হিন্দু-নেতারা রাজনীতি আলোচনা করিয়া সরকারের নিকট হইতে যাহা পাইবেন, তাহা ভারতবাসীমাত্রেই সকলে পাইবে, সুতরাং ভারতীয় মুসলমান সমাজ উহা হইতে বঞ্চিত হইবে না। মুসলমানের রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান না করিবার অন্যতম কারণ হইতেছে তাহাদের শিক্ষাভাব। মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞান রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির আলোচনার অভাবে ও অপরদিকে প্রাচীন গোঁড়া ধর্মতত্ত্বের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তাহাদের আত্মোন্নতি করিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। ভারতে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ফলে, নিখিল মোসলেম-জগতকে একত্র করিবার জন্য প্যান-ইসলাম আন্দোলনের ফলে, মুসলমানদের মধ্যে জাগরণের ভাব দেখা দিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে হিন্দুসমাজে যে নূতন জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল, তাহাও মুসলমানদিগকে উদ্বেলিত করিয়াছিল। মুসল-

মানেরা বুঝিল তাহাদেরও একটা দাবী আছে। Pan-Islamic আন্দোলনের প্রভাবে মুসলমানেরা তুরস্কের সুলতানের খলিফত্বকে নূতনভাবে দেখিয়া নব জাগরণের সূচনা করিতেছিল। এক্ষণে মুসলমানের মধ্যে দুইটি আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে জাগিল। প্রথমত তাহারা যে মুসলমান, বিরাট মোসলেম-জগতের সহিত যুক্ত—এই কথাটি অতি সুস্পষ্টভাবে ক্রমেই প্রকাশ পাইতেছিল। দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের একটি পৃথক্ দাবী আছে এই আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। সমগ্র ভারতের জাতীয় জীবনে হিন্দুর স্বার্থ ও মুসলমানের স্বার্থ পৃথকাকারে দেখা দিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন সুরু হইলে বাঙালী হিন্দু যেমনভাবে ইহাতে যোগদান করিল বাঙালী মুসলমান তেমনভাবে ইহাতে যোগদান করিতে পারে নাই।

ইংরাজী শিক্ষা প্যান ইসলাম ও স্বদেশী আন্দোলন

জাতীয় আহ্বানে সাধারণ মুসলমানেরা সাড়া দিল না; বঙ্গচ্ছেদ হওয়াতে ঢাকায় পূর্ববঙ্গ-আসামের রাজধানী হইলে মুসলমানদের চাকুরী ও সম্মান লাভের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। তাহারা নানা প্ররোচনায় পড়িয়া স্বদেশী আন্দোলনকে তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনা করিয়া উহা হইতে দূরে থাকিল এবং বহুস্থলে প্রকাশ্যভাবে শত্রুতাচরণ করিল। দেশের মধ্য হইতে স্বদেশীর 'হুজুগ', দেশের বাহির হইতে মোসলেম-জগতের মিলন-চেষ্টার আন্দোলনের তরঙ্গাঘাতে মুসলমান সমাজ সজাগ হইল ও স্বজাতিদিগকে বিশেষভাবে মিলিত করিয়া এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার অভাব অনুভব করিল। এই অভাব দূর করিবার জন্য ১৯০৬ সালে (Moslem League) মোস্‌লেম লীগ স্থাপিত হইল। ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রধান প্রধান স্থানে মোসলেম উলেমাগণ স্বধর্মে বিশ্বাস ও স্বজাতির মধ্যে নিষ্ঠা ও শক্তি জাগ্রত করিবার

স্বদেশী-আন্দোলনে মুসলমানদের অনুৎসাহ

জন্য বক্তৃতা করিয়া ও 'অনজুমান' স্থাপন করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করেন।

মোসলেম-লীগ
১৯০৬

মুসলমানদের মধ্যে ধর্মসম্বন্ধে শিথিলতা দূর হইতে লাগিল; নামাজ পড়া, রোজা করা, মসজিদে যাওয়া, হজকরা, বকর-ইদে গরু-কোরবাণী করা প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। যুবক মুসলমানেরা 'তুর্কী'ফেজ মাথায় দিল, সর্বত্র জাগরণের সাড়া পড়িল।

এই সময়ে (১৯০৭) মিণ্টো-মর্লী শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল; খোজা-সম্প্রদায়ের গুরু ও মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট নেতাদের অন্যতম শ্রীযুক্ত আগা খাঁ বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুসলমানদের পৃথক অধিকার ও দাবী যাহাতে বজায় থাকে সেজন্য আর্জি পেশ করিলেন। সম্প্রদায়গত প্রতিনিধি-নির্বাচনে সরকার সায় দিলেন।

১৯০৭
শাসন-সংস্কারে
পৃথক-নির্বাচন

দেশের সর্বত্র বড় বড় সভায় মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য সভা আহূত হইতে লাগিল; তাহাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, তাহাদের ছাত্রদের জন্য বিশেষ হোষ্টেল, তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যার চাকুরী যেন থাকে—ইত্যাদি প্রস্তাব পাশ হইতে লাগিল। সর্বত্র মনোভাব পৃথকীকরণের দিকে ঝুঁকিল। স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানেরা প্রাণ খুলিয়া যোগদান করে নাই। এই সময়ে হিন্দু যুবকের দল নরহত্যাদি করিয়া বিবিধ বিপ্লব প্রচেষ্টা সুরু করিয়াছিল। তখন (১৯০৮) আগা খাঁ মুসলমানদের সাবধান করিয়া বলিলেন যে, চারিদিকে যে অশান্তির আগুন জ্বলিয়াছে, উহাতে কোনো মুসলমানের যোগদান করা উচিত নয়। স্বাভাবিক পথ ধরিয়া উন্নতির আশা করিতে

মুসলমানদের
রাজনৈতিক মত

হইবে। দেশের সকল ভক্তের উচিত যাহাতে বৃটীশ-শক্তি ভারতে বৃদ্ধি পায়। মোসলেম লীগের মত-বিশ্বাস ইহারই অনুরূপ গঠিত হইয়াছিল। যথা—

(১) বৃটীশরাজের প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের ভক্তির ভাব জাগ্রত করা ও সরকারের কোনো ব্যবস্থা সম্বন্ধে লোকের মনের মধ্যে ভুল ধারণা জন্মিলে তাহা দূর করিবার চেষ্টা। (২) ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক ও অন্যান্য অধিকার রক্ষা করা, এবং সংযত ভাষায় সরকার বাহাদুরের নিকট স্বজাতির অভাব অভিযোগ নিবেদন। (৩) পূর্বোক্ত সর্তগুলি রক্ষা করিয়া যতদূর সম্ভব অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত মিত্রতা রক্ষা করা।

এই আদর্শে মুসলমান সমাজ কয়েক বৎসর চলিল। বিলাতে মোস্‌লেম লীগের একটি শাখা স্থাপিত হইল; বাহিরের মুসলমানদের সহিত ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক ক্রমেই স্থাপিত হইতে লাগিল। এই সময় হইতে য়ুরোপের রাষ্ট্র-শক্তিসমূহ এশিয়া ও মুসলমান আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহের উপর জুলুম-বাজি করিতে সুরু করেন। International সম্বন্ধ-বিষয়ক সুনীতি রক্ষার নিয়ম মুসলমান রাজ্য সম্বন্ধে বর্তাইত না। ইতালি তুর্কীর রাজ্য ত্রিপোলী আক্রমণ করিলেন, জয়ও করিলেন; কিন্তু আরব ও মুসলমান বারবার (Berber)-দের উপর যে প্রকার অকথিত অত্যাচার হইল, তাহাতে সমগ্র মোসলেম জগত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। খৃষ্টীয় য়ুরোপের উপর মুসলমানদের বিদ্বেষের ভাব উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ১৯০৮ সালে পারস্যের মধ্যে য়ুরোপীয় আদর্শে পার্লামেণ্ট বা মজলিস স্থাপনের চেষ্টা, তাহার আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য যে-চেষ্টা হইল তাহা রুশিয়ার জুলুমবাজির জন্য নষ্ট হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি; ইংলণ্ড এই সব ব্যাপার জানিয়া শুনিয়াও রুশিয়ার প্রতিরোধ করিলেন না। পারস্যের মধ্যে রুশিয় ও ইংরাজ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চলিতে লাগিল তাহাও মুসলমানেরা পছন্দ করে নাই। ইহার পর ১৯১২ সালে য়ুরোপে বলকান সমরে তুর্কী তাহার য়ুরোপীয় রাজ্যের অধিকাংশ হারাইল, মুসলমান জাতির অপমানের একশেষ হইল। এই সব ঘটনায়

বহির্ভারতের মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি

ভারতীয় মুসলমানেরা বিশেষভাবে চঞ্চল হইয়া উঠে; মহম্মদ আলি, ডাঃ আনসারী প্রভৃতি মুসলমান নেতারা তুর্কীতে একটি চিকিৎসা-মিশন প্রেরণ করিলেন। ভারতীয় মুসলমানের মন ক্রমেই বহির্ভারতীয় নিখিল মোসলেম-জগতের কল্যাণ অকল্যাণ, সুখ দুঃখের সহিত যুক্ত হইতেছিল ও তাহারা যে বিরাট মোসলেম-জগতের অঙ্গ, এই কথাটাই নানা ভাবোচ্ছাসের মধ্য দিয়া তাহারা প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইল।

এদিকে ভারতের জাতীয় আন্দোলন ক্রমশই প্রসার লাভ করিতেছিল; জাতীয়ভাব নানা আকার গ্রহণ করিয়া বিচিত্র পথে চলিতেছিল। মুসলমান সমাজ ভারতের জাতীয় জীবনের এই আনন্দ-স্পন্দনে অসাড় থাকিতে পারিল না। ১৯১৩ সালের প্রারম্ভে 'মোসলেম-লীগে'র Constitution এর মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হইল। ১৯০৬ সালের সকল সর্তই বজায় থাকিল; উপরন্তু এই নূতন প্রস্তাব গৃহীত হইল যে ভারতে স্বায়ত্বশাসন পদ্ধতি প্রবর্তিত করিবার জন্য লীগ সচেষ্ট হইবেন। গোঁড়া মুসলমান সমাজ কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনে এতকাল প্রাণ খুলিয়া যোগদান করেন নাই; কিন্তু ক্রমেই নবীন শিক্ষিত দল জাতীয় আদর্শে যোগদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৯১৩
মোসলেম লীগের
প্রসার

১৯১৪ সালের জুলাই মাসে য়ুরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হইল। ভারতীয় মুসলমানেরা নানা আড়ম্বরে বৃটীশ-সাম্রাজ্য সংরক্ষণের জন্য উচ্ছাস প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু তুর্কী অকস্মাৎ এই সময়ে অবতীর্ণ হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে জার্মানী-অষ্ট্রীয়ার পক্ষ অবলম্বন করিল। সম্রাট্ একপক্ষে, মুসলমানের ধর্মগুরু খলিফ তুর্কীর সুলতান অপর পক্ষে। তুর্কীর প্রতি তাহাদের সহানুভূতি ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছিল, সে-কথা পূর্বে বলিয়াছি; এখন ইংরাজ-তুর্কীতে বিরোধ দেখিয়া তাহারা বড়ই মুস্কিলে পড়িল।

১৯১৪
য়ুরোপীয় সমর

১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মোসলেম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি বলিলেন যে "আমাদের সম্রাট্ বাহাদুরের বিরুদ্ধে আমাদের খলিফের যুদ্ধ ঘোষণা আমাদের পক্ষে বড়ই পীড়াদায়ক। আমাদের তুর্কীস্থ স্বধর্মীভ্রাতা-দিগকে বৃটীশ-সাম্রাজ্যের সৈন্যদলের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে দেখিলে আমরা সুখী হইতাম।" কিন্তু 'লীগ' সভায় এই ইচ্ছা প্রকাশ ও এই আশা পোষণ করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে যুদ্ধশেষে কোনো মুসলমান রাজ্যের প্রতি অবিচার করা যেন না হয়।

তুর্কীর জার্মান পক্ষাবলম্বন

১৯১৫ সালের জুন মাসে জানা গেল যে মক্কার 'শরীফ' তুর্কীর সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছেন। বিদ্রোহের যাহাই কারণ থাকুক—মক্কার প্রধান ধর্মগুরু মুসলমান জাতির ধর্মগুরুর বিরুদ্ধতা করিলেন। এই ঘটনাটিতে বুঝা গেল যে এই সকল জাতি পক্ষ (ally) নির্বাচন বিষয়ে কোনো নিখিল-মোসলেম-ঐক্যের মোহে দেশের জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেন নাই। মক্কার শরীফ মহম্মদ যে কোরায়েশ জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি সেই জাতির লোক। মুসলমানেরা শরীফকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত; এবং যদিও ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তুর্কীর সুলতান 'খলিফের' উপাধি লইয়া মুসলমান সমাজের নেতৃস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাচ এ পর্য্যন্ত সুলতান ও শরীফে বিরোধ বা বিচ্ছেদ হয় নাই। শরীফের ব্যাপার লইয়া ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ দেখা গেল। 'লীগে'র নেতারা শরীফের ব্যবহার নিন্দা করিলেন; কিন্তু কলিকাতার মুসলমান সমাজ তাঁহার কার্য্য অনুমোদন করিলেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা বিস্তার লাভ করিবার পূর্বেই সরকার বলিলেন এ প্রকার আন্দোলন সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতির অনুকূল নহে।

মক্কা শরীফের তুর্কীর বিরুদ্ধতা

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের সর্বত্র রাজনৈতিক আন্দোলন বিশেষভাবে প্রসার

লাভ করিতেছিল। যথাস্থানে আমরা শ্রীযুক্ত তিলক, শ্রীমতী বেসান্তের 'হোমরুল লীগ' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কথা ও বিপ্লববাদীদের গুপ্ত-প্রতিষ্ঠানের গোপন কর্মসমূহের কথা বলিয়াছি। মোট কথা দেশের মধ্যে অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার পাইবার জন্য বিচিত্র পথে লোকে চলিতেছিল। 'কংগ্রেস' দেশের মুখ্য প্রতিষ্ঠান হইলেও মতভেদহেতু দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯০৭ সাল হইতে জাতীয়দল কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই। 'মোস্লেম লীগ' মুসলমান-স্বার্থ রক্ষার জন্য গঠিত হইয়াছিল বলিয়া উহা পৃথক্‌ভাবে কাজ করিতেছিল। কংগ্রেসকে অনেক মুসলমান সুনজরে দেখিতেন না এবং উহা একটা হিন্দু-প্রতিষ্ঠান বলিয়া দূরে দূরে থাকিয়া নিজেদের 'লীগে'র কর্ম লইয়াই থাকিতেন। দেশের সাধারণ রাজনীতিতে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মুসলমান যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯১৬ সালে ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল; 'লীগে'র বার্ষিক অধিবেশনও উক্ত নগরীতে হইয়াছিল। এইখানে কংগ্রেস ও লীগ একত্রে কাজ করিবার জন্য মিলিত হইলেন; এই কংগ্রেসে নরমপন্থী, চরমপন্থী, 'হোমরুলার,' প্রভৃতি সকল মতের লোক সমবেত হইয়াছিলেন। সভায় হিন্দু ও মুসলমান, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে যে মিলনসর্ত ও চুক্তি গৃহীত হইয়াছিল, তাহা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। কংগ্রেস ও লীগের এই মিলনকে গোঁড়া লোকেরা ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। উভয় সম্প্রদায়ের অশিক্ষিত লোকের মধ্যে সাম্প্রদায়িক স্বার্থগুলিই অতিরঞ্জিতাকারে দেখা দিল; দেশের জাতীয় কল্যাণের দিক হইতে মিলনকে দেখিলে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থ দূর করিতে হয়, এ শিক্ষা দেশবাসীর হয় নাই। সে-সময়ে কংগ্রেস বা লীগ শিক্ষিত লোকের রাজনৈতিক মিলনভূমি ছিল; অশিক্ষিত জনসাধারণের মতামতের উপর ইঁহাদের প্রভাব সামান্যই ছিল। গোঁড়া হিন্দুপত্রিকারা বলিতে

১৯১৬ লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসে সকল দলের মিলন

লাগিলেন যে লক্ষ্ণৌএর কংগ্রেসে মুসলমানদের দাবী বেশী করিয়া পূরণ করা হইয়াছে, কারণ নেতারা রাজনৈতিক মিলন ঘটাইবার জন্য মুসলমানদের সকল প্রকার চাহিদা মানিয়া লইয়াছেন। আবার গোঁড়া মুসলমানেরা বলিতে লাগিলেন যে 'লীগ' হিন্দুদের কবলে গিয়া পড়িয়াছে; এই মিলন মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী। মোট কথা যে-মিলন হইল তাহা নিতান্ত ভাসাভাসা।

কিছুকাল হইতে মহম্মদ আলী ও তাঁহার ভ্রাতা সৈয়কৎ আলী ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহম্মদ আলী কমরেড (Comrade) ও 'হামদাম' নামক দুইখানি পত্রিকা সম্পাদন করিতেন; ইহাতে মুসলমানদের বিশেষত্ব, ভারতবর্ষে ও অন্যত্র তাহাদের দুরবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা থাকিত। তুর্কীর প্রতি প্রত্যেক মুসলমানদের যে স্বাভাবিক প্রীতি আছে, মহম্মদ আলীও সেই আকর্ষণের বশীভূত হইয়া যুদ্ধের সময়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। ভারত-সরকারের বিবেচনায় সেগুলি রাজ-অশ্রদ্ধজনক বোধ হইল ও তাঁহারা 'কমরেড' ও 'হামদামে'র বিরুদ্ধে লাগিলেন। পত্রিকাদ্বয় বন্ধ হইল; ছাপাখানা প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত হইল। ইহারই কিছুকাল পরে ১৯১৫ সালের মে মাসে আলীভ্রাতাদ্বয়কে ভারত-রক্ষা আইনানুসারে অন্তরীনাবদ্ধ করা হইল।

মহম্মদ আলী ও কমরেড্ পত্রিকা

মুসলমানদের মধ্যে দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু হইল। এই সময়ে শ্রীমতী বেসান্ত অন্তরীনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বেসান্তকে আবদ্ধ করাতে ভারতবর্ষময় হিন্দু-সমাজ ভীষণ প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। রাজনৈতিক আন্দোলনকারীরা আলী-ভ্রাতাদের অন্তরীনাবদ্ধ ব্যাপারটিকে বেসান্তের ঘটনার সহিত যুক্ত করিয়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন। ইহার ফলে হিন্দু-মুসলমানে

আলী-ভ্রাতাদ্বয় ও বেসান্তের অন্তরীন

আপাতঃসুন্দর রাজনৈতিক মিলন হইল ও সমগ্র ভারতে অন্তরীনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতে লাগিল।

য়ুরোপীয় সমরে তুর্কী যোগদান করাতে ভারতীয় মুসলমানগণ যুদ্ধের সংবাদ জানিবার জন্য বিশেষ উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। তুর্কী যখন মেসোপটেমিয়ায় বৃটীশ সেনাপতি টাউনসেণ্ডকে সসৈন্য বন্দী করিল তখন মনে মনে সকলেই খুসী হইয়াছিল—কারণ তুর্কী বিজয়ী হইয়াছে। ১৯১৭ সালের শেষাশেষি হইতে তুর্কীর ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিতে সুরু হইল। বৃটীশ রাজের স্বাভাবিক শক্তি পুনরায় প্রকাশ পাইল। তুর্কী পদে পদে পরাভূত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিল। এই ঘটনায় ভারতীয় মুসলমানেরা খুবই চঞ্চল হইয়া উঠিল—তাহারা খলিফের পরাজয় হইতেছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহারা একথা বিস্মৃত হইলেন যে তুর্কীর সুলতান মুসলমান-সমাজের খলিফরূপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নাই; রাজনৈতিক ও জাতীয় সুবিধা ও লাভের আশায় তিনি যুদ্ধে জার্মানদের পক্ষ লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, নিখিল মোসলেম-জগতের মত বা ভাবের দিক দিয়া বিচার তিনি করেন নাই। ভারতীয় মুসলমানগণ যখন তুর্কীর প্রতি মনে মনে সম্ভ্রম ও বিজয়ের আশা পোষণ করিতেছিলেন, তখন হিন্দুরা তাহাদের এই বহির্মুখীন রাজনৈতিকতার সমর্থন করিতে পারে নাই। তুর্কীর পরাজয়ে মুসলমানদের আন্তরিক বেদনার সহিত হিন্দুরা প্রাণ খুলিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিল না। যাঁহারা এই বহির্মুখীনতা সমর্থন করিলেন না তাঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা হারাইলেন।

তুর্কীর ভাগ্য বিপর্য্যয়

রাজনীতিতে যোগদান করে মুষ্টিমেয় লোক, সমাজনীতি লইয়া থাকে সংখ্যাহীন মূঢ় সাধারণ। তাহাদের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন national না হইয়া 'জাতে'র আন্দোলনরূপে প্রকাশ পাইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুত্ব ও মুসলমানদের

মধ্যে গোঁড়া মৌলবীদের প্যান-ইসলাম আন্দোলন প্রচারের ফলে গোঁড়া মুসলমানত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 'জাতে'র কথা ভুলিয়া জাতির কথা কোনো পক্ষই ভাবিতেছিলেন না। কিছুকাল হইতে বকর ইদ ও মহরমের সময়ে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার কথা প্রায়ই প্রকাশ পাইতেছিল। মুসলমানদের মধ্যে গো-বধ লইয়া বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামীর ভাব ও হিন্দুদের মধ্যে তাহা লইয়া অসহিষ্ণুতা প্রকাশ ও হিন্দুয়ানী নষ্ট হইতেছে বলিয়া আস্ফালন করিবার ভাব, উভয় সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদকে গভীরতর করিতেছিল। বকরইদের সময়ে এই বৎসর (১৯১৭) বিহারে ভীষণ দাঙ্গা হইল। সেপ্টেম্বর মাসে বিহারের নানাস্থানে হিন্দুরা ইদের দিনে মুসলমানদের উপর চড়াও হইয়া অত্যাচার মারপিট করে। দাঙ্গা এমনি ভীষণাকার ধারণ করে যে অবশেষে মিলিটারী পুলিশ আসিয়া দেশে শান্তি ফিরাইয়া আনে। আরা জিলায় ত্রিশ খানি গ্রামে লুটতরাজ হয়। পঁচিশ হাজার হিন্দু পাটনার কয়েকটি জিলায় মুসলমানদের গ্রাম লুট করে। কোনো কোনো স্থানে ছয়দিন পর্য্যন্ত অরাজকতা চলিয়াছিল। এই ঘটনায় সাধারণ হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মনোমালিন্য অতিশয় বাড়িয়া গেল। মুসলমান নেতারা এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, কৌন্সিলে বা শাসনবিভাগে হিন্দুদের প্রতিপত্তি বাড়িলে তাহাদের কিরূপ দুর্দশা হইবে, তাহার উদাহরণ পাওয়া গেল। হিন্দুরা দাঙ্গাকারীদের নিন্দা করিলেন ও উৎপীড়িত মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তিনশত চৌষট্টি দিন বাজারে মাংস সরবরাহের জন্য প্রতিদিন বহুশত গোবধ দেখিয়া, জাহাজে শুক্‌নো মাংস সরবরাহের জন্য লক্ষ গোবধ হত্যা সহ্য করিয়া, সরকারী সৈন্যবিভাগের খাদ্য সরবরাহের জন্য বহুসহস্র গোবধ নীরবে

হিন্দু মুসলমান বিরোধ

বিহারের বকরইদের হাঙ্গামা

উভয় সম্প্রদায়ের মন কষাকষি

সহ্য করিয়া, হঠাৎ একদিন ধর্মের নামে গো-বধ লইয়া অধীর হওয়াটা প্রতিবেশীর উপযুক্ত কর্ম নয়—একথা ধর্মপ্রাণ অশিক্ষিত হিন্দুরা বুঝিলেন না। মুসলমানেরাও এই অজুহাত পাইয়া বলিল যে তাহাদের ধর্ম বজায় রাখিতে হইলে কংগ্রেস-লীগের মিলন-সর্তে তাহাদের স্বার্থ রক্ষিত হইবে না। সেই বৎসরে মোসলেম-লীগের সভায় তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে আগত শাসন-সংস্কারে তাঁহাদের প্রতিনিধিসংখ্যা পূর্বের দাবী হইতে আরও শতকরা পঞ্চাশ হারে বাড়াইতে হইবে। ১৯১৬ হইতে ১৯১৭ সাল এই এক বৎসরের মধ্যেই মিলনের সূত্রে জট পাকাইতে সুরু হইল। তবুও বাহিরের কাঠাম বজায় থাকিল। ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার কংগ্রেসে শ্রীমতী আনি বেসান্ত অন্তরীন হইতে মুক্তি পাইয়া সভানেতৃ হইলেন।

১৯১৭
কলিকাতার
কংগ্রেসে
আলী জননী

আলীভ্রাতারা কোনো প্রকার মুচলেখা দিতে অস্বীকৃত হন—কারণ তাঁহারা রাজদ্রোহজনক কোনো কিছুই করেন নাই। কলিকাতার কংগ্রেসে আলি ভ্রাতাদের বীর জননী বোরখা পরিয়া নির্বাসিত পুত্রদের প্রতিনিধিরূপে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

১৯১৮ সালের জুলাই মাসে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল। দেশের উপর উহার তৎকালীন প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল, আমরা তাহা অন্যত্র বিবৃত করিয়াছি। মুসলমান সমাজ যেরূপ প্রতিনিধি নির্বাচনের আশা করিয়াছিলেন, তাহা সরকারের পক্ষে সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। ইহাতে মুসলমানেরা সরকারের উপর বিরক্ত হইলেন।

১৯১৮ সালের শেষাশেষি যুদ্ধ শেষ হইল। তুর্কী পরাজিত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল। তুর্কীর পরাজয়ে সুলতানের 'খলিফত্বের' গৌরব কিরূপ থাকিবে তাহা লইয়া ভারতবর্ষীয় মুসলমান সমাজ বিশেষভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিল। য়ুরোপের পত্রিকাসমূহ বলিতে লাগিল যে য়ুরোপীয়

সময়ে তুর্কীর যোগদান করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছিল। সুতরাং এখন তাহার উপযুক্ত ফলও তাহাকে পাইতে হইবে। তুর্কীর ভবিষ্যৎ লইয়া অনেক জল্পনা কল্পনা য়ুরোপের রাজনীতিক মণ্ডলে হইতে লাগিল। এদেশের মুসলমানেরাও এ-লইয়া আন্দোলন সুরু করিল।

১৯১৮
যুদ্ধ শেষ ও
তুর্কীর পরাভব

যুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতীয় মুসলমানগণ যখন ইংরাজের পক্ষে তুর্কীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে প্রস্তুত হয়, তখন প্রধান-সচিব লয়েড-জর্জ বলিয়াছিলেন যে যুদ্ধের পর মুসলমানদের প্রতি সদবিচার করা হইবে, তুর্কীর অপমান হইবে না। কিন্তু সন্ধিসর্ত প্রকাশিত হইতে অসম্ভব বিলম্ব হইতে লাগিল এবং সাধারণ য়ুরোপীয় পত্রিকাপরিচালকগণ অনেক বিরক্তিকর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া মুসলমানদের চিত্তকে বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ভারতীয় মুসলমান সমাজ 'খলিফের' সম্মান বজায় রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। ইহাই খিলাফৎ-আন্দোলন।

———o———

চতুর্থ পর্ব

খিলাফৎ আন্দোলন

তুর্কীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া দেশময় যে আন্দোলন সুরু হইল তাহারই নাম 'খিলাফৎ আন্দোলন'। ইহাকে সংহত ও কার্য্যকারী করিবার জন্য আন্দোলনকারীরা যে প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন তাহার নাম 'খিলাফৎ কমিটি'। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল 'খলিফত্বের' উন্নতি ও উহার সম্মান রক্ষা; যুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ যাহাতে তুর্কীর সহিত সসম্মানে সন্ধি করেন সে-বিষয়ে চেষ্টা; খিলাফৎও জাজিরৎ উল-আরব বা ধর্মস্থান মক্কার অছিত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ধর্মসঙ্গত নিষ্পত্তি বাঞ্ছনীয়; ইংলণ্ডের প্রাজমন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে মুসলমানদের প্রতি অধর্মসঙ্গত কোনো ব্যবহার হইবে না, সে কথার সত্যতা যাহাতে রক্ষিত হয়, সে বিষয়ে আন্দোলন করা এই কমিটির কর্তব্য। উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা ও আন্দোলন করিবার জন্য, মুসলমান সমাজকে এক করিবার জন্য ভারতে ও ভারতের বাহিরে খিলাফৎ-কমিটি গঠিত হইল। ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল অন্যান্য দেশের মুসলমানদের সহিত ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য স্থাপন। খিলাফৎ প্রশ্ন উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে 'রৌলট অ্যাক্ট' পাশ ও পঞ্জাবের দুর্ঘটনা ঘটিল। মহাত্মা গান্ধী রৌলট-অ্যাক্ট, পঞ্জাবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশময় প্রতিবাদ আন্দোলন উপস্থিত করেন; মুসলমানদের প্রতি খিলাফৎ লইয়া অন্যায় হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তিনি হিন্দু সমাজ ও প্রত্যেক ভারতবাসীকে মুসলমান ভ্রাতাদের দুর্দিনে

খিলাফৎ কমিটির উদ্দেশ্য

গান্ধীজি ও খিলাফৎ

সাহায্য করিবার জন্ত আহ্বান করিলেন, তখনও অসহযোগের কথা উত্থাপিত হয় নাই।

১৯২০ সালের প্রথমদিকে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান বড়লাট বাহাদুরের নিকট তুর্কীর ভাগ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ত উপস্থিত হন। লর্ড চেমসফোর্ড যথেষ্ট সহানুভূতির সহিত তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিলেন ও বলিলেন যে এ-ব্যাপারে কেবল বৃটীশ-রাষ্ট্র যুক্ত নহেন, উহা য়ুরোপীয় রাজনীতির ব্যাপার; তথাচ মুসলমানদের প্রতি যাহাতে কোন প্রকার অন্তায় না হয়, সে-বিষয়ে ইংরাজের দৃষ্টি থাকিবে। ভারতবর্ষ হইতে অপর একটি

খিলাফৎ ডেপুটেশন

ডেপুটেশন বিলাতে গমন করিল; মহম্মদ আলী ইহার নেতা হইয়া যান। তাঁহাদের অভিপ্রায় বিলাতে প্রধান-মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া খিলাফৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের আবেদন পেশ করা। সেখানে তাঁহারা কোনো আশার কথা শুনিলেন না। মন্ত্রী মহাশয় স্পষ্টই বলিয়া দিলেন যে তুর্কীকে তুরস্ক রাজ্য ছাড়া আর কোথাও রাজ্য দেওয়া হইবে না। আর সন্ধি-সর্তের ব্যবহার সম্বন্ধে অন্তান্ত পরাজিত জাতির প্রতি যে ব্যবহার করা হইবে, তুর্কীর প্রতিও তদনুরূপ ব্যবহার হইবে। ডেপুটেশন ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলে খিলাফৎ লইয়া আন্দোলন বৃদ্ধি পাইতে থাকিল।

এদিকে সৈয়কৎ আলী এক ফতোয়া প্রচার করিলেন যে আগত সন্ধির সর্ত্তে মুসলমানদের দাবী যদি না পুরণ করা হয়, তবে ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে ইংরাজদের সহিত সহযোগীতা রক্ষা করা কঠিন হইবে। সাধারণ মুসলমান প্রচারকেরা ধর্মের নামে চারিদিকে খিলাফতের কথা প্রচার করিতে গিয়া অনেকখানি বিদ্বেষ প্রচার করিতেছিলেন। খিলাফৎ ধর্মের কথা; সুতরাং রাজনীতি অপেক্ষা উহা সাধারণ মুসলমানের নিকট অধিক বোধগম্য। দেশময় তুর্কীর জন্ত সহানুভূতি জাগ্রত করিতে গিয়া যে আন্দোলন চলিল, তাহাতে শিক্ষিত, অশিক্ষিত মুসলমান বুঝিয়া না বুঝিয়া 'ইসলামের

'বিপদ' কল্পনা করিয়া জবরদস্তভাবে আন্দোলন চালাইতে লাগিল। এমন সময়ে বহুকাল অপেক্ষিত তুর্কীর সন্ধি-সর্ত প্রকাশিত হইল। তাহাতে য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ তুর্কীর সুলতানের বা সাম্রাজ্যের কোনো শক্তি বা সম্মান রক্ষা করিলেন না। য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের দ্বারা তুর্কীর সৈন্যবল নির্দিষ্ট হইল, তাহার রাজ্য সীমাবদ্ধ হইল; বহির্জাতির সহিত সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হইল। খৃষ্টীয় য়ুরোপের দ্বারা মুসলমান-জগতের শেষ অবমাননা চরমে উঠিল। এই সন্ধি-সর্তে মুসলমান সমাজ অত্যন্ত ব্যথিত ও চঞ্চল হইল। খিলাফৎ আন্দোলন সবেগে চলিত।

খিলাফতের প্রসার

গান্ধীজি রৌলট অ্যাক্ট পাস হওয়াতে সরকারের সহিত সকলপ্রকার সহযোগ বর্জন করিবার জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত করেন তাহা আমরা পূর্বেই বর্ণন করিয়াছি। তিনি মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলন ন্যায্য বিবেচনা করিয়া ইহাকে তাঁহার কর্মসূচীর মধ্যে গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে সন্ধি-সর্তে তুর্কীর সম্মান বজায় রাখিয়া মুসলমানদের ধর্মরক্ষা না করা হয়, তবে তিনিও অ-সহযোগ আন্দোলনের দ্বারা সরকারের শাসন-যন্ত্র অচল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন। ইহার পরে যখন সন্ধি-সর্ত প্রকাশিত হইল, তখন তিনি রৌলট অ্যাক্ট, পঞ্জাবের অত্যাচার প্রভৃতি জাতীয় অভিযোগের সহিত মুসলমানদের খিলাফৎ-সম্বন্ধে অভিযোগকে যুক্ত করিয়া দিলেন। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগনীতি গৃহীত হইল। ডিসেম্বরের নাগপুরের কংগ্রেসেও উহা পুনরালোচিত হইয়া বিশেষভাবে হিন্দুদের সাহায্য পাইয়া শক্তিশালী হইল।

গান্ধীজির যোগদান

এই সময় খিলাফৎ আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মোন্মত্ততা বিশেষভাবে দেখা দিয়াছিল। সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একদল

মুসলমানের মধ্যে ধারণা জন্মিয়াছিল যে ইংরাজ-রাজ্যে বাস করা বিশ্বাসী-মুসলমানদের পক্ষে পাপ, মুসলমান রাজার রাজ্যে বাস করাই ধর্ম। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া একদল মুসলমান ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। জমিজমা, ঘরবাড়ী, পশুপাল জলের দরে বিক্রয় করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া আফগানিস্থান—মুসলমান আমীরের রাজ্যে বাস করিবার জন্য যাত্রা করিল। জনস্রোত দেখিয়া আফগান গভর্ণমেণ্ট ভীত হইয়া পড়িলেন ও সে-দেশে লোক প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিলেন। ইসলামের নামে অলৌকিক ঘটনা ঘটিল না; আমীর খিলাফৎ আন্দোলনে একটুও বিচলিত না হইয়া তাঁহার দেশের অধিবাসীদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই ধর্মোন্মত্ত বিশ্বাসীদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিলেন। লোকে কপর্দ্দক-হীন ফিরিতে লাগিল। পেশোয়ার হইতে কাবুল পর্য্যন্ত সারাপথ এই সরল বিশ্বাসীদের কবর দৃষ্ট হয়। 'মুহাজরিন্' বা 'হিজরৎ' এমনিভাবে বার্থ হইল; এবং যে সয়তানী-সরকারের উপর বিরক্ত হইয়া তাহারা দেশত্যাগী হইয়াছিল, সেই সরকারই তাহাদিগকে পুনরায় সংসারে স্থির হইয়া বসিতে প্রধানত সাহায্য করিয়াছিল।

মহাজরিন বা মুসলমানদের ভারত-ত্যাগ

আলীভ্রাতা ও খিলাফৎ কমিটির বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়া গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন খুবই উৎসাহের সহিত চালনা করিতে লাগিলেন। খিলাফৎ সম্বন্ধে য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ যে-অন্যায় করিয়াছিল তাহার জন্য একমাত্র ভারতীয় বৃটীশ-সরকারকেই দায়ী সাব্যস্ত করিয়া, তাহার বিরুদ্ধে পূর্ণোদ্যমে অসহযোগ আন্দোলন চালিত হইল। গান্ধীজি মুসলমানদের সহিত যোগদান করিলেন ও খিলাফৎ-আন্দোলনকে নিরুপদ্রব-অসহযোগ রাখিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার 'আধ্যাত্মিক' অসহযোগ ও মুসলমানদের খিলাফতের ধর্মান্দোলন দেশের মধ্যে ভীষণ আবেগ ও উত্তেজনা এমন কি অশান্তি সৃষ্টি করিতে লাগিল। মুসলমানদের মধ্যে সকলে

গান্ধীজির 'আধ্যাত্মিক-নিরুপদ্রবতা' মন্ত্রে শ্রদ্ধাবান হইতে পারেন নাই। মাদ্রাসের 'খিলাফৎ কনফারেন্সে' আলীভ্রাতারা যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা দেশের হিন্দুসমাজ বা সরকারকে অত্যন্ত চঞ্চল ও ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। তাঁহারা স্পষ্ট বলিলেন যে তাঁহাদের সর্ব-প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইতেছে 'ইসলাম-রক্ষা' বা খিলাফতের স্বার্থ দেখা। এমন কি আফগান আমীর ভারতবর্ষকে উদ্ধার (জয় নহে) করিতে আসেন, তবে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হইবে তাহাতে যোগদান করা। মুসলমান রাজনীতিক নেতার এই কথায় হিন্দুরা খুবই বিরক্ত হইল; কিন্তু গান্ধীজি উহাতে আছেন বলিয়া তাহারা স্পষ্ট করিয়া প্রতিবাদও করিল না—পাছে হিন্দু-মুসলমানের 'রাজনৈতিক ভ্রাতৃত্ববন্ধন' আহত হয়! লোকে সন্দেহ করিল গান্ধীজি মুসলমানদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনে দলভুক্ত রাখিবার জন্য তাহাদের সর্বপ্রকার জিদ্ চাহিদা পূরণ করিতে প্রস্তুত। মহারাষ্ট্র-দেশে তাঁহার আধ্যাত্মিক অসহযোগ মোটেই শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হয় নাই।

মাদ্রাসে আলীভ্রাতাদের বক্তৃতা

আলিভ্রাতাদের মাদ্রাসে বক্তৃতায় গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন; অনেকেই সন্দেহ করিলেন সরকার তাঁহাদের কোনো প্রকার শাস্তি বিধান করিবেন। এই বিপদ কাটাইবার জন্য গান্ধীজিকে বাধ্য হইয়া বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইল; এই সাক্ষাতের ফলে আলিভ্রাতারা প্রকাশ্যে প্রচার করিলেন যে তাঁহাদের উক্তির জন্য তাঁহার বন্ধুরা ব্যথিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। এই ঘটনায় তথাকথিত গোঁড়া অসহযোগীরা গান্ধীজি ও আলিভ্রাতাদের উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহাদের অদম্য উৎসাহের বলে লোকে একথা সহজেই বিস্মৃত হইল। খিলাফৎ কমিটির সেবকগণ দেশের সেবা, গ্রামের কাজ প্রভৃতি কোনো জনহিতকর কর্মে অবতীর্ণ না হইয়া

সরকারের কোপ

কেবলমাত্র খিলাফৎ সংক্রান্ত কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেন, দেশের সমগ্র কল্যাণের দিকে তাঁহারা দৃষ্টি দিলেন না।

গান্ধীজির শান্ত কর্ম-প্রণালীর উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে না পারিয়া আলিভ্রাতারা করাচীর কন্‌ফারেন্সে পুনরায় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনকে কিছুকালের জন্য ব্যর্থ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে আগত (১৯২১ সালের) কংগ্রেসের অধিবেশন-কালের মধ্যে কংগ্রেস-লীগ যদি স্বরাজ লাভের ব্যবস্থা করিতে না পারেন ত' খিলাফৎ কমিটি "ভারতীয় সাধারণতন্ত্র" ঘোষণা করিবেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা বলিলেন যে, ইসলামের শাস্ত্রে আছে যে কোনো মুসলমানের পক্ষে মুসলমানকে বধ করা অন্যায়। সুতরাং কোনো ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে স্বধর্মাবলম্বীদের বধ করিবার জন্য সৈন্য-বিভাগে যোগদান করা পাপ। তাঁহারা মোল্লা মৌলভীদিগকে বলিলেন তাঁহারা যেন এই কথা প্রচার করেন। আলিভ্রাতাদের এই বক্তৃতা সরকার রাজদ্রোহজনক মনে করিলেন ও তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিলেন। করাচীতে তাঁহাদের বিচার হইল; মহম্মদ আলী আদালতে তাঁহার বক্তব্য অতিনিপুণ ভাবে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন যে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা শাস্ত্রসম্মত। বিচারে মহম্মদ আলী, সৈয়কৎ আলি প্রভৃতির দুই বৎসর করিয়া কারাবাসের আদেশ হইল।

করাচীতে বক্তৃতা ও আলিভ্রাতাদের জেল

নিখিল-ইসলাম-আন্দোলন ও মৌলবীদের দ্বারা ধর্মপ্রচারের ফলে ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামী খুবই দেখা দিয়াছিল। খিলাফৎ-আন্দোলন তাহাদের গোঁড়ামীর ইন্ধন হইল। ভারতের সর্বত্র হিন্দু মুসলমানে অতি সামান্য কারণে বিবাদ ও দাঙ্গা করিতেছিল। খিলাফতের গোঁড়ামী ও অসহযোগের ফলে আইন-ভঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি মাদ্রাসের মালাবারে মুসলমানদের মধ্যে বীভৎস ও বিকট আকারে প্রকাশ পাইল।

মালাবারে মোপ্‌লা নামে একজাতি মুসলমান বাস করে; তাহারা অত্যন্ত ধর্মান্ধ ও অশিক্ষিত। ইংরাজ-শাসনকালে ৩৫ বার তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। 'অসহযোগ আন্দোলনের ফলে অচিরে স্বরাজ লাভ হইবে', 'মুসলমানের ধর্ম নষ্ট হইতেছে', 'খিলাফতের সর্বনাশ হইতেছে' ইত্যাদি কথা অত্যন্ত বিকৃত ও অতিরঞ্জিতভাবে অশিক্ষিত মোল্লাদের মুখ হইতে শুনিয়া এই অশিক্ষিত জাতিটি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মোপ্‌লারা গোপনে গোপনে ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল; ১৯২০ সালের ২০শে আগষ্ট সেখানে বিদ্রোহ দেখা দিল। পথঘাট আটকাইয়া, রেলপথ উপড়াইয়া, টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া, তাহারা নিজেদের দেশকে বহির্জগত হইতে পৃথক করিয়া লইয়া 'স্বরাজ' স্থাপন করিল। আলি মুসালি নামে একজন লোককে 'খিলাফৎ রাজা' করিয়া খিলাফতের নিশান উড়াইয়া তাহারা রীতিমত রাজত্ব আরম্ভ করিল। হিন্দু-দের সংখ্যা বেশী থাকিলেও এই মুসলমানী অরাজকতায় যোগদান করিবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ তাহারা খুঁজিয়া পাইল না; 'খিলাফৎ রাজ' স্থাপিত হইলে তাহাদের কি লাভ তাহা তাহারা বুঝিতে না পারিয়া উদাসীন বা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইল দেখিয়া মোপলারা হিন্দুদের উপর ভীষণ উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। অকথিত অত্যাচার চলিতে লাগিল; জোর করিয়া মুসলমান-করাকে এই মূঢ় ধর্মান্ধেরা সৎকর্ম বলিয়া বিবেচনা করিল। হিন্দুদের গৃহ সম্পত্তি লুটতরাজ চলিল। দলে দলে হিন্দুরা দেশত্যাগী হইয়া অরাজক মণ্ডল ত্যাগ করিয়া পলাইতে লাগিল; তাহাদের নিকট হইতে বর্বর অত্যাচার কাহিনী শুনিয়া লোকে স্তব্ধ হইয়া গেল। গবর্ণ-মেণ্টকে এই বিদ্রোহ দমন করিতে রীতিমত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। শান্তি স্থাপিত হইলে বহুসহস্র মোপলার শাস্তি লইল।

মোপ্‌লা বিদ্রোহ

মোপলাদের এই ভীষণ ব্যবহারে হিন্দুসমাজ অত্যন্ত আন্দোলিত হইল;

কিন্তু তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রভৃতি অন্তরের অসংখ্য বাধা থাকায় সজ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা ছিল না। মুসলমানেরা মোপ্‌লাদের অত্যাচারের নিন্দা করিলেন বটে তবে তাহাদের 'ধর্ম-নিষ্ঠার' জন্য প্রশংসা করিলেন। গান্ধীজি বলিলেন মোপলারা ঈশ্বর-ভক্ত। এই ঘটনার পর উভয় সম্প্রদায়ের রাজনীতিক নেতারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতি স্থাপনের অনেক চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই রাজনৈতিক অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য হইয়াছিল, কোনো উচ্চ ধর্মের আদর্শে এমন কি স্বদেশকে ভালবাসিবার আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয় নাই। মালাবারের ঘটনার পর দক্ষিণ-ভারতে হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের মনোমালিন্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইল। হিন্দুরা মোপলা-ব্যাপারের জন্য 'খিলাফৎ আন্দোলনকে' দায়ী করিল। এতদ্ব্যতীত পঞ্জাব ও বঙ্গদেশে মহরমের সময়ে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হইল; মুলতানে দাঙ্গা খুবই ভীষণ হইয়াছিল। মোটকথা খিলাফৎকে সমর্থন করিয়া হিন্দুরা মুসলমানদের পক্ষ লইয়া যে সংগ্রাম করিতেছিল, তাহাতে মুসলমান শক্তিশালী হইল, কিন্তু হিন্দুদের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে কণামাত্র সংহত করিতে পারিল না। মুসলমানেরাও দেখিল আধ্যাত্মিক অসহযোগ আন্দোলনের ফলে তুর্কী বা খিলাফতের সমস্যা সমাধান হইল না; বরং তাহারা দেখিল যে ইংরাজই তুর্কীর প্রতি যাহাতে সদ্‌বিচার হয় তজ্জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই সব সামাজিক ও রাজনীতিক সমস্যা হেতু ভারতের হিন্দু-মুসলমানের রাষ্ট্রীয় বন্ধন সর্বত্র শিথিল হইতে লাগিল। লালা লাজপত রায় এই খিলাফৎ আন্দোলন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা প্রনিধানযোগ্য:—"রাজনীতিক ভিত্তির উপর ভারতের খিলাফৎ-আন্দোলনটাকে দাঁড় করানো হয় নাই, দাঁড় করানো হইয়াছিল ধর্মের ভিত্তির উপর। ইহা ভারতের পক্ষে দুর্ভাগ্যেরই কারণ হইয়াছে।

হিন্দু মুসলমান মনোমালিন্য

লাজপতরায়ের খিলাফৎ সম্বন্ধীয় মতামত

রাজনীতির দিক হইতে ইহাকে সমর্থন করিবার যুক্তির অভাব ছিল না। যে-আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক, মহাত্মা গান্ধীর মতো ব্যক্তিও যে সেই আন্দোলনের ভিতর ধর্মকে টানিয়া আনিলেন, ইহা আরও দুঃখের বিষয়। অসহযোগ কর্মতালিকায় আর আর কতক-গুলি বিষয়কে ধর্মের ছাপ দিবার যে-চেষ্টা, তাহাও ভয়ঙ্কর ভুল। ইহার প্রত্যক্ষ ফল হইয়াছে এই যে, ইহাতে ভারতের এক হইবার পথেই অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছে, সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উদ্দেশ্য লইয়া যে-অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার ফলে দেশব্যাপী অনৈক্যেরই আবহাওয়া সৃষ্ট হইয়াছে।" (স্বরাজ, ১৫ই অগ্রঃ ১৩৩১)।

তুর্কীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন

এমন সময়ে তুর্কীর ভাগ্য ফিরিল। গ্রীকদের সহিত লড়াইএ তুর্কীর সেনাপতি বীরকেশরী কামাল পাশা জয়ী হইলেন। এই ঘটনায় য়ুরোপে তুর্কী তাহার হৃতসম্মান পুনর্প্রাপ্ত হইল। লসনের সন্ধিতে তুর্কীর স্বার্থ ও সম্মান রক্ষা করিতে য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ বাধ্য হইলেন। ভারতের মুসলমান-সমাজ তুর্কীর জয়ে আনন্দে উৎসব করিতে লাগিল। কামাল পাশা ভারতীয় মুসলমানদের পূজ্য হইলেন—এমন মুসলমানের বাড়ী ছিল না, যেখানে এই বীর-শ্রেষ্ঠের ছবি না থাকিত। মুসলমান-সমাজ খিলাফৎ-আন্দোলনের ফলে কেমন এক হইয়া কার্য্য করিল ও শক্তিশালী হইয়া উঠিল। হিন্দুসমাজ শক্তিসঞ্চয় করিতে সহজেই অপারক; তাহার জাতি-ভেদ প্রভৃতি অসংখ্য বাধা মানুষকে মানুষ হইতে পৃথক করিতে পারে—এক করিতে পারে না। আর্য্য-সমাজের নেতা শ্রীযুক্ত

'শুদ্ধি' আন্দোলন ও মুসলমান সমাজের আপত্তি

শ্রদ্ধানন্দ স্বামী এই সময়ে মুসলমান মালকানা-রাজপুতদিগকে 'শুদ্ধি' দ্বারা আর্য্যসমাজভুক্ত করিয়া লইলেন। পণ্ডিত মালব্যজীও 'হিন্দু-সংগঠন'

আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এই দুই ঘটনায় মুসলমান-সমাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। মুসলমানেরা হিন্দুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিতে পারে, কিন্তু হিন্দু যদি মুসলমানকে হিন্দু করিয়া লয়, অথবা হিন্দু যদি আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য 'সংগঠন' করে তবে মুসলমানেরা বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং বলেন হিন্দু-মুসলমান প্রীতি আর থাকিতে পারে না।

হিন্দু-মুসলমান প্রীতিরক্ষার জন্য এবং স্বরাজ্যদলের রাজনৈতিক প্রতি-পত্তি স্থাপনের জন্য শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন মুসলমানদের সহিত ১৯২৩ সালে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ইহা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে খ্যাত। বাংলা-প্রাদেশিক সমিতিতে উহা পাশ হয় এবং নির্বাচনে ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া একটা মীমাংসা হয়। তখন সকলে মনে করিলেন যে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একটা চুক্তিপত্র খাড়া হইলে দেশে আপামর সাধা-রণের মধ্যে মনের মিল হইবে। প্যাক্টের ব্যবস্থায় হিন্দুরা সুখী হইলেন না এবং মুসলমানেরাও ক্রমশই তাঁহাদের চাহিদা বাড়াইতে লাগিলেন; ক্রমে রাজনৈতিক বন্ধন রক্ষার জন্য চাহিদা জুলুমে পরিণত হইতেছে। প্রত্যেক বিষয়ে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন, সাম্প্রাদায়িক ব্যয়ের জন্য আন্দোলন চলিতেছে, এমন কি স্কুলেও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে হিন্দু মুসলমান গ্রন্থকারের মধ্যে ভেদ আনীত হইয়াছে।

বেঙ্গল-প্যাক্ট

১৯২০ সালে কামল পাশা ও নব্যতুরস্কদল এশিয়ার আঙ্গোরাতে তুর্কীরাজ্যের রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপন করিলেন। বিংশ শতাব্দীতে ধর্ম ও রাজনীতি একত্র চলিতে পারে না দেখিয়া নব্য-তুর্কীরা খলিফের রাজসম্মান হরণ করিল। নূতন রাজ্য সুব্যবস্থিত হইলে তাঁহারা খলিফের পদই উঠাইয়া দিলেন ও খলিফকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কামল ও নব্য-তুর্কী গণতন্ত্রের উপর কোনো যথেচ্ছাচারী রাজাকে রাখিতে নারাজ। খলিফের [illegible] উঠিয়া গেল; মুসলমান-জগৎ এই ব্যাপারে

নব্যতুর্কীর খলিফ-বিতাড়ন

আশ্চর্য্য হইল। অন্যান্য মুসলমানেরা তুর্কীর খলিফের ভবিষ্যত সম্বন্ধে খুব বেশী সচেতন নয়; কারণ তাহা হইলে খলিফকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য তাহারা একটা বিপ্লব করিত। ভারতের মুসলমানেরা কামল পাশার এই ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল। যে-খলিফত্বের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য তাহারা এমন আন্দোলন করিল, তুর্কীর রাজ্য যাহাতে ঠিক থাকে, তাহার জন্য এত সভা-সমিতি করিল সেই তুর্কীর এই ব্যবহার! হায়দ্রাবাদের নিজাম খলিফের এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষার জন্য বৎসরে কয়েক লক্ষ করিয়া টাকা বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন। দরিদ্র ভারতের—প্রধানত হিন্দুদের (কারণ হায়দ্রাবাদের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু) অর্থ খলিফ সুইটজারল্যাণ্ডের হোটেলে ব্যয় করিতেছেন।

এদিকে ভারতের সর্বত্র হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বাড়িতে লাগিল। ১৯২৩ সালের শেষের কয়েকমাসে কয়েকটি ভীষণ দাঙ্গা হইল। দিল্লীতে কতকগুলি মুসলমান হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন করে; অগ্নিসংযোগে বহু সহস্র টাকার সম্পত্তি নষ্ট করে—এমন কি নৃশংসভাবে নরহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই দিল্লীতে হিন্দুমুসলমান পরস্পরের হাত হইতে জলপান করিয়াছিল! এই ঘটনার পর গান্ধীজি অক্টোবর মাসে সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য স্বয়ং ২১ দিনের জন্য অনশনব্রত গ্রহণ করিলেন। দেশের মধ্যে এই লইয়া খুবই আন্দোলন, আলোচনা হইল; হিন্দু-মুসলমান প্রীতি স্থাপনের জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু ইহার মধ্যেই জব্বলপুরে, এলাহাবাদে ও হায়দ্রা-বাদের গুলবার্গে সাংঘাতিকরূপ দাঙ্গা বাধিল। গান্ধীজির অনশনব্রত সাঙ্গ হইবার পরেই উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের কোহাট নগরীতে হিন্দু-মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা হইল। এক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান

হিন্দু মুসলমান বিরোধ ও গান্ধীজির অনশন

হিন্দুকে প্রথম অপরাধী বলিয়া নির্ণয় করে। প্রথম অপরাধী যেই হউক, মুসলমানেরা সেখানে যে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে তাহার তুলনা হয় না; হিন্দুদের বহু লক্ষ টাকা নষ্ট হইয়াছে; এবং হিন্দুরা প্রাণভয়ে কোহাট ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়া আসিয়াছে। কোহাটে সৈন্য যথেষ্ট ছিল; অথচ তাহারা দাঙ্গাকারীদিগকে কেন বাধা দেয় নাই—তাহা লোকে ভাবিয়া বুঝিতে পারিতেছে না। কোহাটের চতুপার্শ্বস্থ প্রাচীরের কয়েকটি স্থান ভেদ করিয়া পার্বত্য মুসলমানেরা নগর লুট করিয়াছে, অথচ নগরের বাহিরে অশ্বারোহী সৈন্য ছিল বলিয়া প্রকাশ। উভয় পক্ষের মিটমাটের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু মুসলমানেরা তাহাদের চাহিদা একটুও কমাইবে না; এবং হিন্দুরাই যেন প্রধান অপরাধী, এমনিভাবেই মিটমাট-সভায় তাহাদের উপর জুলুম হইয়াছে। বড়লাট বাহাদুর এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি বসাইয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সেই তদন্তের ফল ও সরকারী অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু দেশের লোক সরকারী প্রতিবেদন পাঠে মোটেই সুখী হইতে পারে নাই এবং সরকারী কর্মচারীরা যে নিশ্চল হইয়া এত বড় একটা অনিষ্ট, হত্যা লুণ্ঠনাদি ঘটিতে দিলেন তাহার জন্য অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

কোহাটের দাঙ্গা

দেশের হিন্দু-মুসলমান নেতারা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। নভেম্বর মাসে ১১ই তারিখ সমগ্রভারতে বিশেষ প্রার্থনার সময় স্থির করিয়া ভারতের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে প্রীতি ও প্রেম রক্ষিত হয় তজ্জন্য সভা হইল, ঐ দিন Unity Day নামে খ্যাত। দেশের শিক্ষিত লোকের একান্ত ইচ্ছা যে এই মিলন স্থায়ী ও যথার্থ হয়। ১৯২৪ সালের বেলগাঁএর কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে এবিষয় লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে এরূপ বিরোধের অবসান হইবে। নাগপুরে মহামতি আবদুল কালাম আজাদের চেষ্টায় হিন্দু-

মিলন চেষ্টা

মুসলমানের মধ্যে প্রীতি ফিরিয়াছে। সেখানে মুসলমানেরা যে-প্রকার উদারতা দেখাইয়াছেন তাহা সমগ্র ভারতের মুসলমানের দৃষ্টান্ত স্থল। ভারতবর্ষ হিন্দুমুসলমানের উভয়ের দেশ একথা ভুলিলে চলিবে না; এই বোধ ক্রমেই মুসলমানদের মধ্যে হইতেছে এবং তাহারা যে ভারতবাসী এই কথা সর্বদা জাগ্রত হইবে এই আশাও সকলে করিতেছে।

"With us the idea of Fatherland is Supreme. It lies at the bottom of all our dicisions ; it inspires all our efforts. Nationalism is what has saved Turkey. Nationalism is what has enabled us to carry out, down to its minimum details, our National Pact."—Ismet Pasha. (Muslim Herald 24 Jan. 1925.)

চতুর্থ খণ্ড

প্রবাসী ভারতবাসী

প্রথম পর্ব

ভারতীয় 'কুলী'র ইতিহাস

ভূমিকা

ভারতের বাহিরে প্রবাসী ভারতবাসীদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক-দের ব্যবহার জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে নূতন সমস্যা ও নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে। ভারতবাসীর আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হইবার পর হইতে সে ভারতের বাহিরে স্বদেশবাসীকে লাঞ্ছিত ও বিপদগ্রস্ত দেখিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছে না। প্রবাসী ভারতবাসীদের আত্মসম্মান বজায় রাখিবার সংগ্রামের সফলতায় ভারতবাসী যোগদান করিয়াছে বলিয়া আমরা এই স্থানে প্রবাসী ভারতবাসীদের ইতিহাস বর্ণিব।

ভারতের বাহিরে ভারতবাসীর উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাস কলঙ্কের ইতিহাস। গত একশত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর নানাস্থানে বিশেষভাবে ইংরাজের উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের নানা অংশে ভারতবাসীরা কুলীগিরি করিবার জন্য গিয়াছে। বহির্ভারতে ভারতবাসীর সমস্যা শ্রমসমস্যা। ভারতবাসীর সহিত য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদের পরিচয় 'শ্রম' (Labour) এর

ভিতর দিয়া। ১৮০০ খৃঃ অব্দ হইতে হিন্দু ও আদিম ভারতবাসীরা বঙ্গোপসাগর পার হইয়া মালয় প্রণালীর উপনিবেশে (Straits Settlement) যাইতে সুরু করে। পেনাংএর চিনি, মশলা ও নারিকেলের বাগিচায় বহু বৎসর ধরিয়া কুলীচালান চলে। কিন্তু তখনও কুলীচালান সম্বন্ধে কোনো প্রকার বিধি ব্যবস্থা প্রণীত হয় নাই। ১৮৩০ সালে সর্বপ্রথম সরকারী কাগজপত্রে কুলীচালানের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রথম কুলীচালান

জোসেফ আরগাঁদ (Joseph Argand) নামক জনৈক ফরাশী বণিক ১৫০ জন কারীগর, আফ্রিকার নিকটস্থ বুরবোঁদ্বীপে চালান দেন। এই সময়ে য়ুরোপে ও আমেরিকায় দাসত্ব-প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল। ১৮৩৪ সালে ইংরাজ উপনিবেশে দাসত্ব-প্রথা উঠিয়া গেল; ইংরাজ-রাজত্বের সীমানার মধ্যে কোনো দাস প্রবেশলাভ করিতে পারিলেই সে মুক্তি পাইত। ফলে ফরাশী, আমেরিকান প্রভৃতি জাতির বাগিচা-

আফ্রিকান্ দাস প্রথা বন্ধ ১৮৩৪ সাল

ওয়ালাদের হাত হইতে দাস-শ্রমিক হাতছাড়া হইতে লাগিল। ইহাতে কিন্তু ইংরাজ বণিক ও বাগিচাওয়ালাদের তেমন কোনো অসুবিধা হইল না। মরিশাস দ্বীপের চিনির বাগিচাওয়ালারা ভারতবর্ষ হইতে কুলীসংগ্রহে মন দিল; ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৭ সালের মধ্যে প্রায় ৭,০০০ শ্রমিক কলিকাতা হইতে চালান হয়। ভারত সরকার এই কুলীচালান বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিতে গোড়া হইতেই মনোযোগী হইয়াছিলেন। শ্রমিকদের মঙ্গল ও সুবিধা-অসুবিধা তদারক করিবার জন্য এক বৈঠক (কমিশন) এই সময়ে বসে। এই কমিশন বলেন যে

ভারত হইতে কুলী-চালান

নিরক্ষর ও মুর্খ লোকদের যাহাতে ঠকাইয়া বা ভুলাইয়া কেহ বিদেশে না লইয়া যাইতে পারে সেইজন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে তাহারা বুঝিয়া-সুঝিয়া

চুক্তিপত্রে সহি করিবে; এ ছাড়া যে-জাহাজে তাহারা বিদেশে যাইবে সেগুলিতে উপযুক্ত স্থান ও খাদ্যের সুবন্দবস্ত করিতে হইবে। এই সব চুক্তি পাঁচ বৎসরের জন্য হইত এবং প্রত্যেক চুক্তিপত্রের কপি সরকারী দপ্তরখানায় প্রেরিত হইত। ইহাই হইতেছে ১৮৩৭ সালের ৫ম আইন। নিগ্রো দাসপ্রথা বন্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারত হইতে চুক্তিবদ্ধ কুলীচালানের ব্যবস্থা ও বন্দবস্ত হইল।

এই আইনানুসারে মরিশাস, দক্ষিণ আমেরিকাস্থিত বৃটীশ গিয়েনা ও অষ্ট্রেলিয়ায় কুলীচালান সিদ্ধ হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় মাত্র ৮৯ জন লোক যায়, সেখানে সেই প্রথম ও শেষ কুলীচালান। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে একদল মানব-প্রেমিক এদেশের কুলীচালান-প্রথাকে দাসপ্রথার নামান্তর মাত্র বলিয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করেন। ইহার ফলে ১৮৪০ সালে এক কমিশন বসে; তাহার প্রতিবেদনে প্রকাশ পায় যে কুলীদের অধিকাংশ স্থলে জোর-জুলুম করিয়া বা ভুলাইয়া দেশান্তরিত করা হয়, তাহাদের বেতনাদি নানাভাবে বিদেশে লুণ্ঠিত হয় এবং তাহাদের প্রতি যে ব্যবহার হয় তাহা পাশবিক। ফলে ১৮৪২ সালে মরিশাস ব্যতীত অন্যত্র কুলীচালান বন্ধ হয়। দুই বৎসর পরে ১৮৪৪ সালে ২১ আইনানুসারে খুবই কড়াকড়ির মধ্যে পুনরায় জামাইকা, বৃটীশ গিয়েনা, ট্রিনিডাডের বাগিচাতে কুলীচালান সুরু হইল। ১৮৪৭ সালে সিংহল দ্বীপে কুলী আমদানী সম্বন্ধে যেসব বাধা ছিল তাহা রদ হইয়া যায়।

১৮৪০ সালের কুলী-কমিশন

এদিকে ইংরাজ-সাম্রাজ্য ব্যতীত আর সর্বত্রই দাসপ্রথা এযাবৎ-কাল চলিয়া আসিতেছিল; ১৮৪৯ সালে ফরাশী-রাজ্যে দাসপ্রথা উঠিয়া যাওয়াতে ফরাশী বাগিচাওয়ালাদের মজুর লইয়া বিপদে পড়িতে হইল; সুতরাং তাঁহারাও ভারতবর্ষকে কুলী-সরবরাহের ডিপো ভাবিয়া তাঁহাদের বন্দর হইতে কুলীচালান আরম্ভ করিলেন। ভারতে ফরাশী

রাজ্য ও ইংরাজ-রাজ্যের মধ্যে প্রাকৃতিক বাধা সামান্যই; সুতরাং ইংরাজ-অধিকৃত ভারত হইতে ফরাশীরা প্রচুর পরিমাণে কুলী সংগ্রহ করিতে লাগিল; এইরূপ কুলী-সংগ্রহকে ১৮৫২ সালে ইংরাজ অবৈধ বলিয়া জারী করিলেন। ১৮৫৮ সালে পূর্বোক্ত কয়েকটি স্থান ব্যতীত সেণ্ট লুসিয়া, ও ১৮৬০ সালে সেণ্ট ভিনসেণ্ট, নেটাল, সেণ্ট কিট্স্ কুলীচালানের জন্ত খুলিয়া দেওয়া হইল। ১৮৬০ সালে ইংরাজ-ফরাশীদের মধ্যে একটা আপোষ হইয়া গেল; তাহাতে স্থির হইল যে কতকগুলি ফরাশী উপনিবেশ হইতে কুলীচালান বৈধ ও সে বিষয়ে ইংরাজ-সরকার ফরাশীদের সহায়তা করিবেন।

ফরাশী উপনিবেশের জন্ত ভারতীয় কুলী

১৮৬৪ সালে কুলীচালান সম্বন্ধে আইন ও ব্যবস্থাগুলিকে একবার আগাগোড়া ঝালাইয়া লওয়া হয়। ১৮৬৯ ও ১৮৭০ সালে প্রবাসী কুলীদের বাসগৃহ ও বস্তির উন্নতির জন্য ও কুলীজাহাজে মড়ক নিবারণের জন্ত আইন প্রণয়ন হয়। ১৮৬৪ সাল হইতে সরকারী সাহায্যে পশ্চিম ইণ্ডিস দ্বীপপুঞ্জে রীতিমতভাবে কুলীচালান হইতে থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান য়ুরোপীয় উপনিবেশসমূহে শ্বেতাঙ্গ কুলীদের কাজ করা সম্ভব নয়; তা ছাড়া যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ দাস বা কুলী সহজে ও সুলভে পাওয়া যায় সেখানে শ্বেতাঙ্গ-দের কাজ করা সম্মানজনক নয়, আরামদায়কও নয়। সেইজন্ত এযাবৎ-কাল যতদিন প্রয়োজন ছিল ততদিন ভারতবর্ষ হইতে নিয়মিতভাবে বিদেশে কুলীচালান হইয়াছে। ভারতের বর্দ্ধিষ্ণু শিল্প ও বাণিজ্যের জন্ত শ্রমিকের প্রয়োজন আছে কি না, এ প্রশ্নের দিকে তাকাইয়া বিদেশে কুলীচালান কখনো কমবেশী হয় নাই। বিদেশে কোথায় কিরূপ প্রয়োজন আছে না আছে, তাহার দ্বারা ভারতের শ্রমিকদের আসাবাওয়া নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

১৮৬৯ সালের কুলী আইন

১৮৬৯ সালে গ্রেনাডায় (Greneda) ও ১৮৭২ সালে দক্ষিণ আমেরিকায়

সুরিনাম (Surinam)এ কুলীচালান আরম্ভ হয়। এদিকে ১৮৬৮ সালে মালয় Straits Settlement ভারত-সরকারের তত্ত্বাবধান হইতে পৃথক হইয়া যায় ; ও সেই হইতে একমাত্র মাদ্রাজের নেগাপাট্টাম বন্দর ছাড়া আর সকল বন্দর হইতে কুলীচালান বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু ভারত হইতে কুলীচালান বন্ধ হওয়ার ফলে Straits Settlementএর চাষবাসের ভীষণ ক্ষতি হইতে লাগিল ; তখন ভারত-সরকারকে (১৮৭২) পুনরায় পূর্বোক্ত Emigration Actএর বাঁধাবাঁধি দূর করিয়া একপ্রকার অবাধভাবে কুলীচালান মঞ্জুর করিতে হইল।

অবাধ কুলীচালান

১৮৭০ সালে ভারত-সরকারের কাণে বৃটীশ গিয়েনার প্রবাসী কুলীদের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার কাহিনীর কথা পৌঁছে। সরকার এক তদন্ত কমিশন বা বৈঠক বসাইলেন ; ফলে প্রবাসী ভারতবাসীদের রক্ষার জন্য নানা আইন প্রণীত হয় ও গিয়েনা ও ট্রিনিডাডে কুলীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য সুব্যবস্থা হয়। এইরূপ অত্যাচার-কাহিনী চারিদিক হইতে আসিতে লাগিল ; মরিশাস ও নেটাল হইতে অভিযোগ আসিলে পুনরায় বৈঠক বসিল ও ১৮৭২ সালে তাঁহাদের যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল তাহাতে অনেক অধিকারের প্রতিকারোপায় নির্দ্ধারিত হইল।

১৮৮২ সালে এমিগ্রেশন অ্যাক্টের পুনর্সংস্কারের প্রয়োজন হইল। ভারতবর্ষ হইতে কুলীসংগ্রহের উপায় মোটেই প্রশংসনীয় ছিল না। অনেক সময়ে আড়কাটি বা কুলীসংগ্রাহক ছেলেমেয়েকে চুরি করিয়া বা ভুলাইয়া কুলী-ডিপোতে পাঠাইয়া দিত। এই ধরণের কতকগুলি ঘটনা ভারত সরকারের নিকট পৌঁছায়। সরকার বাহাদুর দুইজন সরকারী কর্মচারীর উপর উত্তর-ভারত ও বঙ্গদেশে কুলীসংগ্রহ-রীতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার

১৮৮২ সালে কুলী-কমিশন

জন্য নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের প্রতিবেদন উপর নির্ভর করিয়া সরকার হইতে ১৮৮৩ সালে নূতন আইন প্রণীত হয়। সেই আইনে কোন্ কোন্ দেশে কুলীচালান দেওয়া যাইতে পারে তাহার তালিকা প্রস্তুত হইল; কিন্তু বড়লাট বাহাদুরের উপর এই তালিকাতে নাম যোগ দিবার ও বাদ দিবার অধিকার অর্পিত থাকিল। কোনো দেশ হইতে কুলীদের মধ্যে মড়ক বা অতিরিক্ত মৃত্যুহারের রিপোর্ট আসিলে অথবা কুলীদিগকে রক্ষা করার জন্য সেইসব দেশের সরকার যদি যথেষ্ট যত্ন না করেন জানিতে পারা যায়, অথবা ভারতবর্ষ হইতে যেচুক্তিতে তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া হয় সেই চুক্তি পূরণ হইতেছে না, তাহা হইলেসেদেশে কুলীচালান বন্ধ করিয়া দিবার ক্ষমতা বড়লাট বাহাদুরের হাতে রহিল। এইসব আইন প্রণীত হইবার কারণ যে এই সকল অবিচার প্রবাসী ভারতবাসীদের উপর হইত। কোনো প্রকার জুলুম না হইলে ভারত-সরকার আপনা হইতেই এইসব আইন পাশ করিতেন না।

কুলীদের দুরবস্থা

ভারতবর্ষ হইতে কিরূপে কুলীসংগ্রহ ও চালান দেওয়া হইত তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। একটি বা কয়েকটি উপনিবেশের প্লানটার বা বাগিচাওয়ালারা মিলিয়া ভারতবর্ষে মাহিনা করিয়া একজন প্রধান এজেণ্ট রাখিতেন। ভারত-সরকার ইহাদিগকে সাহায্য করিতেন। এই এজেণ্টদের অধীনে অনেকগুলি সব্‌এজেণ্ট থাকিত; আবার প্রত্যেক সব্‌এজেণ্টের তত্ত্বাবধানে কতকগুলি আড়কাটি থাকিত। এই আড়কাটিরাই গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া কুলীসংগ্রহ করিত; তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকও থাকিত। এই সব কর্মচারীরা বাগিচাওয়ালা বা প্লানটারদের বেতনভোগী। এছাড়া সরকারী তরফ হইতে প্রত্যেক প্রদেশে একজন করিয়া কর্মচারী কুলীদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকিতেন। তিনিই আড়কাটিদের লাইসেন্স দিতেন; এই লাইসেন্স ছাড়া কেহ কুলীসংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলে দণ্ডনীয়

কুলীসংগ্রহ বা আড়কাটি

হইত। উপনিবেশ হইতে এজেণ্টদের হাত দিয়া সব্‌এজেণ্টগণ প্রতি পুরুষ-কুলীর জন্য ২৫৲ ও স্ত্রী-কুলীর জন্য ৩৫৲ করিয়া পাইতেন। এই টাকা হইতে আড়কাটিগণ ভাগ পাইত। অনেক সময়ে অশিক্ষিত লোক ধূর্ত আড়কাটিদের হাতে পড়িয়া দেশান্তরিত হইয়াছে। ফিজি, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, তাহাদের ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে কতদূরে তাহা তাহারা জানে না; পয়সার লোভে চুক্তির মধ্যে আবদ্ধ হইত। এইরূপ অসহায় নরনারীর অনেক দুঃখকাহিনী এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। সেইজন্য আড়কাটি নামে লোকের এককালীন ভয় ও ঘৃণার উদয় হয়। গ্রাম হইতে কুলী সংগৃহীত হইয়া প্রথমে কোনো বড় সহরের সব্‌ডিপোতে আনীত হইত; সেখান হইতে প্রধান ডিপো যেমন কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী ইত্যাদি স্থানে তাহাদিগকে আনা হইত। এই ডিপোগুলি সরকারী-পক্ষের পর্য্যবেক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে থাকিত। তাঁহারা দেখিতেন যে যাহারা আসিয়াছে তাহারা সর্ত বুঝিয়াছে, যে জাহাজ তাহাদিগকে উপনিবেশে লইয়া যাইবে সেগুলিতে কত লোক ধরিবে ও কুলীদের যথাযথ বন্দোবস্ত আছে কিনা, জাহাজে চড়িবার পূর্বে ডাক্তারী পরীক্ষা হইয়াছে কিনা, ইত্যাদি বিষয় তদারক করিতেন। কুলীরা নির্দিষ্ট উপনিবেশ সমূহে পৌছিলে ইমিগ্রেশন এজেণ্ট-জেনারেল তাহাদের তত্ত্ব লইলেন। ইনি উপনিবেশের কর্মচারী; ভারতের কুলীরক্ষক যাহা করেন, ইনিও তাহাই করেন। বাগিচাতে কুলীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার হয় তাহাও তিনি পরিদর্শন করেন। কোনো উপনিবেশের বাগানে কুলীদের মৃত্যুসংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইলে অথবা তাহাদের যথেষ্ট যত্ন না লওয়া হইলে ভারত-সরকার সেখানে কুলী-চালান বন্ধ করিয়া দিতেন। আফ্রিকার নাটাল-প্রদেশে কুলীদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ

কুলীসংগ্রহে সরকারী ব্যবস্থা

দুর্ব্যবহারের ফলে কুলী-চালান বন্ধ

উপস্থিত হইলে ভারত সরকার ১৯১১ সাল হইতে সেখানে কুলী-চালান-বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ফরাশী উপনিবেশ Reunion, Martinique, Guadeloupe প্রভৃতি স্থানে কুলীদের প্রতি কোনো প্রকার সদবিচার ও সদব্যবহার না হওয়ায় সরকার সেখানে লোক-চালান বন্ধ করিয়া দেন।

দ্বিতীয় পর্ব

আফ্রিকায় ভারতবাসী

স্বদেশী আন্দোলনের সুরু হইতে ভারতবাসীরা আত্মসম্মান সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠে। এই বোধ ভারতের বাহিরে ও ভিতরে সর্বত্রই দেখা দিল। চুক্তিবদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে কুলীচালান দেওয়া ও সেখানে তাহাদিগকে পশুর মত ব্যবহার করা ত প্রায় একশত বৎসর হইতেই চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু এখন ভারতবাসীর মনে হইতে লাগিল যে ভারতবাসীদের প্রতি য়ুরোপীয় জাতিদের ব্যবহার অত্যন্ত অপমানকর। এই জাতীয় উদ্বোধনের সাড়া প্রবাসী ভারতবাসীদের মধ্যে দেখা দিল ও সেখানে অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে লোকে প্রতিবাদ করিতে সুরু করিল। এইসব অন্যায়ের কেন্দ্র হইয়াছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। বহুদিন সেখান হইতে আবেদন, অভিযোগ ভারতে আসিতেছিল।

আত্মসম্মান জাগ্রত

দক্ষিণ আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানের শ্বেতাঙ্গদের ইচ্ছা ভারতবর্ষ হইতে কুলী চুক্তিবদ্ধ হইয়া যায় এবং সেই অবস্থায়ই থাকে; কিন্তু অনেক কুলী, কর্মচারী চুক্তিশেষে ঐ দেশেই জমিজমা কিনিয়া ঘর-সংসার পাতিয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসায় বা মজুরী করিতেছে। ইহা আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের অসহ্য। তাঁহারা চান ভারতবাসীরা কুলীর কাজই করিবে, চুক্তিশেষে পুনরায় চুক্তিবদ্ধ হইবে, নতুবা ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবে। সুতরাং যাহারা ঐদেশে থাকিত ও স্বাধীন জীবিকা অর্জন করিত, তাহাদের উপর ইঁহাদের আক্রোশ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বার্থের বিরোধ

ক্রমে উহা বর্ণগত বা জাতিগত ঈর্ষায় পরিণত হইল। নেটালে চুক্তি ছাড়া ভারতবাসীর উপর প্রথমে মাথাপিছু ২১ পাউণ্ড বা ৩১৫৲ কর করিবার প্রস্তাব হয়; পরে ১৮৯৫ সালে তিন পাউণ্ড বা ৪৫৲ টাকা জিজিয়া কর ধার্য্য হইয়াছিল। ইহাতে স্বাধীনজীবি লোকদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিল না। নেটাল সরকার ইহাতে সুখী না হইয়া ১৮৯৭ সালে আইন করিলেন যে ইংরাজী-জানা লোক ছাড়া সেদেশে অপরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। লোকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আফ্রিকায় পৌঁছাইত ও স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিতে পারিত; কিন্তু ১৯০৩ সালে নেটাল-বন্দরে ৬৭৮৩ জন লোককে রোখা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট কড়াকড়ি ছিল। নেটালে, ট্রান্সভালে ও বহু স্থলে ভারতবাসীদিগকে পৃথক্ গাড়ীতে চড়িতে হইত, দোকানী বা ব্যবসায়ীদিগের প্রতিবৎসর ব্যবসায়ের অনুমতি-পত্র লইতে হইত। এবং সেই সময়ে ভারতবাসীরা যাহাতে এই পত্র (license) না পায় বা পাইলেও যাহাতে ব্যবসায়ের কেন্দ্রে দোকান-পাট না খুলিতে পারে, তাহার জন্য যথাবিধি চেষ্টা চলিত; প্রত্যেক ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের সুবিধা সুযোগ দেওয়া হইত। প্রকাণ্ড প্রতিযোগিতায় য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা হিন্দু-মুসলমান বণিকদের নিকট পারিত না বলিয়া সকল প্রকার ছিদ্রপথ দিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার, ম্যুন্সিপালটিসমূহ, শ্বেতাঙ্গসমাজ (ইংরাজ ও বুয়র) ভারতবাসীদের সর্বনাশ করিতে লাগিলেন। ভারতীয় কুলীরা শ্বেতাঙ্গ বাগিচাওয়ালা ও জমিদারদের ক্ষেতে খামারে কাজ করিয়া তাহাদিগকে ধনশালী করিয়াছিল; পরে চুক্তিমুক্ত হইয়া তাহারা জমিজমা করিয়া বা ব্যবসায় করিয়া দুই পয়সা করিতেছিল। কিন্তু এ-প্রকার উন্নতি তাহাদের সহ্য হইল না। পূর্বে তাহারা কতকগুলি অধিকার পাইয়াছিল। ক্রমে সেগুলি বন্ধ করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। ১৮৯৬ সালে ভারত-

ভারতবাসী ও শ্বেতাঙ্গে বিরোধ

বাসীদের নেটাল-পার্লামেন্টে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া পাঠাইবার ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইল—তাহাদিগকে বলা হইল যে য়ুরোপীয় সদস্য তাহাদের ট্রাষ্টীর কার্য্য করিবেন। ইহাতেও খুসী না হইয়া শ্বেতাঙ্গেরা ভারতবাসীদের নিকট হইতে ম্যুন্সিপাল ভোট কাড়িয়া লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল; কিন্তু সাম্রাজ্য সরকার এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই বলিয়াই তাহারা সে অধিকারে বঞ্চিত হয় নাই। ১৮৯৯ সালের পূর্বে শ্বেতাঙ্গ শিশু ও ভারতীয় শিশুরা একত্র একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত; এ বৎসরে তাহাদিগকে সেখান হইতে বাহির করিয়া দিয়া ঔপনিবেশিকদের জন্য ইংরাজী কায়দায় বড় রকমের একটি স্কুল তৈয়ারী করা হইল। সাধারণদের জন্য Coloured School গঠিত হইল।

নেটালে অধিকার লোপ

এই সব লইয়া নেটালে যখন আন্দোলন চলিতেছে, তখন বুয়রদের রাজ্য ট্রান্সভাল হইতে ভারতবাসীদের তাড়াইবার জন্য চেষ্টা সুরু হইল। ১৮৮১ সালে নেটাল হইতে চুক্তিমুক্ত অনেক ভারতবাসী ট্রান্সভালে গিয়া ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করে। ১৮৯৯ সালে তাহাদের উপর হুকুম হইল যে তাহারা যেন সহর ত্যাগ করিয়া সরকারের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া বাস করে! অনেকে এই অপমানকর আইন না মানিয়া জেলে গিয়াছিল। ঐ বৎসর ইংরাজদের সহিত বুয়র যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

ট্রান্সভালেও অবিচার

১৯০০ সালে বুয়র যুদ্ধ শেষ হইল। ট্রান্সভালে বৃটীশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু ভারতবাসীদের অবস্থার উন্নতি হইল না। তাহাদের উপর বুয়রদের উৎপীড়ন বাড়িয়া চলিল। ট্রান্সভালে ভারতীয়গণের অবাধ প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। যাঁহারা যুদ্ধের পূর্বে ট্রান্সভালে অবস্থান করিতেন, তাঁহাদিগকে ছাড়পত্র ব্যতীত ট্রান্সভালে পুনরায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যবসায়িগণ পর্য্যন্ত আইনের কড়াকড়িতে বিপন্ন

হইয়া উঠিলেন। যাহারা ৯৯ বৎসরের দলিল পাট্টা করিয়া যুদ্ধের পূর্বে বসতি আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাদের জমি কাড়িয়া লওয়া হইতে লাগিল। যুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় ব্যবসায়িগণ যে-কোন স্থানে কারবার চালাইতে পারিতেন, নূতন শাসনে সে-পথ বন্ধ হইল। এমন কি ফেরীওয়ালারা যাহাতে নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে স্বেচ্ছানুযায়ী যে-কোন রাজপথে পরিভ্রমণ করিতে না পারে তজ্জন্য আইন হইল। এ ছাড়া পূর্বেও তাহাদিগকে নাগরিকের অধিকার দেওয়া হইত না; নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তাহারা স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিত না; এ ছাড়া স্বাস্থ্যরক্ষার অজুহাতে তাহাদিগকে নগরের এক দিকে ঠেলিবার চেষ্টা চলিতেছিল; মাথাপিছু ৪৫৲ টাকা করের কথা ত পূর্বেই বলিয়াছি।

১৯০১ সালে শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী দ্বিতীয়বার দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করিলেন ও ব্যারিষ্টারীতে মন দিলেন—উদ্দেশ্য ভারতীয়দের রক্ষা। ১৯০৩ সালে গান্ধীজি 'ট্রান্সভাল বৃটীশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন' স্থাপন করিলেন ও ঐ বৎসরেই 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' (Indian Opinion) নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কাগজখানি প্রথমে ইংরাজী, গুজরাতি, হিন্দী ও তামিল ভাষায় মুদ্রিত হইত; এখন ইংরাজী ও গুজরাতিতে বাহির হয়। এই সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়াতে ভারতীয়দের অভাব অভিযোগ, সরকারের সমালোচনা প্রভৃতি প্রকাশ করিবার সুযোগ হইল। ১৯০৬ সালে ট্রান্সভালের নূতন গভর্ণমেণ্ট এশিয়াবাসিগণের জন্য নূতন আইন পাশ করিলেন। প্রত্যেক এশিয়াবাসীকে—চীনা ও ভারতবাসীকে ইমিগ্রেশন অপিষে নিজ নিজ নাম, গ্রাম জাতি ইত্যাদি লিখাইতে হইবে। ভারতবাসী সকলেই এ আইন মান্য করিল। শিক্ষিতেরা নাম সহি করিয়া দিত; নিরক্ষর লোকে টিপসহি দিত। কিন্তু সরকার ইহাতে সুখী হইলেন না, নিয়ম করিলেন যে প্রত্যেক

গান্ধী ও আফ্রিকায়

ভারতবাসী অপিষে আসিয়া নিজ নামের পার্শ্বে দশ আঙ্গুলের পৃথক্ পৃথক্ টিপ সহি দিবেন ও চার আঙ্গুলের আটটি; মোট ১৮টি ছাপ দিতে হইবে। এ ছাড়া প্রত্যেক ভারতবাসী আপনার সহিত Asiatic Registration Certificate নামে এক ছাড়পত্র সর্বদা রাখিতে বাধ্য হইবে এবং যে কোনো সময়ে পুলিশ দেখিতে চাহিলেই তাহা দেখাইতে হইবে। এ ব্যবস্থা যে কত অপমানকর তাহা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। এই আইন ব্যবস্থাপক সভায় পাশ হইয়া গেলে গান্ধীজি তথায় 'নিরুপদ্রব প্রতিরোধ' বা সত্যগ্রহ ঘোষণা করিলেন। ১৯০৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীরা তাহাদের জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য 'সত্যগ্রহ' মন্ত্র দীক্ষিত হইল।

বিলের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন চলিতে লাগিল; ভারতবাসীরা প্রতিজ্ঞা করিল তাহারা স্বাক্ষর করিবে না, টিপসহি দিবে না। কিন্তু অবশেষে ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে সম্রাট এই বিলের অনুমোদন করিলেন। ভারতবাসীদের নাম স্বাক্ষর করাইবার জন্য সরকারী রেজি-ষ্ট্রারেরা অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভারতবাসীরা নারাজ, তাহারা আইন অমান্য করিবার অপরাধে দলে দলে জেলে যাইতে লাগিল। ১৯০৭ সালের শেষভাগে গান্ধীজির দুই মাস কারাবাসের আদেশ হইল। এই ঘটনার পর চারিদিক হইতে মিটমাটের চেষ্টা হইল। গান্ধীজিও শান্তি চান। সরকারী পক্ষে জেনারেল স্মাটস্ বলিলেন যে ভারতবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নামসহি করিলে উক্ত আইন বাতিল করা হইবে। গান্ধীজি নিজে প্রথমে গিয়া এই স্বাক্ষর দিলেন; ইহাতে তাঁহাকে দেশবাসীর নিকট খুবই লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। তাহারা তাঁহার আদেশে নাম স্বাক্ষর করিয়া আসিল বটে কিন্তু সরকারের পক্ষে আর আইন বাতিল করিবার কোনো কথা উঠে না। গান্ধীজি বহু চেষ্টায় সরকারকে প্রতিশ্রুতিমত

প্রথম সত্যগ্রহ

কার্য্য করাইতে পারিলেন না। তখন পুনরায় 'সত্যাগ্রহ' ব্যতীত আর উপায় থাকিল না। ইহার উপর ১৯০৮ সালে ট্রান্সভাল সরকার বলিলেন যে কোনো ভারতবাসী সোনার ব্যবসায় করিতে পারিবেন না। এ ছাড়া Emmigration Registration Act, Asiatic Law Amendment Act পাশ হওয়ায় শিক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষেও ট্রান্সভালে প্রবেশ লাভ করা সুকঠিন হইল। ১৯০৮ হইতে ১৯০৯ সালে জুলাই মাস পর্য্যন্ত ১৮ মাসে ১,৫০০ লোক কারাগারে গিয়াছিল। গান্ধীজিও দ্বিতীয় বার দুই মাসের জন্য সশ্রম কারাগার-বাসের জন্য প্রেরিত হইলেন।

কারামুক্ত হইয়া গান্ধীজি কয়েকটি সঙ্গীসহ ইংলণ্ডে দরবার করিতে গেলেন। শ্রীযুক্ত পোলক ভারতবর্ষে এই বিষয়ে আন্দোলন করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। বিলাতে আন্দোলনের ফল কিছুই হইল না, কেবল উভয় দলের মধ্যে বিরোধের ব্যবধানই বৃহত্তর হইল। সাম্রাজ্য-সরকার বলিলেন যে দক্ষিণ-আফ্রিকায় অচিরে পার্লামেণ্ট হইবে, সেখানে তাঁহাদের সদ্বিচার হইবে। স্মাটস্ প্রভৃতি সেই সময়ে বিলাতে ছিলেন তাঁহারা স্পষ্টই জানাইলেন যে তাঁহারা বর্ণভেদ উঠাইবেন না। ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত পোলক ও গোখলের চেষ্টায় ভারতবাসীরা প্রবাসী ভারতবাসীদের দুরবস্থায় সহানুভূতি প্রকাশ ও সরকারের ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। সত্যাগ্রহীদের জন্য দেড় লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিল। ভারতের বাহিরের হিন্দুমুসলমান, খৃষ্টান ভারতবাসীদের জন্য সমবেদনাবোধ জাতীয় আন্দোলনকে অগ্রসর করিল। অবশেষে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্থির হইল যে ১৯১১ সাল হইতে ভারতবর্ষ হইতে চুক্তিবদ্ধ কুলী নেটালে আর যাইবে না।

১৯০৮
ব্যর্থ ডেপুটেশন

১৯০৯ সালে কেপ-কলোনী, নেটাল, ট্রান্সভাল, অরেঞ্জ-রিভার কলোনী সম্মিলিত হইয়া 'সাউথ আফ্রিকান-যুনিয়ন' এই নূতন নাম গ্রহণ

নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রাপ্ত হইল। ১৯১০ সাল হইতে ভারত গভর্ণমেণ্ট দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের বিরুদ্ধের আইন রদ করিবার জন্য চেষ্টা করেন; ভারত গভর্ণমেণ্ট মিটমাটের চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া 'সত্যগ্রহ' আন্দোলন কিছুকালের জন্য মুলতুবী করা হইল। ভারতবাসীরা ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত। ১৯১২ সালে অক্টোবর মাসে মহামতি গোখলে দক্ষিণ-আফ্রিকায় পৌঁছিলেন। ভারতীয় প্রতিনিধি ও ঔপনিবেশিকদের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিয়া একটা মীমাংসা করিলেন।

১৯১২
গোখলে
দক্ষিণ-আফ্রিকায়

শ্বেতাঙ্গেরা মাথা-পিছু কর উঠাইতে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং ভারতবাসীদের প্রতি সুবিচার করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল না; যুনিয়ন সরকার ভারতবাসীর জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য ভ্রূক্ষেপ করিলেন না ও কেবলই নূতন নূতন বিধি প্রণয়ন করিয়া তাহাদের অবাধ গতিবিধি হ্রাস ও বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১৯১৩ ইউনিয়ন সরকার নূতন অ্যাক্ট পাশ করিলেন; সে নিয়মানুসারে যাহারা ১৮৯৫ সালের পর আফ্রিকায় আসিয়াছে তাহাদিগকে কোনো প্রকার অধিকার দেওয়া হইবে না ও যাহারা দেশে একবার ফিরিয়াছে তাহারা পুনরায় আসিতে পাইবে না। এতদিন আফ্রিকার কোন অংশ হইতে কেপ-কলোনীতে আসায় বাধা ছিল না, এখন নিয়ম হইল যাহারা খুব ভাল করিয়া ইংরাজী না বলিতে পারিবে তাহাদের প্রবেশাধিকার নিষেধ। এ ছাড়া যাহারা ফ্রী-ষ্টেটে যাইবে তাহাদিগকে লিখিয়া দিতে হইবে যে তাহারা কেবলমাত্র মজুরী করিতে যাইতেছে, জমি জমা করিতে বা বাস করিতে তাহাদের কোনোরূপ ইচ্ছা নাই। তিন পাউণ্ড কর (৪৫ টাকা) যেমন ছিল তেমনি থাকিল।

১৯১৩ সালের
নূতন আইন

সদ্ভাব কিছুতেই রাখা যাইবে না যখন বুঝা গেল, তখন ভারতীয়

নেতারা পুনরায় 'সত্যগ্রহ' গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু এইসব বিধির মধ্যে যেটি ভারতবাসীকে সবচেয়ে আঘাত করিয়াছিল সেটি হইতেছে বিবাহ সম্বন্ধে সরকারের আইন।

সেই আইনানুসারে কোনো ব্যক্তির একাধিক পত্নী থাকিলে তাহারা বা তাহাদের সন্তানেরা দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। স্থানীয় আদালত বলিলেন যে, যে ধর্মে একাধিক পত্নী বিবাহ করিবার অনুমতি আছে, সে-ধর্মানুসারে বিবাহিত পত্নী বা তাহার সন্তানেরা প্রবেশাধিকার পাইবে না। এই আইনের অর্থ এই যে, যে-সব হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষ হইতে গিয়া সেখানে বসবাস করিতে চায় তাহাদিগকে আসিতে নিষেধ করা। দক্ষিণ-আফ্রিকা চুক্তিবদ্ধ কুলী প্রয়োজনমত চায়, স্বাধীন মুক্ত নাগরিককে আসিতে দিতে বা কোনো প্রকার সুবিধা সুযোগ দিতে তাহারা নারাজ। দক্ষিণ-আফ্রিকায় সরকার বিবাহ সম্বন্ধে আইন পাশ করিয়া বিরোধ ও বিদ্বেষাগ্নির শেষ ইন্ধন অর্পণ করিলেন। অন্যায় অবিচার অসহ্য হইল। তখন গান্ধীজির নেতৃত্বাধীনে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান সরকারের আইন অমান্য করিবার জন্য 'সত্যগ্রহ' গ্রহণ করিল। ট্রান্সভালে পুলিশের হাতে শত শত ভারতবাসী নিগৃহীত হইল। সত্যগ্রহ দিন দিন প্রবল ও কষ্ট দুঃসহ হইয়া উঠিতে লাগিল। ভারতবাসী প্রবাসী ভারতবাসীর জন্য দরদ অনুভব করিল, জাতীয় আত্মবোধে প্রবাসী ভারতবাসীর অপমান তাহাকে বিদ্ধ করিল। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ও ভারতবর্ষে এই আন্দোলন লইয়া ভীষণ অশান্তি হইতে লাগিল। এবার তাঁহাদের দাবী এই—(১) মাথাপিছু কর রদ করিতে হইবে; (২) আইনে বর্ণ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা উঠাইয়া দিতে হইবে, (৩) ভারতীয়গণের বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে, (৪) দক্ষিণ-আফ্রিকাজাত ভারতীয়গণকে কেপ-কলোনীতে প্রবেশ করিতে

১৯১২
গান্ধীজি ও সত্যগ্রহ

দিতে হইবে। (৫) ভারতবাসীগণের স্বার্থ-সংক্রান্ত সকল বিষয়ের ন্যায়-সঙ্গত মীমাংসা করিতে হইবে। যখন সরকার কিছুর মীমাংসা করিলেন না, তখন কুলিরা ধর্মঘট করিল ও আইন-অমান্য করিবার জন্য ট্রান্সভালে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল।

গান্ধীকে ট্রান্সভাল সরকার পনের মাসের জন্য কারাগারে পাঠাইলেন। শত শত ভারতবাসী নরনারী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল; কেহ কেহ ব্যাধিতে কারাগারেই মরিল। নেটালেও ধর্মঘট সুরু হইয়াছিল; সেখানে ধর্মঘটকারীদের উপর গুলি চালানো হইল, কয়েকজন গুলিতে প্রাণ দিল। এইসব ঘটনা ভারতবর্ষে ভীষণ চঞ্চলতা সৃষ্টি করিল। লর্ড হার্ডিংজ ১৯১০ সালে ২৪শে নভেম্বর মাদ্রাসের 'মহাজন সভা'য় দক্ষিণ-আফ্রিকার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ভারতবাসীদের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন ও য়ুনিয়ন-সরকারের ব্যবহারের নিন্দা করিলেন। মাদ্রাসের লর্ড বিশপ ১৫ই ডিসেম্বর দক্ষিণ-আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের এই সকল কাজের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। ভারতবাসীদের মনোভাব কি হইল তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

এই সত্যাগ্রহের সময় রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে'র দুইজন ইংরাজ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুস ও শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও ভারতবাসীদের যথার্থ অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম তথায় অচিরে শান্তি আনয়ন করিল।

ভারতবর্ষে ভীষণ আন্দোলন, বিলাতে একদল লোকের আন্দোলন, দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতবাসীদের কঠিন আন্দোলন—য়ুনিয়ন-সরকার আর নীরবে বসিয়া দেখিতে পারিলেন না। তাঁহারা মীমাংসা করিবার জন্য এক কমিশন বসাইলেন।

য়ুনিয়ন-সরকার হইতে নিযুক্ত কমিশন প্রায় ১৪টি প্রস্তাব করেন;

তন্মধ্যে ১৯১৪ সালে যে আইন সে দেশে পাশ হয় তাহাতে পাঁচটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিবাহ সম্বন্ধে যে আইন হইয়াছিল তাহা উঠাইয়া দিয়া স্থির হইল যে, কেহ একাধিক স্ত্রী দেশে আনিতে পারিবে না বা যাহার কোনো স্ত্রী আফ্রিকায় পাছে সে পুনরায় কোনো স্ত্রী আনিতে পারিবে না। দ্বিতীয়ত যে কোনো পুরুষ ও নারী একত্র হইয়া সরকারের কাছে অনুমতি লইয়া বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবে। তৃতীয় প্রস্তাবানুসারে বিবাহে ভারতীয় পুরোহিত কর্মচারীরূপে বিবাহ দিলে সে-বিবাহ বৈধ বলিয়া গ্রাহ্য করা হইবে। এ ছাড়া নেটালের মাথাপিছু ৪৫৲ টাকা জিজিয়া কর উঠিয়া গেল। এই সত্যগ্রহ আন্দোলনের নেতা ছিলেন মহাত্মা গান্ধি। তাঁহারই চেষ্টায় ও আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্তে এই আন্দোলন চলিল। ইহারই ফলে পূর্বোক্ত কমিশন ও নূতন বিধি প্রণীত হয়। য়ুনিয়ন-সরকারের তৎকালীন আভ্যন্তরীন সচিব শ্রীযুক্ত স্মাট্‌স্ ও গান্ধীর মধ্যে পত্রাদি ব্যবহারের দ্বারা সন্ধি স্থাপিত হইল। তাহার ফলে তাঁহারা ভারতবাসীদের 'পাওনা' দাবী ন্যায়ত বজায় রাখিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এদিকে ১৯১৪ সালের পূর্বোক্ত Indian Relief Act ভারতবাসীকে মানিতে হইবে। গান্ধি জানাইলেন যে ভারতবাসীদের সহরের মধ্যে ব্যবসায়, বাণিজ্য করিবার ও বাস করিবার বা অন্যত্র উঠিয়া গিয়া বাস ও ব্যবসায় করিবার অধিকারের নামই 'পাওনা' দাবী।

য়ুনিয়ন সরকার নিযুক্ত কমিশন ও মীমাংসা

গান্ধী-স্মাটস্ সন্ধিপত্র

সত্যগ্রহ আন্দোলন শেষ করিয়া ভারতবর্ষে ফিরিবার পূর্বে গান্ধীজি স্মাট্‌স সাহেবকে লিখিয়া জানাইলেন যে আজ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যগ্রহ শেষ হইল; কিন্তু ভারতবাসীরা এখনো লাইসেন্স সম্বন্ধীয় নিয়মের, ট্রান্সভালে কোনো ভারতবাসী সোণার কাজ করিতে পারিবে না বলিয়া যে নিয়ম আছে তাহার, ভারতবাসীদের বাসস্থান সম্বন্ধে আইনের,

ও অন্যান্য বিধি সম্বন্ধে ঘোর আপত্তি জানাইতেছে। কেহ কেহ বলিতেছিলেন যে ভারতবাসীদের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গমনাগমন সম্বন্ধে কড়াকড়ি অন্যায়; সুতরাং ইহাকেও সত্যগ্রহ আন্দোলনের অন্তর্গত করা উচিত। গান্ধীজি সমস্ত দাবী এক সঙ্গে করেন নাই। তিনি কেবল রেজিষ্ট্রেসন ও বিবাহসম্বন্ধে আন্দোলন সুরু করেন। ও তাহা মিটিয়া গেলেই সেবারকার আন্দোলন তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন।

সত্যগ্রহ শেষ

যুদ্ধের সময়ে প্রবাসী ভারতবাসীরা নিজেদের 'দাবী-দাওয়া' লইয়া বিশেষ কোনো আলোচনা আন্দোলন করে নাই। যুদ্ধের শেষে সকল মিত্ররাজ্য ও অধীন দেশ মনে করিতে লাগিল যে ইংরাজদের জয়লাভে তাহারা সহায়তা করিয়াছে, সুতরাং যুদ্ধান্তে তাহাদের প্রতি সদ্‌ব্যবহার হইবে। এই আশাতেই নির্ভর করিয়া তাহারা পুনরায় ১৯১৯ সালে আপনাদের ন্যায্য দাবী লইয়া আন্দোলন সুরু করিল। ১৮৮৫ সালের তিন আইনানুসারে কোনো এশিয়াবাসী ট্রান্সভালে জমির মালিক হইতে পারিত না। এ আইন এখনো প্রচলিত আছে। কিন্তু ১৯০৯ সালের এক আইনানুসারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র হইয়া কোম্পানী গঠন করিতে পারিত এবং তাহাদের জমি দখল সম্বন্ধে কোনো নিষেধ ছিল না; ভারতবাসীরা সেই সুযোগ লইয়া দুই চারি জনে মিলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোম্পানী গঠন করিয়া জমি দখল করিত।

বুয়রেরা মনে করিল যে ভারতবাসীদের এই ব্যবহার স্মাটস-গান্ধী সন্ধিসর্তের বিরোধী; এই লইয়া তাহারা তীব্র আন্দোলন উত্থাপন করে। ফলে যে আইন পাশ হইল, তাহাতে স্থির হইল যে ১৯১৪ সালের পূর্বে যাহারা খনির এলেকায় ব্যবসায় করিত তাহাদের দাবী মঞ্জুর করা হইবে। আর কাহাকেও সেখানে ব্যবসায় করিবার নূতন অধিকার দেওয়া হইবে না। ভারত

ভারতবাসীর সীমাবদ্ধ অধিকার

বাসীরা ট্রান্সভালে বাসিন্দা-ভারতবাসীদের কাছে নিজ নিজ দোকানপত্র ব্যবসায় বিক্রয় করিতে পারিবে। কিন্তু ভবিষ্যতে ভারতবাসী যাহাতে আর কোনো উপায়ে ব্যবসায় করিবার License বা সর্তপত্র না পায় সেবিষয়ে সকলকে অত্যন্ত সজাগ হইতে হইবে। ভারতবাসীরা যে কোম্পানীবদ্ধ হইয়া জমিজমা ক্রয় করে, তাহাও অতঃপর বে-আইনী বলিয়া সাব্যস্ত হইল। এই আইনে শ্বেতাঙ্গ বা ভারতবাসী কেহই সুখী হইল না। কোনো রকমে আইন ত পাশ হইল; কিন্তু সরকার ভারত-বিরোধী দলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অচিরেই পার্লামেণ্ট হইতে এক কমিশন বসাইবার অঙ্গীকার করিলেন; এই কমিশন সমগ্র সমস্যার আলোচনা করিয়া প্রতিবেদন দিবেন। তৎকালীন ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব

পার্লামেণ্ট কমিশন

যুনিয়ন-গভর্ণমেণ্টকে উক্ত কমিশনে ভারতীয় প্রতিনিধি রাখিবার জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু তাঁহারা ভারতীয়কে সভ্য করিতে রাজী হইলেন না; তবে কমিশনের সম্মুখে ভারতীয় প্রতিনিধি উপস্থিত হইবার অধিকার তাঁহারা দিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদল ভারতবাসী ও অন্যান্য এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাহারা বলেন আফ্রিকাকে

শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক-দের মনোভাব

য়ুরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের উপনিবেশ করিয়া লইতে; তাঁহারা ভাবিতেছেন এশিয়াবাসীদের উপদ্রবে আফ্রিকা বুঝি ধ্বংস হয়। চারিদিকে সভাসমিতি আন্দোলন চলিতেছে। ভারতবাসীরাও নীরব থাকিল না, তাহারাও সভা করিয়া প্রস্তাব করিয়া বক্তৃতা করিয়া চারিদিক মুখর করিয়া তুলিল।

১৯২১ সালের মার্চ মাসে এই পার্লামেণ্টের কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হইল। তাঁহাদের প্রস্তাবানুসারে (১) ট্রান্সভালের ১৮৮৫ সালের আইন অপরিবর্তিত রহিল; অর্থাৎ সেদেশে ভারতবাসীদের জমি-

জমা ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার থাকিবে না। (২) জোর করিয়া ভারত-বাসীদের দেশে পাঠানো হইবে না; কিন্তু তাহারা যাহাতে স্বেচ্ছায় ফিরিয়া যায় সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে। একজন অফি-সার এই ফেরত চালান দিবার জন্ত নিযুক্ত হইলেন; ভারতবাসীদিগকে ২৫ পাউণ্ডের পর্য্যন্ত সোনা ও অলঙ্কার সঙ্গে লইয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইল; এর উপর লইতে হইলে নোট লইতে হইবে। (৩) ভারতবাসীদিগকে জোর করিয়া সহর হইতে বাহির করিয়া পৃথক্ পল্লীতে প্রেরণ করা অন্যায়; তবে তাহারা যাহাতে স্বেচ্ছায় যায় সে বিষয়ে মুন্সিপালটিসমূহের ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে; সহরের একদিকে এশিয়াবাসীদের জন্ত বিশেষ পল্লী থাকিবে; বিশেষ কতকগুলি পথের ধারে এশিয়াটিক ব্যবসায়ীরা যেন ধীরে ধীরে গিয়া বাস করে। নেটালে সমুদ্রের ধারে ২০।৩০ মাইল পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে ভারতবাসীরা জমি জমা করিতে পারিবে। ব্যবসায় করিতে হইলে যে লাইসেন্স লইতে হইত, তাহা যুনিয়নের সকল প্রদেশেই লইতে হইবে; মুন্সিপালটির উপর এই লাইসেন্স দান করিবার অধিকার অর্পিত হইল। মুন্সিপালটি ইচ্ছা করিলে কোনো দোকানে বা বিশেষ ব্যবসায়ের কেন্দ্রে ভারতবাসীদের বাস করিতে নাও দিতে পারে। Immigrants বা বৈদেশিকদের সম্বন্ধে শিক্ষার যে পরীক্ষা ছিল তাহা একটুও না কমাইয়া যাহারা উক্ত পরীক্ষাকে ভাঁড়াইয়া আছে তাহাদের সম্বন্ধে কড়া ব্যবস্থা প্রয়োজন; ইত্যাদি অনেক প্রস্তাব কমিশন করেন।

কমিশনের প্রস্তাব

এদিকে ভারতবাসীদের সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গদের মনোভাব ক্রমেই বিকৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। South Africans League নামে একটি সমিতি হইতে দেশে বিদেশে ভারতবাসীদের নিন্দা প্রচারিত হইতেছে। নেটালে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীদের দূর করিবার জন্ত

ভারতবাসীদের প্রতি ঔপনিবেশিকদের তীব্র বিদ্বেষ

License কাড়িবার চেষ্টা, নগরে ভোট দিবার ক্ষমতা কাড়িবার ব্যবস্থা, জমি দখল করিতে বাধা দিবার আয়োজন হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের যে প্রকার মনোভাব তাহাতে ভারতবাসীদের সহিত কোনো প্রকার প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার আশা সুদূরেও নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ ও ভারতবাসীদের অশান্তি মিটিতে না মিটিতে পূর্ব আফ্রিকায় বিরোধ ঘনাইয়া উঠিল। যতদিন ভারতবাসীকে সেই সকল দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল ততদিন তাহাদিগকে ভুলাইয়া, ফুসলাইয়া, লোভ দেখাইয়া কুলী করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; কিন্তু আফ্রিকার বন্যদেশ যখন ভারতবাসীদের সহায়তায় বাসোপযোগী হইল, তখন তাহাদের সে দেশে থাকা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বৃটীশ পূর্ব-আফ্রিকায় প্রায় ১৯১২ সালে হইতেই বিরোধ বাধিয়া উঠে।

পূর্ব-আফ্রিকায় ভারতবাসী

সেই সময়ে শ্বেতাঙ্গেরা উপলব্ধি করিলেন যে নৌরবী বন্দরের পার্শ্বস্থ মালভূমি শ্বেতাঙ্গদের উপনিবেশের অনুকূল স্থান। তখনই এক আইন হইল যে মালভূমি শ্বেতাঙ্গদের ও মোম্বাসার নিকটস্থ নিম্ন সমতলভূমি ভারতবাসীদের দেওয়া হইবে। মালভূমিতে শ্বেতাঙ্গেরা যত খুসী জমি লইতে পারিতেন, কিন্তু সমতলভূমিতেও ভারতবাসীরা ১০০ একশতের অধিক জমি জমা লইতে পারিত না। কিন্তু ১৯১৮ সালের পূর্বে পূর্ব-আফ্রিকায় ভারতবাসীদের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ তেমন করিয়া আকার গ্রহণ করে নাই। যুদ্ধের পূর্বে ভারতবাসীদের অধিকার এমন ধীরে ধীরে বাজেয়াপ্ত হইতেছিল যে তাহারা আপনাদের অবস্থা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যুদ্ধের সময়ে ১৯১৪ হইতে ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত দেশে সামরিক আইন জারি ছিল; সুতরাং ভারতবাসীকে একপ্রকার জোর করিয়াই মূক করিয়া রাখা হইয়াছিল। পূর্ব আফ্রিকায় সরকার বাহাদুর এই সময়ের সুযোগ গ্রহণ করিয়া

যুদ্ধের পর আন্দোলন

১৯১৫ সালে Legislative Councilএ এক আইন পাশ করেন যে অতঃ-পর শ্বেতাঙ্গেরা কোনো জমি ভারতবাসীর নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে না। তখন Legislative Councilএ কোনো ভারতবাসী সভ্য ছিল না; সুতরাং নির্বিবাদে এ আইন পাশ হইয়া যায়। ইহাই যথেষ্ট নয়। ১৯১২ সালে ইংলণ্ডের উপনিবেশিক-আফিস একজন বড় ইংরাজ অধ্যাপককে নিযুক্ত করিয়া পূর্ব-আফ্রিকার স্বাস্থ্যোন্নতি ও নগর-গঠন সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রতিবেদনের গোড়ার কথা হইতেছে জাতিগত পার্থক্য সৃষ্টি করা। নূতন প্রণালীতে নগর-গঠনের অছিলায় নৌরবী ও অন্যান্য সহরের মধ্যে ভারতবাসীদের জন্য বিশেষ স্থান নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইল। এই রিপোর্ট ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত গোপন করিয়া রাখা হয়। ১৯১৭ সালে যুদ্ধের উপকরণ ও সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য সাম্রাজ্যের সর্বত্র কমিশন বসানো হয়। ঐরূপ কমিশন পূর্বআফ্রিকারও বাসে। তাঁহারা অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিয়া শ্রমজীবি-সমস্যার কথা তুলিয়া বলেন যে অতঃপর ভারতবর্ষ হইতে লোক প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না; তাঁহাদের যুক্তি এই যে ভারতবাসীদের উৎপাতে আফ্রিকার আদিম বাসিন্দাদের আর্থিক উন্নতি হইতেছে না; ভারতবাসীরা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ভাবে বাস করে; উহাদের আচার ব্যবহার অত্যন্ত দুর্নীতি পূর্ণ। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে ভারতবাসীরা খুবই অসন্তুষ্ট হয় কারণ ভারত-বাসীদের কোনো প্রতিনিধি কমিশনের সভ্য ছিলেন, এবং কোনো ভারত-বাসীর সাক্ষ্য কমিশন গ্রহণ করেন নাই। ১৯১৯ সালে এক নূতন আইন প্রণীত হইল; এই আইনানুসারে শ্বেতাঙ্গ ও ভারতবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট বাসভূমি ব্যবসায় কেন্দ্র স্থির করিয়া লওয়া হইল। যুদ্ধের পরেই প্রাক্তন শ্বেতাঙ্গ সৈন্য (Ex-soldiers) দের জন্য জমি বিলি করিয়া দেওয়া হইল; কিন্তু প্রাক্তন ভারতীয় সৈন্যের কথা বা তাহাদের দেশবাসীর কথা একবারও কেহ ভাবিলেন না। চারি হাজারের উপর এদেশের সৈন্য পূর্ব-

আফ্রিকায় জার্মানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াছিল মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কেনিয়া উপনিবেশে ভারতীয়দের দশা

১৯২০ সালের জুলাইমাসে পূর্বআফ্রিকায় শাসন প্রণালীর মধ্যে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। নূতন প্রদেশের নাম হইল Kenya Colony এবং ইহার পাশের করদ রাজ্য—পূর্বে যাহা জাঞ্জিবারের সুলতানের অধীন ছিল, তাহা Kenya Protectorate হইল। ইহা এখন ইংরাজের খাস উপনিবেশ বা Crown Colony.

ভারতবাসীরা ইতিমধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ ইহার প্রতিবাদ সুরু করিল। ভারতবর্ষে আন্দোলন করিয়া ভারতবাসীদের সহানুভূতি পাইবার জন্য এখানে লোক আসিল। এদিকে ১৯১৯ সালে Segregation ও সহর নির্মাণ সম্বন্ধীয় আইন পাশ হইয়া গেল। কিন্তু ভারতবাসীকে একটু খুসী করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় তিন জন মনোনীত সভ্যের মধ্যে দুই জন ভারতবাসী ও একজন আরব দেওয়া হইল। ভারত-সরকার এদিকে ভারতবাসীদের পক্ষ হইল বলিলেন যে Crown Colony বা Protectorate রাজ্যে ভারতের প্রজাকে যে হীন চক্ষে দেখা হয় তাহা অত্যন্ত অবিধেয়। কেনিয়া হইতে যে আবেদনকারীরা আসিল তাহাদিগকে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড বলিলেন যে তিনি সরকারকে এ বিষয়ে যতদূর কবিল করিয়া আমায় বলিয়াছেন।

ক্রমেই আন্দোলন ও অসন্তোষ বাড়িতে লাগিল; আবেদন নিবেদনের অন্ত থাকিল না। অবশেষে স্থির হইল যে যে দুইজন ভারতীয় সভ্য কেনিয়া সরকার কর্তৃক মনোনীত হন, তাঁহারা ভারতবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হইলেন। Segregation সম্বন্ধে কোন প্রতিকার হইল না।

ইহার পরে ১৯২১ সালে যখন মিঃ চার্চিল উপনিবেশিক-সচিব পদে নিযুক্ত হইলেন তাঁহার কথাবার্তা ও বক্তৃতা শুনিয়া ভারতবাসীদের আশা হইয়াছিল যে কিছু সুবিধা বা হইতেও পারে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গেরা চার্চিলের এই

প্রকার মনোভাব দেখিয়া একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল; সভা-সমিতিতে তাহারা যে রকম ভাষাও ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, পত্রিকাতে যে সব বিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিল, তাহা অন্য যে কোনো সভ্য দেশে লজ্জাকর বলিয়া বিবেচিত হইত; শান্তির কথা ছাড়িয়া দিই। কেনিয়াতে ভারতবাসীদের লাঞ্ছনার অন্ত নাই; মাদ্রাজের পারিহার প্রতি যে ব্যবহার আমরা করি, তাহারই পাল্টা জবাব সেখানে ভারতবাসী পাইয়া থাকে। ভারতবাসীকে পৃথক্ হইয়া থাকিতে বলায় তাহাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছে; ইহার জবাবে শ্বেতাঙ্গেরা বলে যাহারা জাতিভেদ ধর্মের সঙ্গে এক করিয়াছে, তাহারা আবার এ বিষয়ে কথা বলে কেন। রাজনৈতিক জগতে প্রতিষ্ঠা নাই বলিয়াই হউক অথবা নৈতিক জগতে দুর্বলতা আছে বলিয়া হউক আমাদের জোর করিয়া যাহা কিছু বলিবার থাকে, তাহার পিছনে না বলিবারও অনেকখানি চাপা থাকিয়া যায়।

পরস্পরের বিরোধ ও বিদ্বেষ

কেনিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্যা আজও মেটে নাই; এবং যতদিন ভারতবাসী আপনার মহত্ত্বে আপনি না দাঁড়াইতে পারিবে, ততদিন ক্রন্দনে বা আবেদনে কোন ফল ফলিবে না; কারণ স্বার্থ বড় বালাই।

———o———

তৃতীয় পর্ব

আমেরিকায় ভারতবাসী

ভারতবাসীর বিরুদ্ধে বহির্জ্জগতে এতযে আন্দোলন তাহার অর্থ কি? ভারতের বাহিরে ভারতবাসীর সংখ্যা ২৫ লক্ষের অধিক নহে; ইহার মধ্যে (নয়) ৯ লক্ষ ত' সিংহলে বাস করে। সিংহল ঠিক বিদেশ নয়। সমগ্র প্রবাসী ভারতবাসীর মধ্যে শতকরা ৯৭ জন বৃটীশ রাজ্যে বাস করে। দক্ষিণ আমেরিকার বৃটীশ গিয়েনাতে ও পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জে ২ লক্ষের উপর ভারতবাসী বাস করিতেছে, মালয় ও ষ্ট্রেট্‌ সেট্‌লেমেণ্টে ২,৩০ হাজার। কেনিয়াতে ৩৫,০০০ হাজার। জনসংখ্যা হিসাবে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসীর বল অধিক; ইহার মধ্যে নেটালেই ১,৩৩ হাজার—অন্যান্য প্রদেশে আরও ৩০ হাজার অধিবাসী আছে।

বিদেশে ভারতবাসীর সংখ্যা

বিদেশে এই জনসংখ্যার জন্য দায়ী কাহারা? কুলী করিয়া শ্বেতাঙ্গেরাই ইহাদিগকে লইয়া গিয়াছিলেন; প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে ইহাদের জনসংখ্যা এই দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের সাহায্যে আফ্রিকায় বর্ত্তমান শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাহাদের দ্বারা উগাণ্ডার রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে; এখন তাহাদের বংশধরেরা সেখানে বাস করিতেছে। অষ্ট্রেলিয়াতে প্রথম প্রথম কুলী চালান হইয়াছিল; কিন্তু ১৯০৮ সালে অষ্ট্রেলিয়ার সরকার কুলী লওয়া বন্ধ করিয়া দেন। আফ্রিকাকে সেখানকার শ্বেতাঙ্গেরা যেমন 'শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশ' করিয়া তুলিতে চান, অষ্ট্রেলিয়াও তাহাই হইয়াছে।

অথচ সেদেশের অধিকাংশ স্থানই য়ুরোপীয়দের বাসের অনুপযোগী। কিন্তু তথাকার শ্বেতাঙ্গেরা 'সূচ্যাগ্র ভূমি' অ-শ্বেতাঙ্গ কাহাকেও দিবে না। কানাডায় একসময়ে ৭০০০ ভারতবাসী ছিল; কিন্তু এখন সেখানে ১,২০০-এর অধিক আছে কিনা সন্দেহ। অনেকেই ভাল ব্যবহার আশা করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গিয়াছিল বা দেশে ফিরিয়াছিল। ভারতের বাহিরে এদেশের ৩১ কোটি লোকের তুলনায় যে কয় লক্ষ লোক রহিয়াছে তাহার অনুপাত কি! অথচ এক ক্ষুদ্র বৃটীশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে লোক পৃথিবীর অর্দ্ধেক ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং ঔপনিবেশিকেরা স্থান থাকিতেও অপরকে স্থান দিতে অনিচ্ছুক। আমেরিকায় প্রত্যেক বৎসর কয়েকশত জাপানীকে তাহারা প্রবেশাধিকার দিতে বাধ্য হইয়াছে ও অর্থ জমা দিলে চীনারাও প্রবেশলাভ করিতে পারে; কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে উত্তর-আমেরিকা একপ্রকার বন্ধ—অষ্ট্রেলিয়া বন্ধ, আফ্রিকা বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে, ফিজিদ্বীপ হইতেও ভারতবাসীদের তাড়াইবার আয়োজন চলিতেছে।

সর্বত্র ভারতবাসী অস্পৃশ্য

ভারতবাসীদের বিদেশে অধিকার দান সম্বন্ধে য়ুরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে আলোচনা হয়। তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিংজ বলেন যে, সকল বৃটীশ প্রজাদের পরস্পরের ব্যবহার একই রকমের হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতবর্ষে বিদেশীদের আগমনকালে পাসপোর্ট (Passport) প্রভৃতি প্রয়োজন হইবে; অন্যান্য রাজ্যে ভারতবাসীদের প্রবেশ সম্বন্ধে সুবিধা সুযোগ করিয়া দেওয়া উচিত ইত্যাদি।

১৯১৭ সালে লণ্ডনে যে Imperial Conference বা সাম্রাজ্য মন্ত্রণা-সভা বসে ও ১৯১৮ সালে যে War Cabinet বা সামরিক মন্ত্রণা-সভা বসে তাহাতে স্থির হয় যে, বৃটীশ ভারতীয় প্রজাদিগকে সাম্রাজ্যের সর্বত্র সমান অধিকার দেওয়া যাইবে; প্রবাসী ভারতবাসীরা যাহাতে সাম্রাজ্যের

সর্বত্র রাজনৈতিক অধিকার পাইয়া সমান পংক্তিতে দাঁড়াইতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা হয়। মন্ত্রণা-সভায় স্থির হয় যে সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রত্যেক রাজ্যে কাহারা অধিবাসী হইবে সেবিষয়ের ব্যবস্থার ভার নিজ নিজ রাজ্যের উপর অর্পিত হইল। কিন্তু ভারতবাসীরা এবিষয়ে যথেষ্ট বাধা প্রাপ্ত হয় বলিয়া মন্ত্রণা-সভা মনে করেন যে সাম্রাজ্যের কল্যাণার্থে ভারতবাসীকে নাগরিকের অধিকার ও সম্মান দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিগণ স্পষ্টই বলিয়া দিলেন যে তাঁহারা ভারতবাসীকে কোনো প্রকার সুবিধা দান করিতে অক্ষম।

যুদ্ধের সময়ে ভারতবাসীকে সমান অধিকারের প্রস্তাব

আমেরিকার বৃটীশ কলম্বিয়াতে প্রায় ৪,০০০ হাজার ভারতবাসী বাস করিত। তাহাদের অধিকাংশই দিনমজুরী করিয়া বেশ পয়সা রোজগার করিত। কানাডা-সরকার এতগুলি ভারতবাসীকে শ্বেতাঙ্গদের দেশে বাস করিয়া, শ্বেতাঙ্গদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পয়সা রোজগার করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। কিন্তু স্পষ্টত ভারতবাসীকে নিষেধ করাটা নিতান্ত অভদ্রতা হইবে বলিয়া নিয়ম করেন যে, যদি কোনো জাহাজ কোনো দেশের বন্দর হইতে সোজাসুজি ভাঙ্কুভারে পৌঁছায়, তবে সেই জাহাজে করিয়া শ্রমজীবিগণ যাইতে পারিবে। কিন্তু কানাডায় যাইবার মধ্যে চীনা, জাপানী ও ভারতবাসী। রাজনৈতিক সর্তানুসারে প্রতি বৎসর কয়েক শত করিয়া জাপানী কানাডায় প্রবেশ করিতে পারিত, চীনাদের ঢুকিবার সময়ে ৫০০ ডলার মাথা-পিছু কর দিতে হইত। উভয় দেশ হইতেই জাহাজ সোজাসুজি আমেরিকায় যাইত, কেবল ভারতবর্ষ হইতে কোনো জাহাজ সোজা যাইত না—হংকঙে নামিয়া পুনরায় জাহাজে চড়িয়া যাইতে হইত। সুতরাং স্পষ্টত না বলিলেও কার্য্যত ভারতবাসীদের যাওয়া নিষেধ হইয়াছিল। ইহাদের ভণ্ডামী পরখ করিবার জন্ত ও সুবিধা হইলে কানাডায় গিয়া

কানাডায় ভারতবাসী

বাস করিবার অভিপ্রায়ে ৪০০ শিখ্ 'কোমাগাটামারু' নামে একখানি জাপানী জাহাজ ভাড়া করিয়া সোজাসুজি ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকায় গিয়া উপস্থিত হয়। এইবার কানাডা সরকারের কপটতা প্রকাশ পাইল। ভারতবাসীদিগকে জাহাজ হইতে নামিতে দেওয়া হইল না এবং এক প্রকার জোর করিয়াই তাহাদিগকে ফিরাইয়া পাঠানো হইল। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাহারা ফিরিয়া আসে; কলিকাতায় ইহাদের সহিত একটি দাঙ্গাও হয়, সে কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। মোট কথা ভারতবাসীকে কানাডা চায় না। তাহাদের কারণ আর্থিক। তাঁহারা বলেন যে ভারতীয় কুলী অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিয়া থাকে; সুতরাং বাজারে শ্বেতাঙ্গ শ্রমজীবিদের কাজ পাইতে খুবই কষ্ট হইবে। কানাডায় ভারতবাসীরা স্ত্রীপুত্র লইয়া যাইতে পারে নাই—সুতরাং সেখানে ভারতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার কোনো আশা নাই। এই ব্যাপারে ভারতবাসীরা খুবই বিরক্ত হইয়াছিল; তাহাদের ধারণা ছিল যে বৃটীশ প্রজা বলিয়া তাহাদের কোনো জন্মগত অধিকার আছে। কিন্তু সে ধারণা ভুল। সাম্রাজ্যের প্রত্যেক রাজ্য নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের মতামত গ্রাহ্য করে না। সেইজন্য কানাডা বা আফ্রিকা কেহ কোনো বিষয়ে 'না' করিলে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সহজে কিছু করা কঠিন। সাধারণ লোকে কানাডাকে ইংরাজ-রাজ্য জানে, সুতরাং কানাডা-সরকারের কোনো কাজ ইংরাজ সরকারের কাজের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করে। কিন্তু কেনিয়া ইংরাজ উপনিবেশ বা Crown Colony, রাজ্য বা Dominion নহে; Colony বিলাতের ঔপনিবেশিক সচিবের অধীন। সুতরাং ভারতবাসী সম্বন্ধে যেবিচার সাম্রাজ্য-সরকার করিবেন তাহাই যথার্থ। ১৯২১ সালে

'কোমাগাটামারু'র যাত্রীদের কথা

ইংরাজ রাজ্যে ভারতবাসীর অধিকার

যখন স্থির হইয়াছিল যে, ভারতবাসীকে অন্য সব জায়গার অধিবাসীদের সহিত সমান দেখা হইবে, তখন কেনিয়াতে দুই রকম ব্যবহার হওয়া অত্যন্ত অযৌক্তিক; যদি ভারতবাসীকে বাধা দিতে হয় ত' শ্বেতাঙ্গকেও বাধা দিতে হইবে। মোটের উপর কেনিয়া আফ্রিকার লোকদের—তাহাদের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি আগে দিতে হইবে; ভারতবাসী সেখানে ব্যবসায়বাণিজ্য করিবে—স্থায়ীভাবে খুব কমই লোক বাস করিবে, কিন্তু শ্বেতাঙ্গেরা রীতিমত বসবাসের জন্যই আসিয়াছে। এক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গদেরই সেস্থানে প্রবেশ বন্ধ করা আগে উচিত। কিন্তু এমন কঠোর যুক্তি রাজনৈতিক জানিতে চান না—আরও চান না যেখানে সম্বন্ধটা সত্যকারের সমানের সম্বন্ধ নয়।

১৯২৪ সালে আমেরিকার মার্কিন দেশ হইতে পূর্বদেশীয় শ্রমজীবি অর্থাৎ চীনা, জাপানী ও ভারতবাসীদের তাড়াইবার জন্য নূতন আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। কেবল শ্রমিকরূপে সেখানে আর কাহারও যাওয়া সম্ভব নয়। জাপানে এ বিষয়ে খুবই আন্দোলন চলিতেছে। ভারত-বর্ষের কাগজে কলমে লেখালেখি চলিয়াছিল। কিন্তু সাদা কথা ও সরল যুক্তি শুনিবার মত মানসিক অবস্থা ঝানু-রাজনীতিজ্ঞদের থাকে না। সুতরাং পূর্ব-এসিয়ার কথা কেহ শুনিতেছেন না। জাপান প্রায় পাঁচশত বিদেশী দ্রব্যের উপর শতকরা একশ' টাকা শুল্ক চাপাইয়াছে। তাহার অধিকাংশ আমেরিকান। আর ভারত সরকার দক্ষিণ-আফ্রিকার সাহেব-বণিকদের কয়লা বেশী দরেও এদেশে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করিতেছেন।

চতুর্থ পর্ব

উপনিবেশে ভারতবাসী

দক্ষিণ আফ্রিকায় গণ্ডগোল আরম্ভ হওয়াতে ভারত-সরকার বুঝিয়াছিলেন যে আন্দোলন সহজে মিটিবে না; সেইজন্য প্রবাসী ভারতবাসীদের অবস্থা সবিস্তারে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা মিঃ ম্যাকনিল ও চীমন লালকে লইয়া এক তদন্ত কমিশন বসান। উপনিবেশে প্রবাসী ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে ও তাহাদের উন্নতি সম্বন্ধে রিপোর্ট করিবার জন্য তাঁহারা অনুরুদ্ধ হন। তাঁহারা ট্রিনিডাড্, বৃটীশ গিয়েনা, জামাইকা, ফিজি ও ওলন্দাজ উপনিবেশ সুরীনাম (দঃ আমেরিকায়) ঘুরিয়া আসেন।

ট্রিনিডাড, গিয়েনা, জামাইকা ফিজি ইত্যাদি

তাঁহারা শ্রমজীবিদের বাস-সমস্যা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা, কাজের সময়, মজুরী, অপরাধ ও শাস্তি, ধর্মনীতি ইত্যাদি বহু বিষয় তন্নতন্ন করিয়া তদারক করেন। তাঁহারা উপনিবেশগুলির নানা অসুবিধা দেখাইয়া বলেন যে ভারতবাসী যে-সব সুবিধা সুযোগ সে-সব দেশে পাইতেছে তাহা তুলনায় অধিক। অধিকাংশ প্রবাসী ভারতবাসীর অবস্থা এদেশের সাধারণ শ্রমজীবিদের অপেক্ষা ভাল। অনেক কলোনীতেই তাহারা নাগরিকের অধিকার পাইয়া থাকে এবং প্রবাসী ভারতবাসীদের সন্তানেরা উচ্চশিক্ষা পাইয়া যথেষ্ট উন্নতিও লাভ করিয়াছে। কিন্তু কলোনীসমূহে সবচেয়ে বিপদ হইয়াছে বাগিচার কুলীদের নৈতিক জীবন লইয়া। অধিকাংশ স্থলে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা খুবই কম; সেইজন্য দুর্নীতি অত্যন্ত প্রবল। চুক্তিবদ্ধ কুলিদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যাও

অস্বাভাবিকরূপে বেশী। ট্রিনিডাডে ১০ লক্ষ ভারতবাসীর মধ্যে ১৩৪ জন আত্মঘাতী, কিন্তু চুক্তিবদ্ধ কুলিদের মধ্যে ৪০০ আত্মঘাতী। বর্তমানে সেথানে প্রায় ১ লক্ষ ১৭ হাজার ভারতবাসীর বাস। চুক্তি উঠিবার পূর্বে কুলিদের পাঁচ বৎসর করিয়াই দাসত্ব করিতে হইবে। এখানকার চিনির কারবারে কুলিদের মজুরী ছিল দশ বার আনা মাত্র। ইহাদের সংখ্যা সমগ্র দ্বীপের অধিবাসীর এক তৃতীয়াংশ; ইহাদের দ্বারাই দ্বীপের শ্রীবৃদ্ধি, শ্বেতাঙ্গদের ধন-সম্পদ। কুলিদের প্রতি আইন খুবই কঠিন ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক অসুবিধার কথা কমিশন উল্লেখ করিয়াছিলেন। এখানকার মুক্ত ভারতবাসীরা অনেকে বেশ উন্নতি করিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকা গিয়েনা

ট্রিনিডাডের নিকটেই দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের ভিতরে গিয়েনা দেশ; এখানকার কিয়দংশ ইংরাজের ও কিয়দংশ ওলন্দাজদের। উভয় দেশেই কুলি যাইত। ১৮৩৮ সালে সব প্রথম প্রায় ৪০০ কুলি ডেমেরারা বা বৃটীশ গিয়েনায় চালান হয়। ১৮৫১ সালে তথায় প্রায় ৮,০০০ ভারতীয় কুলি ছিল; এখন সেখানে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার ভারতবাসীর বাস। এথানে কাজ ফুরণে হয়। কর্মিষ্ঠ কুলি দিনে ১৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করিতে পারে। সেখানে প্রায় হাজার ভারতীয় বালক বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ে; ধনীর সন্তানেরা কলেজেও পড়িয়া থাকে। এখানে সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে ১০ লক্ষকরা ৫২ জন আত্মঘাতী, কিন্তু চুক্তিবদ্ধদের মধ্যে এই মৃত্যুহার ১০০এ উঠিয়াছিল। ওলন্দাজ গিয়েনায় সাধারণদের মধ্যে ৪৯ ও চুক্তিবদ্ধ কুলিদের মধ্যে ৯১। জামাইকা দ্বীপে কুলি-ভারতবাসীদের মধ্যে আত্মঘাতের সংখ্যা দশ লক্ষকরা ৩৯৬ জন। সাধারণদের হার পৃথক্‌ভাবে দেথানো হয় নাই। উক্ত সরকার ভারত হইতে অধিবাসীদিগকে ঔপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্ত আহ্বান করিতেছেন।

কিন্তু সবচেয়ে ভীষণ অবস্থা প্রকাশ পায় ফিজি দ্বীপের রিপোর্ট হইতে।

এই দ্বীপে প্রায় ৬০ হাজার ভারতবাসী থাকে। কুলিদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের ব্যবহার খুবই কঠোর ও অভদ্র। সেখানকার সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে আত্মঘাতীর সংখ্যা ১০ লক্ষে ১৪ জন, আর চুক্তিবদ্ধ কুলির মধ্যে ৯২৬! সরকারী হিসাব অনুসারে ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই প্রদেশে ১০ লক্ষকরা প্রায় ২৯ জন, যুক্ত প্রদেশে ৬৩ জন, ও মাদ্রাস প্রদেশে ৪৫ জন আত্মঘাতী। এই কয়টি প্রদেশ হইতেই প্রধানত শ্রমজীবিরা ফিজি দ্বীপে যাইত। মিঃ ম্যাকনিল ও শ্রীযুক্ত চিমনলাল রিপোর্টে খুব জোর করিয়াই বলিলেন যে চুক্তিবদ্ধ করিয়া কুলিচালান বন্ধ করিবার সময় আসিয়াছে। ভারত সরকারও বহুদিন হইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; এদিকে ভারতবর্ষেও লোকমত ক্রমেই অত্যন্ত তীব্রাকার ধারণ করিতেছিল। আত্মঘাতের কথা, স্ত্রীলোকদের অপমাননার কথা, কলোনীসমূহে নির্লজ্জভাবে বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের সহিত অবিবাহিত লোকের বাস প্রভৃতি লইয়া আন্দোলন চলিতে লাগিল।

ফিজি দ্বীপ

ফিজিতে এণ্ড্রুস ও পিয়ার্সন

১৯১৫ সালে শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুস ও পিয়ার্সন সাহেব শান্তিনিকেতন হইতে ফিজি দ্বীপে গমন করেন; ১৯১৬ সালে তাঁহাদের উভয়ের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের ফলে তাঁহারা যাহা লিখিলেন, তাহা সরকারী অনেক সাফাইকরা রিপোর্টের চেয়ে লোকের কাছে অধিক আদৃত হইল। স্থানীয় আন্দোলনের ফলেই হউক, পূর্বোক্ত কমিশনের অভিপ্রায়ানুসারেই হউক, ভারত সরকার ১৯১৭ সালে চুক্তিবদ্ধ কুলিপ্রথা উঠাইয়া দিলেন।

১৯১৭ সালে ভারত-সরকার বলেন যে চুক্তিবদ্ধ করিয়া কুলি আর ভারতের বাহিরে প্রেরণ করা হইবে না। সুতরাং নূতন কি উপায়ে কুলী সংগ্রহ করা যায় তাহা বিচার করিবার জন্য ১৯১৮ সালে লণ্ডনে এক কমিটি বসে। সেই কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে ভারতবাসী

সকল প্রকার ঋণমুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে উপনিবেশসমূহে প্রবেশ করিতে পারিবে। তাহাকে কোনো বিশেষ মালিকের অধীনে চাকুরী করিতেই হইবে এমন নহে, তবে প্রথম ছয় মাসের জন্য তাহাকে মালিক জোগাড় করিয়া দেওয়া হইবে। শ্রমিকেরা ইচ্ছামত কারণ জানাইয়া নোটীশ দিয়া কাজ ছাড়িতে পারিবে। তাহাদিগকে নিজের উপযোগী জমিজমা দেওয়া হইবে; তা ছাড়া বিশ বৎসর কলোনীতে বাসের পর তাহাকে সুবিধামত জমি দিবার জন্য সরকার চেষ্টা করিবেন। ত্রিশ বৎসরের ইজারায় প্রত্যেককে ১৫।১৬ বিঘা করিয়া জমি দেওয়া হইবে। যাহারা রেজিষ্টারী করাইয়া বাগিচার কাজ করিতে ঢুকিবে, তাহাদের সন্তানদের মধ্যে যাহারা ১১ বছরের পর্য্যন্ত, তাহাদিগকে সরকারী হইতে খাওয়া দেওয়া হইবে, এ ছাড়া পাঁচ বছরের শিশুদের জন্য দুধের বন্দোবস্তও তাঁহারা করিয়া দিবেন। প্রত্যেক বিবাহিত পরিবারের জন্য পৃথক কামরা থাকিবে। ভারতবর্ষ হইতে পরিবারসুদ্ধ লোকদের লইয়া যাওয়ার চেষ্টা হইবে; পরিবার ছাড়া কোনো স্ত্রীলোককে লওয়া হইবে না, আঠার বছরের নীচে কোনো বালককে অভিভাবকশূন্য বিদেশে পাঠাইতে সাহায্য করা হইবে না। এই সমস্ত বিষয় তদারক করিবার জন্য এখানে ও কলোনীসমূহে উপযুক্ত কর্মচারী থাকিবে।

১৯১৮ শ্রমের নূতন বিধি

১৯২০ সালে ভারত-সরকার পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে কুলিসংগ্রহ করিবার সুযোগ পান। কারণ ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফিজিদ্বীপে চুক্তিবদ্ধ কুলি প্রেরণ করা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। বৃটীশ গিয়েনাতেও ঐ সময়ে কুলিচালান বন্ধ হয়। অথচ ঐ সব দেশে ভারতীয় কুলি ছাড়া চলিতে পারে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শ্বেতাঙ্গদের কাজ করা অসম্ভব। সেইজন্য ফিজি ও বৃটীশ গিয়েনার সরকার ভারত-সরকারের নিকট Deputation বা আবেদন পাঠাইলেন। বৃটীশ গিয়েনার দূতেরা

বলেন যে তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে ঔপনিবেশিক লইয়া যাইতে প্রায় ৬০ লক্ষ পাউণ্ড বা প্রায় ৯ কোটি টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত। প্রথম তিন বৎসর সেদেশে ৫,০০০ করিয়া লোক তাঁহারা বিনা ভাড়ায় লইয়া যাইবেন। বৃটীশ গিয়েনায় পৌঁছিয়া তাহারা ইচ্ছা করিলে অল্পমূল্যে জমি লইয়া চাষবাস বা পশু-চারণ করিতে পারে, অথবা চাকুরী চাহিলেও বাগিচায় কাজ করিতে পারিবে; সেখানে সাত ঘণ্টা কাজ করিলে পুরুষে প্রায় দৈনিক ৩৲ ও মেয়েরা লঘু কাজ করিয়াও ১॥০ রোজগার করিতে পারে। খরচখরচা বাদ দিয়া দৈনিক এক টাকা করিয়া তাহারা বাঁচাইতে পারিবে। তিন বৎসর বাসের পর সরকার তাহাদিগকে ১৫ বিঘা খুব ভাল জমি দান করিবেন। উপনিবেশ সরকারের ব্যয়ে তাহারা ভারতবাসীদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ভারত-সরকার প্রেরিত কর্মচারীকে রাখিতে প্রস্তুত। এই কর্মচারীর ইচ্ছানুসারে কোনো ব্যক্তি বা পরিবারকে যদি দেশে পাঠাইতে হয় তবে গিয়েনা সরকার তাহার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিবেন। এ ছাড়া সাত বৎসর পরে কুলিরা ইচ্ছা করিলে বিনা ভাড়ায় ফিরিতে পারিবে। এ ছাড়া কতকগুলি ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, কেরাণী, পণ্ডিত, পুরোহিত, মোল্লাকেও তাঁহারা সেদেশে বিনা ভাড়ায় লইয়া যাইবেন। গিয়েনা সরকার প্রকাশ্যভাবে জানাইতেছেন যে তাঁহাদের দেশে ভারতবাসীকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও আর্থিক সাম্য দান করা হইবে।

মুক্ত অবস্থায় উপনিবেশ

ফিজি সরকার হইতেও ভারতবাসীকে সে দেশে লইয়া যাইবার জন্য অনেক সুবিধা-জনক প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। শ্রমিককে পাথেয়র জন্যে কিছু ভাবিতে হইবে না। ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একজন করিয়া 'প্রবাসী ভারতবাসী'-রক্ষক কর্মচারী থাকিবেন। প্রাদেশিক শাসন সরকারের দ্বারা মনোনীত কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ভারত-

-বাসী, শ্রমিকদের ডিপো তদারক করিতে পারিবেন। ইহারাও সাত বৎসর পরে বিনা ভাড়ায় দেশে ফিরিতে পারিবে। ফিজিতে তাহাদিগকে জমি দিবার বন্দোবস্ত করা হইবে। ইহাদের শিক্ষার জন্যও রীতিমত চেষ্টা হইবে ও সরকার ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। বৃটীশ গিয়েনার ন্যায় ইহারা রাজনৈতিক সাম্য দিতে পারিবেন না। তবে সেখানে কোনোরূপ বর্ণগত বৈষম্য নাই বলিয়া আমাদের সরকারকে তাঁহারা আশ্বাস দেন।

ফিজিদ্বীপ হইতে প্রস্তাব

মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে ভারত সরকারের পক্ষে এই সব প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলিবার বিশেষ কিছু ছিল না। তবে তাঁহারা বলিলেন যে দুইজন লোক পাঠাইয়া ভাল করিয়া তদন্ত করিয়া আসিয়া এ বিষয়ে পাকা কথা দিবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ফিজিতে বড়ই এক দুর্ঘটনা ঘটিল। পূর্বোক্ত আলোচনা যখন চলিতেছে তখন সংবাদ আসিল ফিজিতে ভারত-বাসী ও পুলিশের সহিত ধর্মঘট লইয়া বিবাদ হয়।

এই সমস্ত শ্রমিক গণ্ডগোলের জন্য ফিজিস্থ ভারতবাসীরা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে; ষাট হাজার ভারতবাসীর মধ্যে ত্রিশ হাজার দেশে ফিরিবার জন্য একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। ধর্মঘটের গণ্ডগোল, নেতা মণিলালের নির্বাসন ও রাজনৈতিক অধিকার লইয়া মতভেদের জন্য প্রবাসী ভারতবাসীরা ফিজি ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। তা ছাড়া ১৯২১ সালে গান্ধীজি ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন; এখানকার খবর অত্যন্ত বিকৃতভাবে দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফিজিস্থ অশিক্ষিত কুলীদের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল যে ভারতে 'স্বরাজ' হইয়াছে। স্বরাজের অর্থ কি তাহা কেহ বুঝিতে না; ভাবিল পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়াছে। কয়েকশত শ্রম-জীবি দেশে ফিরিল, অনেকে সর্বসান্ত হইয়া ফিরিল। কিন্তু দেশে আসিয়া তাহারা যে মূর্তি দেখিল, তাহাকে

'স্বরাজ' ও ফিজিস্থ ভারতবাসী

তাহাদের চেতনা হইল। যাহারা ফিজিতে জন্মিয়াছে তাহারা দেশের সমস্তের সঙ্গে যোগ-ছিন্ন। এখানে আসিয়া তাহারা চাকুরী পায় না, আশ্রয় পায় না; কোথায় তাহাদের কাল্পনিক স্বদেশ! ফিজি গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে পুনরায় ফিজিতে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন।

এই সব অশান্তিকর ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর ফিজি সরকার প্রবাসী ভারতবাসীকে সমান রাজনৈতিক অধিকার দিতে প্রস্তুত হইলেন। ভারত-সরকারও ফিজিদ্বীপে ভারতবাসীদের প্রেরণ করা উচিত কি না সে-বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য এক কমিটি বসাইলেন।

প্রবাসী ভারতবাসীদের সমস্যা এখন কেবল কুলিসমস্যা নহে। যখন কেবল কুলিই চালান হইত, তখন ভারতবাসীদের আত্মসম্মানবোধ দেশে বা বিদেশে কোথায়ও পরিস্ফুট হয় নাই, তখন যে নীতিতে প্রবাসী ভারতবাসী-দের শাসন ও শোষণ চলিত, এখন তাহা সম্ভব নহে। অনেকগুলি কলোনী ও রাজ্যে ভারতবর্ষীয় সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে; চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের বংশধরেরা এখন স্বাধীনভাবে মানুষ হইয়া উঠিয়া শ্বেতাঙ্গ অধি-বাসীদের সহিত সকল বিষয়ে আপনাদের দাবী বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গের সমকক্ষ হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিশেষত গত যুদ্ধের সময়ে ১৯১৭ ও ১৯১৮ যে দুটি মন্ত্রণাসভা বসে তাহাতে স্থির হয় যে ব্যবসায়, ভ্রমণ বা অধ্যয়নের জন্য ভারতবাসীকে সকল বৃটীশ শাসিত রাজ্যে সমান অধিকার দেওয়া হইবে।

প্রবাসী ভারতবাসীর দাবী

১৯২১ সালে সাম্রাজ্য মন্ত্রণা-সভায় কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সকলেই প্রবাসী-ভারতবাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন; কেবল দক্ষিণ-আফ্রিকা স্পষ্টত বলিয়া দেন যে তাঁহারা সে বিষয়ে সাহায্য করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। দক্ষিণ-আফ্রিকার ব্যবহারে সকলে

খুবই দুঃখিত হইয়াছিলেন; কেহ কেহ আশা করেন ভারত-সরকার স্বয়ং যুনিয়ন-সরকারের সহিত আলাপ করিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই; এবং বর্ণ-ভেদের ব্যবধান, রাজনৈতিক অধিকার দানে কার্পণ্য হেতু দিন দিন মনোমালিন্য বাড়িতেছে।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর ভ্রমণ

১৯২২ সালে ভারত-সরকার শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়কে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে গিয়া ভারতবাসীদের অধিকার সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিবার জন্য প্রেরণ করেন। অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড ও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশের ভারতবাসীদের কোনো প্রকার ভোট দিবার অধিকার নাই। কানাডায় উহাদের ভোট দিবার অধিকার নাই; বৃটীশ-কলম্বিয়া রাজ্যে উহাদের প্রাদেশিক ভোট দিবারও অধিকার নাই। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসের কথা সকলেই মন দিয়া শুনিয়াছেন এবং আশা হয়, উভয় দেশেই ভারতবাসীদের অধিকার সম্বন্ধে সুবিচার হইবে।

কিন্তু এখনো সমস্যা পূরণ হয় নাই। কেনিয়া প্রভৃতি স্থানে ভারতবাসীদের ন্যায্য দাবী এখনো মিটানো হয় নাই; এবং প্রায়ই পত্রিকাদিতে নব নব সমস্যা ও বিসদৃশ পার্থক্যের উদাহরণ দেখা যাইতেছে।

১৯২২ সালে কেনিয়াতে ভারতীয়দের সকল প্রকার অসুবিধা করিয়া বর্ণভেদের সকল সত বজায় রাখিয়া যে আইন পাশ হইয়াছিল, তাহা রাজসম্মতি পাইয়া পাকা হইয়া গেল। এই ব্যাপার লইয়া ভারতে খুব আন্দোলন চলিতে লাগিল; এমন কি লর্ড রেডিং পর্য্যন্ত বিলাতের সরকারের এই ব্যবস্থা সমর্থন করিতে পারিলেন না; কারণ তাঁহাকে ভারতবর্ষে ভারতবাসীদের লইয়া দিনরাত্রি থাকিতে হয়; সমুদ্রের পরপারে ভারতবাসীদের অপমানে আজ ভারতের অধিবাসীরা অত্যন্ত সজাগ ও তাহাদের মনোভাব অত্যন্ত তীব্র।

১৯২৩ সালে এক সাম্রাজ্য-বৈঠক বসে; তাহাতে তৎকালীন ভারত

সচিব লর্ড পীল ও সার তেজ বাহাদুর সপ্রু ভারতের কথা বলেন। কিন্তু স্মাটস সাহেব তাঁহার পূর্ব সংকল্প হইতে নড়িলেন না। ইহার পর ভারত-সরকার কলোনীতে ভারতবাসীদের অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করিবার জন্ত এক কমিটি বসাইলেন; এই কমিটির সভাপতি মিঃ হোপ সিম্পসন; অন্যান সভ্য শ্রীযুক্ত আগা খাঁ, রবাটসন, রঙ্গচারিয়ার, কে, সি, রায়। রাসব্রুক উইলিয়ামস্ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই পরিচ্ছেদ ও এই গ্রন্থ শেষ করিব:—

"But it must not be forgotten that India is now somewhat weary of conferences and committees, and in her present distrustful mood, she is inclined to look upon them merely as devices for postponing the considertion of awkward questions." India 1923-24. p. 18.

———o———

গ্রন্থপঞ্জী

কংগ্রেসের পূর্বযুগ

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (Col. U. N. Mukherjee) হিন্দুজাতির শিক্ষার ইতিহাস ২ খণ্ড।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি) আত্মজীবনী। (অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী লিখিত মহর্ষির জীবনী দ্রষ্টব্য।)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবন-স্মৃতি ; বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত।

ভূদেব চরিত—বিশ্বনাথ ট্রাষ্ট ফাণ্ড, চুঁচুড়া ১৩২৪।

মন্মথনাথ ঘোষ—মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ (৩য় অধ্যায়) কলিকাতা, ১৩২২।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবন-স্মৃতি—বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

রাজনারায়ণ বসু—আত্মচরিত ; একাল ও সেকাল ; বৃদ্ধ হিন্দুর আশা।

শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ।—এস, কে, লাহিড়ী ১৯০৯।

কংগ্রেস যুগ

প্রবর্ত্তক—আশ্বিন ১৩৩০ চন্দননন্দর (শতবর্ষের বাংলা নামে পুনর্মুদ্রিত)

বিপিনচন্দ্র পাল—বাংলার নবযুগের কথা। বঙ্গবাণী ১ম, ২য় বর্ষ এখনো চলিতেছে।

রজনীকান্ত গুপ্ত—নবভারত বা পরিবর্ত্তন যুগের ভারতবর্ষ। (কটন সাহেবের নিউ ইণ্ডিয়া পুস্তকের অনুবাদ)—গুরুদাস, কলিকাতা ১২৯৩।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—কংগ্রেস।—সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৩২৮।
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—কংগ্রেস (২য় সং)—বসুমতী ১৩২৮।

স্বদেশী-আন্দোলন যুগ

(এই সময়ে বাংলা ভাষায় অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল; Blumhardt's Catalogue of Bengali Books in the India Office Library 1923 দ্রষ্টব্য)

অরবিন্দ ঘোষ—ধর্ম্ম ও জাতীয়তা। চন্দননগর।
প্রিয়নাথ গুহ—যজ্ঞভঙ্গ বা বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির ইতিহাস। কলিকাতা, ১৩১৪।
সখারাম গণেশ দেউস্কর—দেশের কথা (১৯০৬ সালের মধ্যে ৫টি সংস্করণ হয়)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভারতবর্ষ, আত্মশক্তি, রাজা ও প্রজা, স্বদেশ ইত্যাদি।
সোনার বাংলা, বন্দেমাতরম্ প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীতের বহি।
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—কংগ্রেস (দ্রষ্টব্য)

অসহযোগ

অরুণচন্দ্র গুহ—সত্যগ্রহ ও পঞ্জাব-কাহিনী—সরস্বতী লাইব্রেরী ১৩২৮।
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বর্ত্তমান সমস্যা, ১৯২০; ধর্ম্ম ও কর্ম্ম ১৯২২।
গান্ধী (মহাত্মা) ভারতে স্বরাজ ('ইণ্ডিয়ান হোমরুল'এর বঙ্গানুবাদ)
নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ভারতের বাণী ও যুগবার্ত্তা—সরস্বতী লাইব্রেরী ১৯২২।
বিমলাদাস গুপ্তা—ত্রয়ী (গান্ধী, মহম্মদ আলী, চিত্তরঞ্জন) কলিকাতা ১৩২৭।
যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মহাত্মা গান্ধী—বসুমতী।
সুকুমাররঞ্জন দাসগুপ্ত—চিত্তরঞ্জন—ইণ্ডিয়ান্ বুক ক্লাব, ১৯২২।
হক্ কথা—ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত ১৯২২।

হেমন্তকুমার সরকার—বন্দীর ডায়েরী—কলিকাতা ১৯২২।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সত্যের আহ্বান; শিক্ষার মিলন। সমস্যা; সমস্যার সমাধান—প্রবাসী ১৩২৯।

বিপ্লব যুগ

অরবিন্দ ঘোষ—কারাকাহিনী (সুপ্রভাত পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত)
উল্লাসকর দত্ত—কারাকাহিনী।
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নির্বাসিতের আত্মকথা—কলিকাতা ১৩২৮।
* ক্ষুদিরাম—জীবনী
নলিনীকিশোর গুহ—বাংলায় বিপ্লববাদ—কলিকাতা ১৩৩০।
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—দ্বীপান্তরের কথা,—আর্য্য পাবলিশিং ১৯২০।
ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত—বর্ত্তমান বাংলার অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায়। বঙ্গবাণী ১৩৩১ ধারাবাহিক চলিতেছে।
* বিপ্লবের বলি (যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়, নীরেন্দ্র, মনোরঞ্জনের জীবনী)—চন্দননগর ১৯২৪।
* মতিলাল রায়—কানাইলাল (সচিত্র)—চন্দননগর।
রাসবিহারী বসু—আত্মকাহিনী (প্রবর্ত্তকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছে)।
শচীন্দ্রনাথ সান্যাল—বন্দীজীবন ১ম ভাগ—সরস্বতী লাইব্রেরী ১৯২২। ২য় ভাগ—ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, ১৯২৪।

প্রবাসী ভারতবাসী

প্রবাসী ভারতবাসী—(হিন্দী) বাণারসীপ্রসাদ চতুর্বেদী, সরস্বতী সদন, ইন্দোর ১৯১৮।

ফিজী দ্বীপ মে' মেরে ২১ বর্ষ—পণ্ডিত তোতারাম সনাঢ্য—ভারতীগ্রন্থমালা সংখ্যা ২—ফেরোজাবাদ, আগরা সং ১৯৭২।

ঐ বঙ্গানুবাদ—অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন কর্ত্তৃক 'বিজলী'তে ধারাবাহিক অনুদিত হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর কারাকাহিনী—অমাথনাথ বসু কর্ত্তৃক গুজরাঠী হইতে অনুদিত।

মহাত্মা গান্ধীর পত্র—যতীন্দ্রনাথ রায় (হিন্দী হইতে অনুদিত)।

* নিষিদ্ধ (Proscribed)।

BIBLIOGRAPHY

Pre-Congress Period

Besant, Annie—India, a nation—Peoples Book, Jack.

Blunt, W. S.—India Under Ripon. (see also his Diary in 2 vol.)

Buckland, C. E.—Bengal Under Lieutenant Governors. 2 vols.—S. K. Lahiri, Cal. 1901.

Harrish Chandra Mukherjee—Selections from the Writings of— Ed. by N. C. Sen Gupta, Cal., 1910.

Lalit Chandra Mitra—The History of Indigo Disturbances with a full Report of the Nildarpan Case. —Girish Lib. Cal., 1903.

Lethbridge, Sir Roper—Ramtanu Lahiri : Brahman and Reformer. A History of the Renaissance in Bengal. (Translated from the Bengali of Sivanath Sastri)—Sonnenschein 1907.

Ram Mohan Roy—His Works.—Ed. by Jogesh Chandra Ghose. 2 vols. Cal. 1885—87. also Panini Office Edition.

Sivánath Sastri—History of the Brahmo Samaj Vol. I. —R. Chatterji, Modern Review Office 1911.

Congress Period.

Abhedananda, Swami. India and her People—Vedanta Society, N. Y. 1906.

Ambika Charan Mazumdar—Indian National Evolution. 2nd Ed. Natesan, Madras.
Besant, Annie—How India Wrought her Freedom——Adyar 1915.
Biographies of Eminent Indians Series—Natesan.
Books by Digby, Ramesh Chandra, Ranade, Joshi, Gokhale Kale.
Cotton, Sir Henry—The New India or India in Transition (New Ed.). Trubner 1905.
Indian Nation Builders—3 Parts.—Natesan.
Lovett, Sir Verney—A History of the Indian Nationalist Movement—Murray 1920.
Speeches of—Surendranath, Gokhale, Naoroji, Wedderburn, etc.—Natesan.

Swadeshi Movement.

The Aga Khan (H. H.).—India in Transition.
Archer, William.—India and the Future—Hutchinson 1917.
Chatterji, R.—Towards Home Rule Parts, 1—3. Modern Review Office, Cal. 1917-19.
Chirol, Valentine—Indian Unrest—Macmillan 1910.
Farquohar.—Modern Religious Movement—Mac. N. Y.
Fraser, Lovat. India Under Curzon and after. —Heinemann 1913.
Ghose, Aurobinda—His Writings, Published by Prabartaka Publishing House, Chandanagore.
Keir-Hardie, J.—India Impressions and Suggestions—Independent Labour Party 1909.

Macdonald, Ramsay.—The Awakening of India—Hodder 1910.

Lajpat Rai—The Political Situation of India —1916 ?

Major, E.—Viscount Morley and Indian Reform—Nisbet 1910.

Morley, Viscount. Indian Speeches(1907-09)—Macmillan.

Milburn, R. Gordon—.England and India —A. Unwin 1918.

Modern Review.—1907 to date.—Notes.

Pal, Bipin Chandra.—The Soul of India—Thacker.

Wedgewood, Col. Joshish.—The Future of India, the British Commonwealth—Adyar 1921.

Rushbrook-Williams.—India in 1917-18. Govt. Pub. 1918.

Tilak, B. G.—The Life of—by D. V. Athalye. Poona 1921.

Landmarks in the Life of Tilak.—by N. Kelkar.

Bhaisankara and Kanga—Paper-Book of Tilak's Trial 1897 Bombay.

Trial of Tilak 1908 ?

Non-Co-operation.

Andrews, C. F. Non-Co-operation—Tagore, Madras Indian Problem—Natesan.

Ahmadabad Congress and the National Work. —Saraswati Library, Cal. 1922.

Bipin Chandra Pal.—Non-Co-operation—Indian Book Club, Cal. 1920.

Chirala-Perala Tragedy.—An Episode of Voluntary Exile —Ganesh 1922.

Chirol, Valentine—India, Old and New—Mac. 1921.

Chittaranjan Das.—The Call for the Mother land, Cal.
The Fight for Freedom—Intro-by Mahatma Gandhi—Tagore, Madras 1922.
Ethics of Destruction—by Rabindranath, Gandhi, Andrews, Dwijendranath Tagore-Tagore, Madras.
Gandhi (see the Special Bibliography).
Gwyun J. T.—Indian Politics.—Nisbet 1924.
Houghton, Bernard.—The Mind of the Indian Government.—Ganesh, 1922.
Howsin, Hilda M.—India's Challenge to Civilization—Tagore, Madras 1922.
Jalinwalabagh Affair.—Disorders Inquiry Committee (Hunter Committee) Report 1919-20.—
Govt. Press 1920.
Hornimann, B. G. Amritasar and our duty to India (Illus.).—T. F. Unwin 1920
Report of the Commissioners appointed by the Punjab Sub-Committee of the Indian National Congress Vol. I Report, Vol. II. Evidence—1920.
Wedgewood, J.—The Punjab Atrocities (see Josieh S. Wedgewood).
Khaddar Work in India—Bombay.—All India Congress Khaddar Depot, 1922.
Khadi Mannal—Calcutta 1924.
Lala Lajpat Rai's Trial by A. N. Sewel, Lahore 1922.
Lajpat Rai—Ideals of Non-Co-operation and other Essays.—Ganesan 1924.
India's will to Freedom.—Ganesh 1921.
The call to Young India.—S. Ganesan (N.D.)
Mazumdar, P.—Swaraj—Students Lib. Cal. (N. D.)

Nripendra Nath Banerji.—The ideal of Swaraj—Ganesan 1921.
Nandy, Alfred. Indian Unrest (1919-20) Deradun 1921.
Rushbrook-Williams, L. F.—India in 1919, 1920, 1921-22, 1922-23.
Raja Gopalacher, C.—Jail Diary.—Madras 1922.
Ranga Iyar, C. S.—A voice from Prison—Ganesh.
Stokes, S. E.—National Self-Realization.—Ganesan Madras 1921.
To Awakening India.—Ganesh 1922.
Van Tyne, C. H.—Indian in Ferment—Appleton & Co.
Vaswani, T. L.—Non-Co-operation and National Idealism.—Saraswati Library 1921.
Wellock, Wilfred—India's Awakening.—Labour Publ. London 192?

GANDHI BIBLIOGRAPHY

Books by M. K. Gandhi.

The Early History of Satya-Graha—(appearing serialy in "Current Thought"—Madras 1924).
Freedom's Battle—Ganesan, Madras.
A Guide to Health—Ganesh, Madras.
Indian Home Rule—Ganesh.
Life, Writings and Speeches: with a Forward by Sarojini Naidu—Ganesh 1918.
Neeti Dharma.—Ganesan.
Sermon on the Sea [India Home Rule] with an intro-

duction by J. H. Holmes.—Ed. by Haridas T. Mazumdar.—Chicago 1924.

Speeches and Writings of M. K. Gandhi with an intro. by C. F. Andrews ; a tribute by G. A. Natesan and a Biographical Sketch; by H. S. L. Polak—Natesan.

Swaraj in one year—Ganesh 1921.

The Wheel of Fortune with an appreciation by Dwijendra Nath Tagore.— Ganesh 1922.

Young India—3 Vols.—Ganesh 1924.

Books on M. K. Gandhi

Athlaye, D. V.—Mahatma Gandhi.

B. C. Chatterji—Gandhi or Aurobindo, and an Appeal to Gandhi—Saraswati Library.

Doke, Joseph J.—M. K. Gandhi. an Indian Patriot in South Africa—Natesan 1907.

Friends and Foes—M. K. Gandhi—Saraswati Library 1921.

Gandhi and Anglican Bishops—Ganesh 1922.

Gray, R. P. and Manilal C. Parekh—Mahatma Gandhi —Association Press, Cal 1924.

Guha, Satish Chandra—Gandhi-Mahatma—Bharat Grantha Bhandar, Cal. 1924.

Holmes, J. H.—The Christ of To-day—Tagore, Madras.

Kurup, T. C. K.—Gospel of Gandhi—Madras Review Office.

Mazumdar, Haridas T.—Gandhi, The Apostle the Trial and Message—Chicago 1923.

Natesan—M. K. Gandhi.

Kesava Menon (Ed). The Great Trial of Mahatma Gandhi; Foroword by Sarojini Naidu—Ganesh 1922.

Rolland, Romain—Mahatma Gandhi—Paris.

Do Translation—Published by Ganesan, Madras. The Atlantic Monthly, New York.

World Tomorrow—Gandhi Issue, Dec. 1924—New York.

Revolutionary Period.

Alipore Bomb Trial 1907—Butterworth (?).

Bhai Paramanand—My Life (Translated from the Hindi) —Ganesan.

Calcutta Gazette—also speeches of the Governors of Bengal, Lord Carmaicael, Ronaldshay, Lytton; Viceroys—Lords Hardinge, Chelmsford, Reading; speech of Sir Hugh Stephenson etc.

Chirol, Sir Valentine—Indian Unrest (see above).

Lovett, Sir Ver Verney (see above).

Montague-Chelmsford—Indian Constitutional Reforms (Para 21) 1918.

Hemanta Kumar Sarkar—Revolutionaries of Bengal—Indian Book Club 1923.

Sedition Committee 1918 (Rowlatt Committee)—Bengal Secretariet Press—1919.

Savarkar's Indian War of Independance of 1857. (Mentioned in Chirol's Indian Unrest).

Moslem India.

Ali Brothers—For India and Islam—Saraswaty Library 1923.

Amir Ali—History of the Saracens—Macmillian.
The Spirit of Islam—Calcutta.

Stoddard, L.—The New World of Islam—The Mac. N.
Speeches of Sir Syed Ahmad.
Nandy, Alfred—Indian Unrest (see above).
Vaswai, T. L.—The Spirit and Struggle of Islam—Ganesan 1921.
Muhammad Ali—his Life and Services—Ganesan 1921
Thadani, R. V.—The Historic Trial of the Ali Brothers—Karachi 1921.
See also Rushbrook Williams, The Light, Comrade etc.

Indians Abroad.

Burton, J. W.—Fiji of To-day.
Doke—Life of Gandhi (see above).
Panikkar, K. M.—The Problem of Greater India—Madras 1916.
Official Report :—
Report of the Committee on Emigration from India the Crown Colonies and Protectorates— [Parlimentary Blue Book] London 1910.
Report on the Condition of the Indian Immigrants in the Four British Colonies : Trinidad, British Guiana or Demerara, Jamaica and Fiji and the Dutch Colony of Surinam or Dutch Guiana 2 Parts—Simla 1914.
[East African Protectorate] Economic Commission Nairobi 1919.
[Union of South Africa]
Report of the Asiatic Inquiry Commission—Simla 192 also Cape Town 1921.
A Colony for India : British Guiana as a Home for Indi